ওসিডি (obsessive compulsive disorder) একটা মানসিক অবস্থা। এ অবস্থায় মানুষ চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। চিন্তা মানে দুশ্চিন্তা। ওসিডি বেশি হলে উদ্বেগ থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনও কাজ বারবার করে। যেমন বারবার বা দীর্ঘ সময় ধরে গোসল করা। প্রায় সকল মানুষ কমবেশি এই মানসিক অবস্থা বয়ে বেড়ালেও সাধারণত শত করা ৪ জন মানুষের ওসিডির জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, যাদের জীবন অনেক কষ্টের।

ওসিডিকে সমাজের উপমা হিসাবে ব্যবহার করে নির্মাণ করা ওসিডি একটি মূল ধারার সামাজিক উপন্যাস যা মানুষের মানসিক ব্যাধিসমূহের মূল কারণগুলি নিয়ে কাজ করে। এই কাহিনীর হিরো মানবহত্যাকারিনী শিশিরকণা মানবকুলে বিরাজমান সকল সংস্কার থেকে মুক্ত। বোধের গভীরতায়, চিন্তার স্বাধীনতায়, মননশীলতার নীরিখে এবং সর্বক্ষেত্রে দাতা শিশিরকণা সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন, যিনি দুর্ঘনটাবহুল জীবনের চূড়ান্ত বিয়োগান্তক পরিস্থিতির নৈরাশ্যবাদ মোকাবেলায় চিরায়ত প্রজ্ঞা অনুশীলনে অর্জিত আত্মিক শক্তি প্রয়োগের এক সফল, এবং সাহিত্যের জন্য নতুন, নজির হাজির করেন।

ওসিডি

হারুন আল রশিদ

পর্ব–১

এক

হামিদের ভূত আমার পিঠে কিল দেয়। কিল দিয়ে দিয়ে সে আমাকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। আমার পিঠ দুই স্তর নরম পোশাকে আবৃত। ভূতের হাত বুঝি লোহালক্কড়ের তৈরি। অবশ্য তাতে জোর নাই, আছে শুধু অধ্যবসায়।

“যা, ঘাতককে দেখে আয়,” হামিদের ভূত বলে।

ভূতের কথা শুনে আমার পিঠ শক্ত হয়। হৃৎপিণ্ডে ইস্পাতের ঘষা লাগে।

হামিদের ভূত আমার শক্ত পিঠে কিল দেয়। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে পা ফেলি। আমার পায়ের গুল দুটি হাড্ডির উপর বাড়ি খায়। আমার নরম ত্বকের সুযোগ নিয়ে ওরা জোরে জোরে লাফায়। ভূতের কিল খেতে খেতে আমি গোসলখানায় ঢুকি।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যা হয় আমার এখন সে অবস্থা। আছাড় খেতে গিয়ে আমার হুঁশ আসে। আমি ঘুরে দাঁড়াই। ভূতের মুখোমুখি। আমি ধরে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিই। সজোরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি। আমি আমাকে এক বার অনুভব করি। অনুভব করি আমার নারীর গঠন। আমি পর্যবেক্ষণ করি আমার অর্জন করা মনের শক্তি।

আমি বর্তমানে ফিরে আসি। আমার শক্ত হওয়া পাঁজর শিথিল হয়। দরজার হাতল ধরে আমি নিজেকে প্রস্তুত করি।

“মনে আছে তোর?” আমি চেঁচিয়ে বলি। “সাড়ে দশ ঘন্টা। মনে আছে তোর শখের বিরামঘড়ি। সুইচ টিপে তুই ঘোষণা দিয়েছিলি: দশ ঘন্টা চৌত্রিশ মিনিট বাইশ সেকেন্ড। এক ঢোক তুই গিলেছিস এক

ঢোক আমাকে গিলিয়েছিস। তোর গোল্ডেন কালার। মনে আছে কয় বোতল শেষ করেছিস? ভেতর বার। ভেতর বার। তুই শাদ্দাদ হতে চেয়েছিলি। মনে আছে?”

ভূতের মুখের কালো চামড়ায় লাল আভা দেখা দেয়। তার মোটা মোটা ঠোঁট নীল রঙে ছেয়ে যায়। হামিদের মাথায় ঘন কালো লম্বা চুল ছিল। হামিদের ভূতের মাথায় চুল নাই। আগুন রঙের টাক নিচু করে হামিদের ভূত তার পেট চেপে ধরে। যেন বিষ তার অন্ত্রে কামড় দিয়েছে।

“মনে আছে তোর?” আমি আর্তনাদ করে বলি। “সাড়ে দশ ঘন্টা। মনে আছে?”

আমার রাগে দরজা কাঁপে। “সাহস থাকলে এখন আয়,'' আমি বলি। আমি মাথা তুলে নিজের ঠোঁট দুটি মেলে ধরি। পাতা উপরের দিকে টেনে চতুর্দিকে প্রসারিত করে দুই চোখ হামিদের ভূতকে দেখাই। আর মাথাটা সামনে এগিয়ে দিই।

“আয়, কাছে আয়!”

হামিদের ভূত কাছে আসে না। আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখি সে এক কদম পিছিয়ে গেছে।

“এটাই যদি তোর দ্রোহের কারণ তা হলে তুই আমাকে ধোঁয়ার জন্য মারলি কেন?” হামিদের ভূত বলে।

“কী বললি তুই?”

“তুই আমাকে ধোঁয়ার জন্য মারলি কেন?”

“কে বলেছে আমি তোকে ধোঁয়ার জন্য মেরেছি?”

“তুই আমাকে ধোঁয়ার জন্য মেরেছিস।”

“কোথা থেকে তোর এই ধারণা এল?”

“মৃত্যুর পর সব জানা যায়।”

“কী জেনেছিস তুই?”

“তুই আমাকে ধোঁয়ার জন্য মেরেছিস। তুই আমাকে অতি নীচ মরন দিয়েছিস।”

“তুই কী আশা করেছিলি?”

“পৌরুষের দর্প।”

“সে কি তোর ছিল?”

“না, ছিল না।” হামিদের ভূত মাথা নিচু করে। “আর আমি কী করে তোর তেজের কথা জানব? তুই আমাকে কিছু বললি না। অথচ তুই আমাকে এমন নিচু মরন দিলি।”

“অন্যায় করেছি,” আমি বলি, “আয় কাছে আয়ে।”

হামিদের ভূত আরও দুই কদম পিছিয়ে যায়।

বেচারা। এক বার মরেছে। দ্বিতীয় বার মরে সে নিশ্চিহ্ন হতে চায় না। নিজেকে সে শাদ্দাদের প্রতিযোগী ঘোষণা দিয়েছিল। পৃথিবীতে সে বেহেশত তৈরি করতে চেয়েছিল। এখন সে ভূত। আমি তাকে ভূতের খাবার দিতে চাই: রক্ত। আমার রক্ত পান করার সাহস তার নাই। তার নির্বোধ চোখ আমাকে তার জিঘাংসার আগুন দেখায়।

“যা, খুনিকে দেখে আয় !” হামিদের নির্বোধ ভূত বলে।

“তাতে তোর কোনও লাভ হবে না,” আমি বলি। “আমি কার প্রতিনিধি তা তোর জানা নেই। থাকলে তুই আমার পথে আসতি না।”

“তখন জানিনি। এখন জানি।”

“কী জানিস তুই?”

“তার আগে বল তুই আমাকে কিছু জানতে দিলি না কেন?”

“আমি তোকে সব জানতে দিয়েছি। তুই নির্বোধ ছিলি।”

জীবিত হামিদের সাথে কথা বলায় কোনও আনন্দ ছিল না। মৃত হামিদের সাথে কথা বলা যায়। জীবিত হামিদ ক্ষমাশীল ছিল। মৃত হামিদ ক্ষমাহীন।

“তা হলে তুই কেন আমাকে তা খুলে বললি ন?” হামিদের ভূত বলে।

“আলসেমি,” আমি বলি। “তোর আঙ্গুলে সুর ওঠেনি।”

“এ কথা কি তোর জঙ্ঘায় লেখা ছিল?”

লজ্জায় আমার গাল গরম হয়। আমি তা অগ্রাহ্য করি।

“অবশ্যই ছিল,” আমি বলি। “তোর পড়ার ক্ষমতা ছিল না। যদিও পৃথিবীতে এ ছাড়া আর কোনও দিকে তুই তাকাসনি।”

“অবশ্যই তাকিয়েছি।”

“সিগারেটের বাট?”

“আর সেলাইয়ের দাগ,” হামিদের ভূত স্মরণ করিয়ে দেয়।

হামিদ ছিল ওর বাপের গড়ে তোলা গার্মেন্টস সাম্রাজ্যের অধিপতি। ওর সরবারহ করা শার্ট আর প্যান্টের কোনও জায়গা থেকে এক ইঞ্চি বা আধা ইঞ্চি সেলাইয়ের সুতা কখনও বের হত না। একদা তরী’স গার্মেন্টস কারখানাসমূহের এক বিজ্ঞাপন ওই কারখানাগুলিতে তৈরি পোশাকসমূহের সেলাইয়ের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি ভুল প্রমাণ করার জন্য পৃথিবীর সব গার্মেন্টস কারখানাকে আহ্বান জানিয়েছিল। হামিদের ওই চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করেনি। ফল হয় এই: স্পেনের আড়তদার ইন্ডিটেক্স হামিদের কাপড়ের অর্ডার পাঁচ গুন বাড়িয়ে দিয়েছিল।

“তুই অনেক জেনেছিস!” আমি বলি।

“জেনে কী লাভ হল? আমি কি আর ফিরে আসতে পারব?’

“না, পারবি না।”

হামিদ আর হামিদের ভূত। এক জন আছে, এক জন নাই। এই দুইয়ের পার্থক্য আমার দেহের ভেতর মোচড় খায়। আর তাতে আমার দুই হাতের আঙ্গুল বাঁকা হয়ে দুই তালুর উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। কারণ আমি খুনির মুখোমুখি হতে চাই না। যা খুনিকে দেখে আয়, এ কথা আমি নিজেকে নিজে বহু বার বলেছি, কিন্তু নিজের মধ্যে কখনও এমন প্রতিক্রিয়া অনুভব করিনি, যেমনটা এখন অনুভব করছি। অন্য কোনও মানুষ আমাকে এ কথা বললেও এমন প্রতিক্রিয়া হত না।

‘যা খুনিকে দেখে আয়,” হামিদের ভূত বলে।

আমি সজোরে দরজা বন্ধ করি। বন্ধ দরজায় কপাল ঠেকিয়ে পেট ভরে শ্বাস নিই। আমি আমার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। যাক্। আপাতত এটুকু করা গেল। হামিদের ভূত বাথরুমে ঢুকতে পারেনি। আমার কানে তার আওয়াজ আসে যদিও। সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসে।

“তুই বাইরে দাঁড়িয়ে আনন্দ কর্,” আমি উচ্চৈঃস্বরে বলি।

“খুনিকে দেখতে থাক,” হামিদের ভূত বলে, আর জোরে জোরে হাসে। “যেন সৌম্য সরকার ছক্কা মেরেছে।”

“তুই বাইরে দাঁড়িয়ে থাক,” আমি বলি। “তুই ভেতরে এলে আমার জ্বালা বাড়ত। যদিও তোর ক্ষমতা সীমিত। তোর একটাই শক্তি: অমরত্ব। বিরক্ত করা ছাড়া তোর আর কী করার আছে? অন্য ভূতেরা শত্রুর রক্ত খায়। তোর ভাগ্যে তা-ও নাই।”

হামিদের ভূতের হাসি থামে।

ভূতের সাথে তর্ক করার আর কিছু থাকে না। কিন্তু তাতে আমার সমস্যার কোনও সমাধান হয় না।

দুই

আয়নার ভেতর থেকে খুনির চোখজোড়া আমার দিকে তাকায়। পাপ-খোদাই করা ভারী চোখ। আমি পাগলের বুক দুমড়ানো দীর্ঘশ্বাস শুনি। আমার বুক কাঁপে। হাঁটু কাঁপে। আমি দুই হাত দিয়ে বেসিনের কানা আঁকড়ে ধরি। রানের উপর রান চেপে আমি আমার দুই ঠ্যাঙ স্থির রাখার চেষ্টা করি। আবার শোঁ করে আমার কানে পাগলের দীর্ঘশ্বাস ঢোকে। আমার সারা দেহ কেঁপে ওঠে।

জানি না এই আতঙ্ক আমাকে কত দূর নিয়ে যাবে। মৃত হামিদ কখনও আমার পিছু ছাড়েনি। আবার এমন ভূত হয়েও আগে কখনও সে সামনে আসেনি। পাগলের সাথে মারামারি করে আমি অনেক দুর্বল হয়ে গেলাম। তাই ভূত এই সাহস পেল।

আমার দুই উরু তপ্ত মোমের থামের মতো নরম হয়ে পড়েছে। কিংবা কাঁটা গলে যাওয়া সিদ্ধ ইলিশ মাছের মতো। আমি ওদের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করি। না। স্পর্শের তরঙ্গও এখন আর এক পা থেকে আর এক পায়ে প্রবাহিত হচ্ছে না। আমি নিঃশ্বাস নিই। নিঃশ্বাসের শব্দ বন্ধ হলে পাগলের দীর্ঘশ্বাস কানে বাজে। আমি দুই হাত দিয়ে বেসিনটা আঁকড়ে ধরে থাকি। আহা রে পাগল। কী থেকে কী হয়ে গেল। আপনাআপনি একটা নিঃশ্বাস আমার দেহে ঢুকতে থাকে, যেন সারা দেহ তার শক্তি একত্র করে নাক দিয়ে একটা রেলগাড়ি

টেনে ভেতরে ঢোকাচ্ছে। তারপর আমার দেহ নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দেয়। যেন নাক দিয়ে দুটি রকেট বের হয়ে যায়।

আমি কিছু আরাম পাই।

আমি এমন এক সময়ে পাগলকে আঘাত দিলাম যখন আমি মা-মেয়ের ভালবাসা আবিষ্কার করেছি। আমার সামনের আয়নাটা ঝাপসা দেখায়। আমি বাম বাহু তুলে বাম চোখ মুছি। তারপর ডান বাহু দিয়ে ডান চোখ। আয়নাটা পরিষ্কার হয়। আয়না আবার ঝাপসা হয়। হোক। এবার আর কান্না আটকানোর চেষ্টা করি না। বেসিনটা শক্ত করে ধরি আর চোখ থেকে পানি পড়তে দিই। চোখ ধুয়ে যায়। আয়না আবার স্বচ্ছ হয়। আমি অশ্রুর তাপ অনুভব করি না। রক্ত থেকে আসা আগুন ভেতর বার দুই দিক থেকে আমার গাল দুটিতে গরম করে রেখেছে।

আমি নিঃশ্বাস নিই। আর অশ্রুর আড়ালের খুনিকে দেখি। মাথা নিচু করে আমি খুনির হাত-জোড়া দেখি। আগুন আমার দুহাতে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে ডান হাত টেনে এনে পানির কলের মাথায় রাখি। আঙ্গুলে জোর আনি মনের জোর দিয়ে। পানির কল ছাড়ি। ঠাণ্ডা পানি বের হয়ে আসে।

প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার আগে হামিদ একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল। সেই ঝাঁকুনি আমাকে আছাড় মারে। মুখে আর পানি দেয়া হয় না আমার। বুকের ভেতর থেকে যন্ত্রণার তীরগুলি ছুটে এসে মেরুদণ্ড হয়ে মাথার দিকে ছুটতে থাকে। আমি মনের চোখে তাদের দেখি। ভাল করে। জুম ইন। জুম আউট। জুম ইন।

প্রতিটা তীরের আগা তীক্ষ্ণ। তাদের গোড়া থেকে করুণার বিষ ঝরে। পতনশীল উল্কার মতো তীরগুলি আমার মগজের দিকে ছুটে আসে। আতঙ্কে আমার চোখ দুটি আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। চেষ্টা করি যেন সেই মুহূর্তটা সচেতন থাকতে পারি, যে মুহূর্তে ওরা আমার মস্তিষ্কে আঘাত হানবে।

আমি সচেতন থাকি। তীরগুলি আঘাত হানে। ওরা আমার মগজে নিচের দিক থেকে আক্রমণ করে। কেউ এক ইঞ্চি কেউ তিন ইঞ্চি পর্যন্ত গেঁথে যায়। আমি বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করি। আমার কাঁধের কশেরুকাগুলি ফুলে ওঠে। কপালের হাড়ে টান লাগে। প্রবৃত্তির শক্তিতে বন্দি জীবন যাপনের ফল। আমি নিঃশ্বাস ছাড়ি। তীরের ক্ষতের ব্যথা দেহের মধ্যে শুষে নিতে চাই। কাজটা আরও ভালভাবে করার জন্য চোখ খুলি। শত শত স্মৃতির তীর আমার মগজে গাঁথা হয়ে গেছে। ওরা আমার মস্তিষ্ক থেকে ঝুলছে, যেন এক খণ্ড সাদা মেঘে গেঁথে থাকা শত শত কালো বর্শা।

প্রকৃতির নিয়ম। যা কিছু উত্থিত হয়, তা-ই পতিত হয়। হামিদের ধ্বজের মতো। পশ্চিমাকাশের লাল সূর্যের মতো। আমি মাথা ঝাড়ি। এক একটা তীর ঝরতে থাকে। যদিও ক্ষত দ্বিগুণ করে দিয়ে যায়। শেষ তীর খুলে পড়া পর্যন্ত আমি তাদের ঝেড়ে যাই।

আমার চোখ পড়ে আমার তর্জনি দুটির উপর। আপন পাপের শক্তিতে সোজা হয়ে তারা আমার চোখের দিকে উঠে আসে। তারা হামিদের নাকে ঢুকে গিয়েছিল। মানুষের নাক যে এত গভীর, তা আমার এভাবে আবিষ্কার করতে হল। আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম তা হামিদের নাকের ভেতর ছিল না। না চুল, না অন্য কিছু। পৃথিবীতে এমন পরিষ্কার নাক বুঝি দ্বিতীয়টি ছিল না। সেই নাকে ধোঁয়া। যার থেকে এক সময় শত মাইল বেগে দৌড়ে পালিয়েছি।

এখন আমার আঙ্গুলের ডগা থেকে সেই ধোঁয়া বের হয়, হামিদের নাক দিয়ে বের হওয়া ধোঁয়া। ধোঁয়া আমার নাকে প্রবেশ করে।

ধোঁয়ার স্মৃতি অসহনীয়। আমি সাবধান হই। আমার দেহে ম্যালেরিয়া রোগীর কাঁপন ওঠে। বোধ হয় আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। মাথাটা একটা চক্কর দেয়।

আমি চেষ্টা করি সোজা থাকার। যেই ভাবি সেই কাজ। দুই হাতের তালু দেয়ালে চেপে ধরি। পায়ের আঙ্গুলগুলিকে মেঝেতে ঠেসে ধরি। নিঃশ্বাস নিয়ে নিয়ে দেহের মধ্যে শক্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করি। পা দুটিকে বলি, শক্ত হ। দেহের শক্তি পায়ে জড়ো করি। নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কী নাম তোর? উত্তর আসে, শিশিরকণা।

“মনে রাখিস,” আমি বলি।

তিন

আমি সোজা হয়ে দাঁড়াই। সাবানের বোতলের ঢাকনায় চাপ মারি। সাবান বের হয়ে হাতের তালু ভরে যায়। তালু থেকে উপচে গিয়ে বেসিনেও সাবান পড়ে। খোলা কলের নিচে। পানির ছিটার সাথে বাড়ি খেয়ে কিছু সাবান আমার জামায় লাগে। আমি ডলে ডলে হাত ধুই। দুই তর্জনি এক করে পানির নিচে ধরি। ফিস্টার কম্পানির সেরা কল। প্রবল জলবেগ। যত ধুই, তত যেন ওই দুই আঙ্গুলের মাথা থেকে ধোঁয়ার উদ্গীরণ বেড়ে চলে।

এবার কী শুরু হবে আমি জানি। বুকের ধুকধুকানি। আমি তা গ্রহণ করি। আমার মস্তিষ্ককে বলি, এত সাবান দিলাম, এত পানি দিলাম, তারপর তো আঙ্গুল অপরিষ্কার থাকার কোনও কারণ নাই। শরীরের ভেতরের পথঘাট কীভাবে পরিষ্কার হয় তা আমার জানা আছে। আমি এই পরিমান পানি পান করি যাতে সব সময় জলের রঙের পানি বিয়োগ করি। হামিদের বিয়োগকৃত পানি ছিল সোনালি, হামিদের পানীয়ের রঙের রং। সেই থেকে আমার পানির রঙের পানি বিয়োগের খেয়াল মাথায় চাপে। আমি পরিষ্কার আছি, মগজ, আমি বলি। খেয়াল আসেঃ শুধু মগজইতো মন নয়। আমি, আমার দেহ, মগজ, সব কিছুর সমষ্টি আমার মন। আমি মনকে বলি, মন, তুই যুক্তি মানবি না, আমিও তোকে প্রশ্ন করা বন্ধ করব না। দেহকে বলি, মনের কাছে তোকে বিজয়ী ঘোষণা করতে হবে। মন তোর। তুই মনের হয়ে যাসনে। মনের কাছে তোর পরাজিত হওয়া চলবে না। পাগলের মতো হওয়া যাবে না। কিছুতেই না। ওসিডি। তোর তেজ কমানোর জন্য আমি ক্ষণে ক্ষণে হামিদের মতো উত্থিত হব। খেঁচার তুফান তুলে আমি তোর পতন ঘটাব। দেখি তুই কতবার আসতে পারিস। আর আমি কতবার সচেতন হতে পারি।

আমি পানির নিচ থেকে হাত দুটি সরিয়ে আনি। অনুধাবন করি, আমি এখনও ক্ষমা করিনি। প্রকৃতি থেকেও কিছু শিখিনি। শিখলে মেনে নিতাম প্রাণিজগতে মা-সন্তানের মধ্যে ছাড়া বিরাজমান সকল বন্ধন অনিশ্চিত। পাগলকে এমন এক সময় কষ্ট দিলাম যখন আমার এই অনুভব এল। নাকি কষ্ট দেয়ার ফলে তা বুঝলাম?

আমি কেন ক্ষমা করলাম না? ক্ষমা করা চর্চার বিষয়। আমি তা করিনি। ক্ষমা অনেক উপকারী, আমি এটা শিখেছি, যেমন ইস্কুলের বাচ্চারা শেখে মঙ্গল গ্রহের ব্যাসার্ধ কত। ক্ষমার চর্চা কি সহজ? কাঙ্ক্ষিত জীবন যাপন কি সহজ? ক্ষমা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই আমি নতুন জীবন শুরু করেছিলাম। আমি তা করতে পারিনি।

না পারার কারণ আছে। আমার মাথা আমার কাঁধে নেই। এখন যেটা আছে সেটা আর মানুষের মাথা নয়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হাসপাতালে গিয়ে স্ক্যান করিয়ে ফিল্মের মধ্যে নিজের মস্তিষ্কটার গঠন নতুন করে দেখে নিই। এক দিন হয়তো মস্তিষ্কের ছবি না দেখে স্বয়ং মস্তিষ্কটাকেই দেখতে চাইব। নিজের মস্তিষ্ককে

তুলনা করতে চাইব এক জন সচেতন মানুষের মস্তিষ্কের সাথে। কোথায় কোথায় আমার মস্তিষ্কে খাদ আছে আমি তা দেখতে চাইব। কারণ তা মেরামত করে পরিপূর্ণভাবে সচেতন মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তর করতে চাই আমি। জ্ঞানের বইগুলি বলে এটা করা সম্ভব। তবে তার জন্য আমার আর একটা পতন দরকার। এমন পতন যেখানে এক মুহূর্তও আত্মবিস্মৃতির সুযোগ থাকবে না। সিসিফাস এক মুহূর্তও আত্মবিস্মৃত হয় না। তারপরও পাথরটা তাকে এক বার করে মাড়ায়, যখন সে চূড়ার কাছে পৌঁছে। আত্মবিস্মৃত হলে পাথরটা তাকে পর্বতের ওই ঢালু পথে হাজার বার মাড়াত।

শিশিরকণা, আমি নিজেকে বলি। হয় ধোঁয়াকে মেনে নে। না হয় ধোঁয়া পরিষ্কার কর্। মাঝামাঝি থাকিস না। সিদ্ধান্ত নে। সিদ্ধান্ত।

চোখ বন্ধ করে আমি মনের চোখে সিসিফাসকে দেখি। দেখি দীর্ঘ পথ ধরে বিশালদেহী সিসিফাস পাথরটাকে উপরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক উপরে পৌঁছে গেছে সে। সিসিফাসকে এখন অনেক ছোট দেখাচ্ছে। পাথরটা নিজেই একটা ছোটখাট পাহাড়ের সমান। সিসিফাস তা ঠেলে চলেছে। আপন গতিতে। আপন ছন্দে। কঠিন তার মনোযোগ। দৃঢ় তার পথ চলা। সিসিফাস গান গাইছে। *মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে। আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে।* বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টিতে সিসিফাস সাজা খাটছে। সিসিফাসের দৃষ্টিতে সে কর্তব্য করছে। সানন্দে। সে গলা ছেড়ে গায়। *স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর। এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে।*

আমি সিসিফাসের সবল পায়ের দিকে তাকাই। আর সচেতনতা দিয়ে নিজের পায়ে আমার মনোযোগ দিই। অনুভব করি আমার পা থেকে মোমের তারল্য চলে যাওয়া। পায়ে রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে, তা-ও অনুভব করি। আমার টলটলায়মান অবস্থা অটল হতে থাকে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিজেকে অনুভব করি। অনুভব করি আমার নারীর শরীর।

আমি হাতের মধ্যে শীতল পানির ছোঁয়া নিই। দুই গালে পানি লাগাই। এক কোশ পানি দুই গালে চেপে ধরি। তারপর কোশের পর কোশ পানি নিয়ে দুই গাল ঠাণ্ডা করি। নিজের গালের ত্বক নিজে অনুভব করি। গাল। সুখখাল। সমান রং। সমান নরম। আমি কুলি করি। খোলা চোখ আর কপালে পানির ছিটা দিই। শ্বাস নিই। শ্বাস বের করি। অনুভব করি হৃৎপিণ্ড অম্লজানপূর্ণ পরিশুদ্ধ রক্ত উৎসারিত করে। সে রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এক ঢেউ মাথার তালুতে পৌঁছে। এক ঢেউ পায়ের তালুতে।

আমি দুই হাত জোড় করে ত্বক থেকে ত্বকে তরঙ্গপ্রবাহ অনুভব করি। বাথরুমের মেঝেতে আর পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই আমার। আমি হামিদের ভূতকে বলি, ‘‘যতবার তুই ফিরে আসবি, ততবার আমার লাথি খাবি। দেখি তোর মাজায় কত জোর? আর আমার পায়ে কত শক্তি? আমি শিশিরকণা। তোর মতো নিচু মরণ আমি মরব না। মুক্তি অর্জন না করে আমি যাব না। আমি চোখ খুলে, কান খাড়া রেখে, নিজের শক্তি দিয়ে পৃথিবীর গন্ধ শেষবারের মতো বুক ভরে গ্রহণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব। বাইরের কোনও শক্তির উপর আমি নির্ভর করি না। এমনকি রাগমোচনের জন্যও না।

চার

হামিদের ভূত এমন সময়ে এল যখন আমি ভূতে না করি বিশ্বাস, না পাই ভয়। অথচ হামিদকে খুন করার পর আমি ভূতের ভয়ই পাচ্ছিলাম।

বিপর্যয়ের প্রথম ধাক্কা কাটতে আমার এগারো দিন সময় লেগেছিল। ওই এগারো দিন আমি বার বার আশঙ্কা করছিলাম এই বুঝি হামিদ ভূত হয়ে আমার সামনে হাজির হবে। রাতে আমার সামনে হাত-পা ছুঁড়বে, আমার গলা চেপে ধরবে, কিংবা দিন-দুপুরে আমাকে পেছন থেকে তাড়া করবে। অথবা যে জিনিসটাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পেতাম, হামিদের অনিয়ন্ত্রিত কামনার রোগ, তাতে ভর করে হামিদের ভূত আমাকে জাপটে ধরবে।

না, হামিদ তখন ভূত হয়ে আসেনি। এমনকি আরও যে সব জিনিস ভয় পেতাম যথা সাপ, ব্যাঙ, তেলাপোকা, টিকটিকি, তাদের বেশেও সে এল না।

হামিদ এল ভার হয়ে। এগারো দিন পর আমি টের পেলাম হামিদের লাশ কুণ্ডলীকৃত হয়ে আমার হৃৎপিণ্ডে ঢুকে গেছে। আমার মা, যে খুনের পর ওসিডির হাতে আত্মসমর্পণ করে, আমাকে বলেছিল, আমার উচ্চতা তখন তিন ইঞ্চি কমে গিয়েছিল। আমার মতো শক্ত-সবল একটা মেয়ের মেরুদণ্ড তিন ইঞ্চি সঙ্কুচিত করতে হলে আমার মাথার উপর তখন কমপক্ষে পাঁচ মন ওজন চাপাতে হত। খুনের এগারো দিন পর আমি টের পাই আমার বুকের ভেতর পাঁচ মন ওজনের লাশের ভার গুটিয়ে আছে। তবু ভাগ্য ভাল বলতে হবে। কারণ লাশটা তার বাসস্থান হিসাবে আমার জরায়ুও বেছে নিতে পারত। কিন্তু তা তো আমি সহ্য করতাম না।

দুটি ঘটনা এখানে প্রাসঙ্গিক। কোনটা কখন ঘটল তা সাথে সাথে বলতে পারিনি। আমার তখন সময়ের আন্দাজ ছিল না। তবে এখন কিছুটা ধারণা করতে পারি। প্রথম ঘটনাটা সকালের দিকে ঘটেছিল। সেটা সম্ভবত ছিল খুনের ত্রয়োদশ দিন। আমরা তখন গুলশানে থাকি। একটা সরকারি বাড়িতে। আব্বা তখন রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র সচিব। আব্বার জন্য বরাদ্দকৃত বাড়িটার পেছনে একটা বড় আম গাছ ছিল। এর আগের বছর জুন মাসে ওটা থেকে পাঁচ মন ল্যাংড়া আম পাড়া হয়েছিল, যার অর্ধেক খেয়েছিল আমার ছোট ভাই রাশেদ। হামিদের লাশের ভার বুকে নিয়ে আমি জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি আম গাছের ডাল থেকে একটা মরা কাঠবিড়ালি পৃথিবীতে পড়ে থ্যাতলে যায়। সবুজ শেওলার আবরণযুক্ত কালো শানের উপর। খুনের পর সেই প্রথম আমি খেয়াল করি আমি কোথায় আছি, আমার সামনে কী ঘটল। আমি পচা প্রাণির গন্ধ পাই, যার থেকে চিরতা ভেজানো পানির রঙের তরল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই ফাঁকে আতঙ্কটা আমার মাথা চেপে ধরে। আমি ভাবি কী হবে যদি আমার বুকের ভেতর হামিদের লাশ গলতে থাকে? চিরতা রঙের লাশের তরল আমার দেহের সব দিকে ছড়িয়ে যাবে। সিরিঞ্জ দিয়ে বের করলে দেখা যাবে আমার দেহে রক্ত নেই, আছে লাশের তরল। কংকালের হাড়গুলি আমার বুকের ভেতর থেকে খোঁচা দেবে। আমি সংক্রমণ আর বিষক্রিয়ায় মরে যাব। এমন এক মরণ যার কারণ কোনও ডাক্তার পরীক্ষা করে বের করতে পারবে না।

আমাকে বিষক্রিয়ার আতঙ্ক পেয়ে বসে। আমার সময় কাটতে চায় না। এক মিনিটকে এক বছর মনে হয়। খুন করেছি বলে আব্বা বা মা কেউ আমার কাছে আসত না। যদিও পেছন থেকে আমার জন্য সব কিছু করে যেত। আমারও মন খুলে সব কথা কাউকে বলার মতো অভিরুচি ছিল না। আমি খুনের শাস্তি একাকি ভোগ করতে চেয়েছিলাম। যেহেতু থানা-পুলিশ হয়নি, তাই আব্বা আর মা নিজেকে অনেক বেশি অপরাধী মনে করত। শত্রুতা করেছিল শুধু আমার ভাই রাশেদ। তখন আমি যতই অপেক্ষা করি হামিদের লাশ পচার জন্য, ততই মনে হয় হামিদের লাশ দিন দিন তাগড়া হচ্ছে। তার ভার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি আরও অচেনা লাগে যখন আমার পৃথিবী গুমোট হতে থাকে। একদা আমি বুঝতে পারি কেন হামিদের লাশ বিষক্রিয়া ছড়াল না। কারণ আমি তখন মরতে প্রস্তুত ছিলাম না। আমি প্রস্তুত ছিলাম কষ্ট সহ্য করার জন্য।

আসল কষ্টটা আসে দ্বিতীয় ঘটনার পর। একটা বজ্রপাত। মে মাসের কোনও এক দিন হবে। সন্ধ্যা নেমে গেছে। এমন গরমে সবাই ঘামে। আমি ঘামি দশগুণ; আমার দেহে হামিদের লাশ বহনের শ্রম।

জানালার রড ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। বজ্রের শব্দে আমি কেঁপে উঠি। শুধু আমি কেন? সারা শহর কাঁপে। আমাদের ইটের বাড়ি ধাক্কা খায়। তখন সচেতনতা আমার কাছে ক্ষণিকের জন্য ধরা দেয়।

আমার ধোঁয়ার ভয় শুরু হয়। আমি ভাবি হামিদ আমার ভেতর অলস বসে আছে। সিগারেট খাওয়া ছাড়া তো ওর আর কোনও কাজ নাই। হামিদ জানে আমি সিগারেটের ধোঁয়াকে কত ভয় পাই। আমি বুঝি হামিদ কেন ভূত হল না। আমার মধ্যে ধোঁয়ার ত্রাস সৃষ্টির জন্য ভূত না হয়ে সে আমার ভেতর আস্তানা গেড়েছে। আমি বজ্রের মুণ্ডুপাত করি, মুণ্ডুপাত করি সচেতনতার। আমি তখন জানতাম না সচেতনতাতেই মানুষের মুক্তি। জানতাম না বলে ধোঁয়ার ত্রাস আমাকে কাঁপিয়ে দেয়, অথচ তখন আমার জন্য কাঁপা কঠিন ছিল, কাঁপলে হামিদের লাশ আমাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলে। ধোঁয়ার ভয়ে আমি কেঁদে ফেলি।

পাঁচ

জীবিত হামিদ একটানা সিগারেট খেতে পারত। এক বার আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য সে চব্বিশ ঘন্টায় দু'শ একচল্লিশটা সিগারেট খেয়েছিল। ওটা ছিল শনিবার। হামিদ ওর ব্যক্তিগত সহকারি মাকসুদকে দিয়ে সিগারেটের বাটগুলি আমার সামনে গুনিয়েছে। লাল টি-শার্ট পরা ঝাঁকড়া চুলের মাকসুদ দাঁত কেলিয়ে নাচতে নাচতে বড় একটা অ্যালুমিনিয়ামের ট্রে নিয়ে আসে। ট্রে-টা ঘরের মেঝেতে রেখে মাকসুদ ঝুল বারান্দা, বাড়ির ছাদ, ফুলের টব, সিঁড়ি, গ্যারেজ, গাড়ি, খাটের তলা, দেয়ালের কানা, টেবিলের পিঠ, চেয়ারের গোড়ালি, জানালার ধার, আলমারির চিপা, জুতার তলা আর তেরোটা ছাইদানি থেকে সিগারেটের গোড়া সংগ্রহ করে আর সেগুলিকে এক জায়গায় রাখে। মাকসুদ বাথরুমে ঢোকে। মনে হল সে তার পোঁদের ফুটোয় আটকে থাকা কিছু সিগারেটের গোড়া বের করতে গেছে। মাকসুদ অবশ্য কয়েকটা সিগারেটের গোড়া হাতে করে বাথরুম থেকে বের হয়ে আসে। তারপর সংগৃহীত বস্তুর সামনে বসে গুনে গুনে দশটা করে সিগারেট বাটের একটা স্তূপ সে ট্রের মধ্যে রাখে। কোনও কোনও সিগারেট হামিদ এতটাই টেনেছে যে, ওগুলোর গোড়ার চেয়ে আমাদের মতো শক্তসমর্থ মেয়েদের জাগ্রত বোঁটা বেশি লম্বা হয়। মাকসুদ মাথা ঘুরিয়ে ওগুলি দুই আঙ্গুলের চিপায় চুনুট পাকিয়ে আমাকে দেখায়। কোনও কোনও স্তূপের বাটগুলি মাকসুদ দ্বিতীয় বার গোনে। নীল জিন্সে আবৃত মাকসুদের চিমসানো পাছা থেকে ক্ষমতার আলো ঝরে। আমি যে তার মনিবের স্ত্রী, মাকসুদ সে কথা ভুলে গেছে। স্তূপগুলোর সামনে বসে মাকসুদ মাথা তুলে আমার দিকে চায়। আমি ওর চৌদ্দ কি ষোলোটা দাঁত দেখি। দেখি ওদের রং: ঝিনুকের বুকের মতো, মাদার অফ পার্ল। ধোঁয়ার দাগ পড়া দাঁত।

"এতগুলান, এতগুলান," মাকসুদ বলে। "স্যার আমারে কিছু দিবার পারত।"

হামিদ এসে তার ডান হাঁটু দিয়ে মাকসুদের পিঠে ঠেলা দেয়। মাকসুদ তিড়িং করে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। "ও কি তোমার সাথে বেয়াদবি করেছে?" হামিদ আমাকে জিজ্ঞেস করে।

আমি বলি, "না।"

হামিদ আমাকে বিশ্বাস করে না। হামিদ এক কদম পিছিয়ে গিয়ে মাকসুদের দুই গালে ঠাস ঠাস দুইটা থাপ্পড় মারে। মাকসুদের গাল লাল হয়ে যায়। হামিদ মাকসুদকে আর একটা থাপ্পড় মারে। মাকসুদের ডান চোখ থেকে বড় এক ফোঁটা জল লাফ দিয়ে বের হয়ে ওর থুতনিতে বাড়ি খায়। হামিদ ঠেলে মাকসুদকে ঘর থেকে বের করে দেয়। আমি হামিদের এই আন্তরিকতা কখনও ভুলিনি। আর ভুলতে পারিনি মাকসুদের কালো পরিষ্কার থুতনিতে ঝুলে থাকা ওই বিশাল অশ্রুর ফোঁটা।

মাকসুদের জায়গায় হামিদ বসে। মাকসুদের মতো গোড়ালির উপর ভর করে নয়। পাছার উপর আরাম করে। বিয়ারের মেদে ভারী হামিদের ডবকা পাছা। নাদুসনুদুস মেয়েদের মতো। হামিদ ট্রে-টা কোলের উপর টেনে নেয় আর আমাকে স্তূপগুলো গুনে দেখায়: চব্বিশটা স্তূপ। তেইশটা স্তূপের প্রতিটাতে দশটা করে সিগারেটের গোড়া। আর চব্বিশ নম্বর স্তূপে এগারোটা।

হামিদ ভেবেছিল ওই ঘটনার পর সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে আর অসুবিধা হবে না আমার। ও জানত জলাতঙ্ক রোগীর এক মাত্র চিকিৎসা হল হাত-পা বেঁধে তাকে পুকুরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা। হামিদ আমাকে তার জ্ঞানমতো চিকিৎসা দেয়। তাতে আমার সিগারেটের ধোঁয়ার ভয় আরও বেড়ে যায়।

হামিদের লাশ আমার সামনে থেকেই তুলে নেয়া হয়েছিল। অ্যাম্বুলেন্সের মানুষগুলি। হলুদ অ্যাপ্রন পরা। ডাক্তারের গায়ে অ্যাপ্রন ছিল না। ডাক্তার এসেছিল পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে, বোধ হয় সরাসরি বাসা থেকে গিয়ে সে অ্যাম্বুলেন্সে উঠেছিল। আমি সবই দেখেছি। অথচ হামিদের মৃত্যুর সতেরো দিন পর আমার মনে হল, ওর লাশ ঘরেই পড়ে ছিল। আর কোনও এক কেরামতিতে তা আমার ভিতর ঢুকে গেছে। আর আমি আতঙ্কিত হই। গার্মেন্টস ব্যবসায় ব্যস্ত থাকা জীবিত হামিদ নানান কাজকর্ম সেরেও যদি ঘন্টায় দশটা সিগারেট খেতে পারত, তবে মৃত এবং কর্মহীন হামিদ আমার ভেতরে বসে ঘন্টায় কয়টা সিগারেট টেনে চলেছে? আমি ধোঁয়া সহ্য করতে পারতাম না বলে হামিদ যদি দিনে দুশ একচল্লিশটা সিগারেট টেনে আমাকে সাজা দিতে পারে, ওকে মেরে ফেলার সাজা হিসাবে ও এখন দিনে কয়টা সিগারেটের ধোঁয়া আমার নাভির কাছে ছেড়ে চলেছে। হামিদের যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। মালবোরো ছেড়ে নিশ্চয় এখন ও রেঙ্গুনী বিড়ি ধরেছে, যাতে সে আরও কটু ধোঁয়া ছাড়তে পারে।

যত ভাবি তত শিউরে উঠি আমি। হঠাৎ হঠাৎ গায়ে এমন কাঁটা দেয় যে, জীবনে প্রথম লক্ষ করি আমার কব্জিতেও পশম আছে। আমি গর্ব করতাম আমার শরীরের কোনও অপ্রয়োজনীয় জায়গায় কোনও পশম নাই। আমাকে কখনও উরুর উপর ব্লেড চালাতে হয়নি। ধোঁয়ার আতঙ্কে আমার ভুল ভাঙ্গে। রোমহর্ষ আমাকে অদৃশ্য জিনিস দেখিয়ে দেয়। আমার খিঁচুনি আরও বাড়ে যখন আমি আমার হাত আর পায়ের দিকে তাকাই। দেখি সব আঙ্গুলের মাথা থেকে ধোঁয়া বের হয়। সবচেয়ে বেশি বের হয় নাভি দিয়ে। আমি পাজামার ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখি। সামনে থেকে। পেছন থেকে। নিকোটিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, ফর্মালডিহাইড, সীসা, আর্সেনিক, অ্যামোনিয়া, বেনজিন, কার্বনমনোক্সাইড। মুখ দিয়ে কেন নয়, আমি ভাবি। মনে হয় মৃত হামিদ ভারী ধোঁয়া ছাড়ে। যা এত ভারী যে উপরের দিকে উঠতে পারে না।

তত দিনে কাগজে কলমে আমি রসায়ণবিদ হয়ে গেছি। আমি তখন বিরতিহীনভাবে ধোঁয়ার উপাদানগুলির কথা ভাবি। এতগুলি রাসায়নিক পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য আমি কী শরবত পান করতে পারি? হামিদ বেঁচে থাকতে ধোঁয়ার গন্ধ কমানোর জন্য ঘরের মধ্যে ভিনিগার আর লেবুর রস ছিটাতাম। আমি যখন আমার ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখি তখন আমাদের অন্যতম গৃহপরিচারিকা আক্লিমা আমার পাশে ছিল। আমি আক্লিমাকে জিজ্ঞেস করি সে ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে কি না। আক্লিমা বলে, না, সে কোনও ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে না। আমি আক্লিমাকে গালি দিই। আক্লিমা বলে সে ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে। আমি আক্লিমাকে বলি আমার জন্য ভিনিগার আর লেবু দিয়ে শরবত বানিয়ে আনতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আক্লিমা গেলাশে করে শরবত নিয়ে আসে। আমি তার এক ঢোক গিলতে না গিলতে বমি করে ফেলি।

আমি ধোঁয়ার শাস্তি হজম করি। না করে আমার কোনও উপায় ছিল না। আমি জেদ ধরেছিলাম। দেখি কত সাজা আমি হজম করতে পারি। নিজেকে বার বার বলি, অপরাধী হামিদকে খুন করে এটুকু শাস্তিতো তোকে পেতেই হবে। আর ধোঁয়াটা যে আমার মনের রোগ ছিল তাতো বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে লাশের ভারটাও কি মনের রোগ ছিল? এ বিষয়ে আমি বিহ্বল ছিলাম। কারণ ওজনটা আমি অনুভব

করতাম। মাঝে মাঝে আমি আমার পা দুটি পরীক্ষা করতাম। দেখতাম ওগুলো বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত শিশুদের পায়ের মতো বাঁকা হয়ে গেছে। তারপরও মনে সন্দেহ থাকত। এক দিন পাজামার দড়ি খুলে দিই, খালি পা দেখার জন্য। কে বলেছে আমার দেহে চুল নাই। আসলে গোসল নাই। পরিচর্যা নাই। আর আমিতো পা দেখতে চেয়েছিলাম। দেখি, আমি ভুল করিনি। সন্দেহ থাকে না যে, মৃত হামিদের ভারে কিছু দিনের মধ্যে আমার পা দু'টি একটা বৃত্তের রূপ নিবে। আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না পায়ের কাছে লুটানো পাজাম তুলে আবার তা কোমরে বাঁধা। আমি আক্লিমাকে ডাকি।

লাশের ভার আমার নড়নচড়ন পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। ছাব্বিশ দিন দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওই সময় এক মুহূর্ত বসতেও পারিনি, কখনও বিছানায়ও যাইনি। প্রাত্যহিক সব কাজ দাঁড়িয়ে সেরেছি। সব কাজ মানে সব কাজ। প্রথম চার দিন জাউ খেয়েছি। বাকি বাইশ দিন ডাবের পানি। জানালার রড ধরে দাঁড়িয়ে থেকে ঘুমিয়েছি। ঘুম মানে ঝিম মেরে থাকা। মাঝে মাঝে শার্সিতে মাথা ঠুকে যেত। চার বার কপাল কেটে রক্ত বের হয়েছে।

এত কষ্টের মধ্যেও যখন মাসিক হয় তখন আনন্দ আর ধরে রাখতে পারিনি। রক্ত দেখে যে সুখ পেলাম তা বলে বোঝাতে পারব না। আক্লিমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম। জীবনে কখনও এমন সুখ আগে অনুভব করিনি। সুখের সাথে আসে সচেতনতা। রক্ত প্রবাহ দেখে বুঝতে পারি আমার চারিদিকে কী হচ্ছে। আমি বৃষ্টির শব্দ শুনি। আমার হাতের উপর বৃষ্টির ফোঁটার ছিটা পড়ে। আমি তার শীতলতা অনুভব করি। আষাঢ় মাসের প্রথম দিনের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

আহা! যদি আমি খুন না করতাম!

ছয়

কিন্তু হামিদকে খুন না করে আমার কোনও উপায় ছিল না। বরং তখন আফসোস হয়েছিল আরও কয়েকটা খুন করতে না পারার জন্য। শুধু একা হামিদকে খুন করা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ছিল। আমি সব অপরাধীকে ছেড়ে দিয়ে যখন শুধু হামিদকে খুন করলাম তখন হামিদের আসল অপরাধ চাপা পড়ে যায়। উঠে আসে তার মামুলি অপরাধগুলি। যেমন সিগারেট খাওয়া। সিগারেট খাওয়ার জন্য কেউ কি কাউকে খুন করে? না, করে না। কিন্তু এত বড় জটিল হিসাবতো আর এক বাক্যে মিলিয়ে দেয়া যায় না।

তবে হামিদকে খুন করে কিছু বাড়তি লাভ পেয়েছিলাম। আঙ্কুরা, হৃদয়া, আয়শা, তন্বী, তাম্বুরি, মোহিনী, শারিকা। খুনের পর এদের লাইভ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমি এদের লাইভ দেখতাম। আমিই সিনেমাগুলির পরিচালক ছিলাম। আমি সানন্দেই এই সব ম্যুভি পরিচালনা করতাম। আমার ক্ষোভ ছিল আমার চাহিদা পূরণ না হওয়াতে। আমার চাহিদা ছিল আলাদা বিছানা। হামিদ তা দিতে রাজি ছিল না। হামিদের কথা ছিল বিছানা আলাদা করলে আম্মা মরে যাবে।

তোমার আঙ্গুল মারা আম্মা, মরে গেলে মরে যাক, আমি বলেছিলাম। হামিদ বলল, তা কী করে হয়? আম্মাকে আব্বা তার বিছানা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আম্মা যদি দেখে তার ছেলেও তার বউকে বিছানা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তা হলে আম্মা মরে যাবে।

তরী চৌধুরীর জীবন রক্ষা করার জন্য আমাকে হামিদের সাথে ঘুমাতে হবে? হামিদ বলল, কেন, তরী চৌধুরীর জীবনের কী কোনও দাম নাই? সে কইতরি বেগম থেকে তরী চৌধুরী হয়েছে, এই জন্য তার

জীবনকে তুচ্ছ মানতে হবে? আর তুমি শিশিরকণা হয়ে জন্মেছো, শিশিরকণাই রয়ে গেছো, শিশিরকণাই থাকবে, এই জন্যই কি শুধু তোমার জীবনের দাম? এটা কেমন কথা, শিশিরকণা?

আমি হামিদের কথার যুক্তি অস্বীকার করতে পারি না। তরী চৌধুরীকে তার স্বামী বিছানা থেকে বের করে দিয়েছে, সে জন্য তরী চৌধুরী শাস্তি পাচ্ছে। তরী চৌধুরীর ছেলে তার নিজের স্ত্রীকে বিছানায় আটকে রেখেছে, সে জন্য আমি শিশিরকণা শাস্তি পাচ্ছি। তরী চৌধুরীর ছেলে যাতে ছেলের বউকে বিছানা থেকে তাড়িয়ে না দেয়, তরী চৌধুরী তা দিনরাত খেয়াল রাখে। যখন তখন সে আমাদের ঘরে ঢোকে। রাতে চার থেকে ছয় বার আমাদের বেডরুমের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়। বারান্দায় মার্বেলের ফ্লোরে চপ্পলের ঘষা দিয়ে উপস্থিতি জানান দেয়। আমি জানি বাতিঘর জ্বলছে। জ্বলবে না কেন? তরী চৌধুরীর চোখে ঘুম নাই বিছানা আলাদা হওয়ার জন্য। আমার চোখে ঘুম নাই হামিদের সাথে এক বিছানায় আমাকে ঠেলে দেয়ার জন্য।

হামিদ যদি আমাকে আলাদা বিছানায় থাকতে দিত, তাতে তরী চৌধুরী যে মরেই যেত, তা অবশ্য হলফ করে বলা যেত না। তবু তরী চৌধুরী মরে যাক, আমি তা চাইতাম না। কিন্তু তারপরও আমি হামিদকে সহ্য করতে পারতাম না। তবু সহ্য করে গেছি। হয়তো শেষ পর্যন্ত করতাম। কিন্তু হামিদতো জহিরকে পৃথিবী থেকে সরিয়েছে। হামিদ জহিরকে হত্যা না করলে আমি তার জন্য অবশ্যই কিছু একটা করতাম। যদিও হামিদ নিজ হাতে জহিরকে খুন করেছে কি না, আমার তা জানা হয়নি। হামিদের খুন করার সাহস নাই এটাই আমার মনে হয়। জহিরের হত্যার সাথে হামিদের সংশ্লিষ্টতা ধরা পড়ার পর হামিদ আমার সাথে আর একটা সত্য কথাও বলেনি। অবশ্য ভয়েই বলেনি। তখন থেকে হামিদ সত্য কথা বলা ভুলে গেছে। হামিদ মিথ্যা কথা বলত বলে আমি আরও বেশি চটে যেতাম। ওই সময় এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে ভাল অফারটা আমিই হামিদকে দিয়েছিলাম। আমাকে তালাক দিতে। আমি বললাম, হামিদ, পাঁচ কোটি টাকার কাবিনের এক টাকাও আমার দরকার নাই। আমি শুধু তালাক চাই।

হামিদ আমাকে তালাক দেবে না। কারণ হামিদের তালাকের খবর পেলে নাকি তার গ্রামে থাকা দাদি ছলেমা বেগম মরে যাবে। হামিদের অনেক আদরের দাদি। যাকে বালাখানা বানিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে বালাখানায় থাকে না। শনের ঘরের ভেতর শুটকির বৈয়াম নাকের কাছে খুলে না শুলে নাকি তার ঘুম আসে না। হামিদের এমন আদরের দাদি সে। আমি বললাম, হামিদ, আমি ছলেমা বেগমকে বাঁচাই, তুমি লাইভ খেলো। আমি সব প্রযোজনা, পরিচালনা ও পরিবেশনা করব। শুধু আমাকে একটা আলাদা খাটের ব্যবস্থা করে দাও, তাও প্রতি রাতে ছয় ঘন্টা করে। আর না ঘুমিয়ে আমি থাকতে পারছি না।

হামিদ বলে ঘুমের ওষুধ খাও। আমি ঘুমের ওষুধ খাই। হামিদ বলে আমি তোমাকে চাই। আমি দুইটা করে ঘুমের ওষুধ খাই। হামিদকে বলি যা করার তা আমার ঘুমের মধ্যে করে নিয়ো। হামিদ চেষ্টা করে আমি যখন ওষুধ খেয়ে ঘুমে থাকি তখন কাজ শেষ করার। আমার হামিদকে লাত্থি মারতে ইচ্ছে করে। ঘুমের বড়ি খেয়ে যে ঘুম হয় তার দংশন জেগে থাকার দংশনের চেয়ে খারাপ। ঘুমের ওষুধ খেলে আমি ঘুমের দেশে না গিয়ে স্বপ্নের দেশে চলে যেতাম। এক এক বার মনে হত আমি হামিদের সাথে একশ বছর কি দুশ বছর ধরে রতিকর্ম করছি। হামিদ বছরের পর বছর বিরতিহীন ভেতর বার ভেতর বার করে যাচ্ছে। সে যে কী আতঙ্ক। যার সাথে এক দিন থাকতে পারি না, তার সাথে এক এক বার একশ বছর রতিকর্ম করা। দুনিয়া তো আর বেহেস্তখানা নয়। যে পাঁচ মিনিট ভেতর বার করলে গলার-অর্ধেক-কাটা হাস, মুরগি, গরু, ছাগলের জবাই হওয়া থেকে প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের পাঁচ মিনিটের ছটফটের মতো আমি ছটফট করি, সে আমার দুঃস্বপ্নে বছরের পর বছর ভেতর বার ভেতর বার করে গেলে কেমনটা লাগে। আমি দেখি আমার বরং জাগরণের শাস্তিই ভাল, ঘুমের বড়ির ঘুম নামের দুঃস্বপ্নের শাস্তি থেকে। জাগরণে আমি সময়মতো হামিদকে ঠেলে সরাতে পারি। দুঃস্বপ্নের মাঝে আমি তা পারি না।

আমি হামিদকে বলি, হামিদ, তুমি মা আর দাদিকে বাঁচাও। আমি আমাকে বাঁচাই। এসো আমরা লাইভের সংখ্যা বাড়াই। বিনিময়ে আমার সাথে তোমার কিছু করা চলবে না। হামিদ বলে, সে বরং আর কোনও লাইভই করবে না, তার লাইভের দরকার নাই। "তুমি বরং শুধু তোমাকে দাও," হামিদ বলে।

যদিও হামিদ লাইভে না গেলেও আমার অবস্থার কোনও পরিবর্তন হত না। তবে হামিদ লাইভে যাবে না, ওটা ছিল ওর মিথ্যা কথা। অবশ্য ওই মিথ্যায়ও আমার কিছু এসে যেত না। আমি হামিদকে যতই লাইভ করাই না কেন, হামিদ আমার অগোচরে অতিরিক্ত কিছু লাইভ করত। হামিদ বলত, প্রকাশ্য ও গোপন লাইভ দুইটার দুই রকম মজা। তুমি আমাকে একটার সুযোগ দিচ্ছ, এই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি অন্যটা ছাড়ব কেন? খানাপিনা, পোশাকআশাকে আর কত টাকা যায়? রাস্তাঘাট নাই যে একটা ভাল গাড়ি চালাব। ফের্‌রারা গিয়ে কারখানা থেকে পছন্দ করে একটা ফেরারি এনে কাঁধে করে নিয়ে সেটা আবার ফের্‌রারাতে ফেরত দিয়ে এলাম। লাইভই একমাত্র জায়গা যেখানে একটু হাত খুলে খরচ করা যায়। আর খরচই যদি না করি, তা হলে এত টাকা কামাচ্ছি কেন? কবরেতো যাব খালি হাতে। আর আমার হার্টের ভালভের যে অবস্থা, তাতে যত বেশি লাইভ যত তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে পারি তত ভাল। ফুট্টুশ হয়ে গেলে এত টাকার কী হবে? আর তুমিতো আমাকে বাচ্চা নিতেই দিচ্ছ না। তাতে আমারও বেশি আগ্রহ নাই। কারণ বাচ্চা মানেই লাইভে বাগড়া। বেশি বাচ্চা বেশি বাগড়া। আমার জন্য লাইভই ভাল।

হামিদের আম্মা আর আব্বা বাচ্চার জন্য চাপাচাপি করত। হামিদ তা করত না। এ জন্য আমি হামিদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলাম। তবে আমার বাচ্চা হবে কি হবে না, এ ব্যাপারে আমাকেই সব সাবধানতা অবলম্বন করতে হত। হামিদ কোনও ব্যবস্থায় রাজি ছিল না। কারণ হামিদের পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ মানেই হামিদের আনন্দের কর্তন। হামিদ বলত, আমি ব্যবস্থা নিতে যাব কেন? দুই একটা যদি হয়েই যায়, সমস্যা কী? এত টাকা কে খাবে? আমি বলি, হামিদ চারিদিকে এত অটিস্টিক বাচ্চা, তুমি দেখো না? হামিদ বলে, অটিস্টিক হলে হবে, সমস্যা কী ? নার্স রেখে দেব। যার কাজ সে করবে। টাকা থাকলে আর কোনও সমস্যা থাকে না। আমি বলি, হামিদ তুমি সোনালি জলের উপর আছ। তাই তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কী বলছ। হামিদ বলে, সোনালি জলের উপর আছি বলেইতো সত্য কথা বলতে পারছি। বলো, অটিস্টিক বাচ্চা পালার চেয়ে সহজ কোনও কাজ আছে? নার্সের কাছে ছেড়ে দাও, দায়িত্ব শেষ। সুস্থ্য বাচ্চা হলে ভেবে দেখ কত ঝামেলা। সাথে করে নিয়ে স্কুলে দিয়ে আসা। আবার স্কুল থেকে নিয়ে আসা। কত কত ঝামেলা। এ কথা বলে হামিদ গেলাশে আরও সোনালি জল ঢালে। লাইভের বিবেচনাটা সবার আগে, আর এক ঢোক সোনালি জল গিলে হামিদ বলে। লাইভের ছাড় দেয়ার কোনও সুযোগ নাই।

আমি বলি, হামিদ, আমিও জানি, তুমিও জান, তুমি কোনও লাইভই ছাড়তে পারবে না। এসো আমরা তোমার প্রকাশ্য ও গোপন লাইভ দুটারই সংখ্যা বাড়াই। শুধু আমার সাথে তোমার কিছু করা চলবে না। আর কেন তা চলবে না, সে কথাও বেশি জিজ্ঞেস করতে যেয়ো না।

হামিদ বলে, আমাকে তুমি মেরে ফেলো। হামিদ উড়ে গিয়ে ঠাশ করে ওর আলমারি খোলে। খট করে মাঝের একটা ড্রয়ার খোলে। ডান হাত ড্রয়ারে ঢুকিয়ে হামিদ তার প্রিয় গুলি-ভর্তি-করা রুগার সুপার রেডহক পিস্তল বের করে এনে আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। আমার হাতের উপর হাত রেখে হামিদ পিস্তলের মুখ তাক করে। পিস্তলের মুখ হামিদ তার বুকে ঠেকায়, আর বলে, গুলি চালাও।

আমি গুলি চালাই না, তখন হামিদ আমার দুই হাত নিপুণভাবে ঘুরিয়ে পিস্তলের নল তার মুখে ঢুকায়, গলা পর্যন্ত, লাইভের মতো, আর সহসা আমার দুই হাত ছেড়ে তার দুই হাত দিয়ে ইশারা করে, চালাও গুলি।

আমি হামিদের মুখ থেকে টেনে বের করে পিস্তলটা মেঝেতে ছুঁড়ে মারি। হামিদ একটা ছোট বাচ্চার মতো অভিযোগ করে, আলজিহ্বার মতো দেখতে পিস্তলের নিশানা ঠিক করার ফ্রন্ট সাইট হামিদের আলজিহ্বায় খোঁচা দিয়েছে। আমি বলি, সেরে যাবে। কে তোমাকে বলেছে, পিস্তলের নল গলায় ঢুকাতে?

হামিদ বলে, না হলে তুমি আমাকে মারবে কী করে?

আমি বলি, হামিদ, আমি খুনাখুনিতে নাই। সহজ সমাধান। আমাকে তালাক দাও। এই দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার তালাক হচ্ছে। এক বার তালাকটা দিয়েই দেখো না, মুক্তির কী আনন্দ। সারা বিশ্বে প্রতি ঘন্টায় লক্ষ লক্ষ তালাক হচ্ছে। তুমি আমাকে তালাক দাও, হামিদ। অথবা আমি তোমাকে তালাক দিই। একেবারে আপসে। দেখো, কোনও খরচ নাই, কোনও অসুবিধা নাই। কেউ জানবে না। দুজনেই আমরা মিটমাট করে ফেলতে পারি।

হামিদ বলে, পাঁচ কোটি টাকার কাবিন। আমি তোমার ব্যাংকে দশ কোটি টাকা এখনই ঢুকিয়ে দিচ্ছি। সোনালী ব্যাংকে তোমার অ্যাকাউন্ট, তাই না? তোমার চেকবইটা বের করো। একটা ছবি তুলে নিই। কালকেই তোমার অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে। তুমি শুধু তালাক চেয়ো না।

আমি বলি, তা হবে না, হামিদ। আমার টাকার দরকার নাই। আমি শুধু তোমার থেকে স্বাধীন হতে চাই। আমার কোনও টাকা লাগবে না। তোমার লাগলে তুমি বলো। আমার অ্যাপার্টমেন্ট তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।

হামিদ বলে, টাকার গরম দেখিয়ে তুমি আমার সাথে পারবে, শিশিরকণা?

আমি বলি, পারব না।

হামিদ বলে, তা হলে টাকার গরম দেখিয়ো না। বরং তোমার কত লাগবে, তা বলো?

আমি বলি, তালাক ছাড়া আমি আর কিছু চাই না।

হামিদ বলে, তালাক হবে না। তুমিতো দেখেছো, আব্বা সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে, কচি কচি মুরগি জবাই করছে, কচি কচি ডাব ফাটাচ্ছে। গত মাসে গেছে রোমানিয়া। এই মাসে যাবে নিকারাগুয়া। সামনের মাসে যাবে ইউক্রেইন। চিন্তা করে দেখো। কত হুজ্জতের ব্যাপার। ব্যবসার নামে কচি মুরগির সন্ধানে; কচি ডাবের সন্ধানে; কাস্টমাইজড দুধ, মধু আর ক্ষিরের সন্ধানে। তারপরও আব্বা কিন্তু আম্মাকে তালাক দিচ্ছে না। কারণ তালাক দিলে বাড়ির দারোয়ানরা আমাদের সবার দিকে বাঁকা চোখে তাকাবে; মসজিদের ইমাম বাঁকা চোখে তাকাবে; অন্য চাচারা যারা নতুন নতুন মুরগি জবাই করছে আর নতুন নতুন ডাব ফাটাচ্ছে তারা বাঁকা চোখে তাকাবে; ক্লাবের সবাই বাঁকা চোখে তাকাবে; এফবিসিসিআই’র বোর্ড সভায়, বিজিএমইএ’র বোর্ড সভায়, বিকেএমইএ’র বোর্ড সভায়, মেট্রোপলিটন চ্যাম্বারের বোর্ড সভায়, সবাই বাঁকা চোখে তাকাবে; অন্য চাচিরা যারা তাদের স্বামীদের নতুন নতুন মুরগি ধরা আর তাজা তাজা ডাব ফাটানো মেনে নিয়েছে তারা বাঁকা চোখে তাকাবে; গ্রামের লোক বাঁকা চোখে তাকাবে; শহরের লোক বাঁকা চোখে তাকাবে; সরকারি লোক বাঁকা চোখে তাকাবে; বেসরকারি লোক, এই ধরো ব্যাংকের ম্যানেজার, বাঁকা চোখে তাকাবে; দোকানদাররা বাঁকা চোখে তাকাবে; ড্রাইভাররা বাঁকা চোখে তাকাবে; স্যুটের মাপ নিতে আসা দর্জি বাঁকা চোখে তাকাবে; কারখানার কর্মচারিরা বাঁকা চোখে তাকাবে; চাকরচাকরানিরা বাঁকা চোখে তাকাবে; আরও লজ্জার বিষয় খবরের কাগজে খবরটা পড়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বস্ত্রমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, এবং অন্যান্য মন্ত্রী যারা আব্বাকে চেনে, আমাকে চেনে, আম্মাকে চেনে, এবং আমাদের পরিচিত এবং পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত আরও রাজনৈতিক নেতা, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সাংসদ, আমলা, তারা সবাই আমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাবে; আর যেই

সব মাস্তানকে আমরা নিয়মিত চাঁদা দিই ওরাও বাঁকা চোখে তাকাবে; এমনকি যারা বিয়েশাদির ধার ধারে না, জারজ সন্তান পয়দা করে, নিজ ঘরে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে, আমাদের সেই বিদেশি বায়াররা আমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকবে; এবং দেশেবিদেশে আমি আর আব্বা যাদের সাথে প্রকাশ্যে ও গোপনে লাইভ করি, তারাও বাঁকা চোখে তাকাবে, এমনকি কেউ কেউ আর ভয়ে লাইভই করতে চাইবে না, আবার কেউ কেউ খালি যায়গা পেয়ে বিয়ে করার জন্য চাপ দিবে, উঁচা পেট দেখিয়ে মামলাও করে দিতে পারে, বিয়ের আশায়, ব্ল্যাকমেইল করে কোটি টাকা আদায়ের আশায়। আমাদের পরিবারে তালাক বলতে কোনও বিষয় নাই। তুমিতো জানো, আম্মা আব্বার পা ধরে বলেছিল, আব্বা সব করুক, শুধু তাকে তালাক না দিক, তালাক না হলে আম্মার কোনও কিছুতে কোনও অসুবিধা নাই। এখন তুমিই বলো, শিশিরকণা, কেন আমি তোমাকে তালাক দিয়ে এতগুলি বিপদ ডেকে আনব? আর ধরো কোনও বিপদ না-ই হল, কিন্তু লজ্জাটা। আব্বা আম্মাকে তালাক দিলে লজ্জায় আম্মা বিষ খাবে। আব্বাও বোধ হয় লজ্জায় বিষ খাবে। এই লজ্জার হাতে পড়ার চেয়ে কবরে চলে যাওয়া উত্তম। বুকের ভাল্‌ভ নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমিতো এখনই কবরে যেতে প্রস্তুত নই, শিশিরকণা। আমাদের জীবনে একটা জিনিসই আছে, শিশিরকণা, লজ্জা। আমি যখন নদীর চর দখল করি তখন কেউ লজ্জা দিতে আসে না। যখন ট্যাক্স ফাঁকি দিই তখন কেউ লজ্জা দিতে আসে না। ব্যাংকের লোন সময়মতো না দিলে বরং আমার দাম বাড়ে। সরকারি কর্মচারিগুলিকে যখন কিনি, তখন কী যে আরাম পাই, যদিও শালারা স্যার ডাকিয়ে ছাড়ে, তারপরওতো ওরা বিক্রি হয়, অবশ্য এক বার স্যার ডাকলে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত মাফ হয়ে যায়, তা হলে আমার দশ বার স্যার ডাকতে অসুবিধা কী, আফটার অল ওরাতো ক্রীতদাসই, যে-ই টাকার কাছে বিক্রি হয়, সে-ইতো ক্রীতদাস, তা নয় কি? কিন্তু ওদের কেউতো লজ্জা দিতে আসে না। কিন্তু, তালাক? ও আল্লাহ। সারা পৃথিবী চলে আসবে লজ্জা দিতে। এখন তুমিই বলো, শিশিরকণা, তালাকের নাম মুখে আনা যায় কি না?

আমি বলি, লজ্জার দাম বেশি না মানুষের জীবনের দাম বেশি?

হামিদ বলে, অবশ্যই লজ্জার দাম বেশি। লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ গায়ে আগুন ধরায়, ফ্যানের সাথে ঝুলে, পানিতে ডুব দেয়, ছাদ থেকে লাফ দেয়, ঘুমের বড়ি খায়, ছেনি দিয়ে বাচ্চাদের কল্লা ফেলে দেয়, বাচ্চাদের আগে বিষ খাওয়ায় তারপর নিজে বিষ খায়। মানুষ মারা যায়। লজ্জা কি মারা যায়? লজ্জা লাফ দিয়ে নতুন মানুষকে আক্রমণ করে। এখন বলো, কার দাম বেশি, কার ক্ষমতা বেশি? মানুষের জীবনের? না লজ্জার? আর সবচেয়ে বড় দুখের কথা কী, শিশিরকণা, তোমরা এই বিপদগুলি বুঝতেই চাও না। কোথা থেকে যে কী কুশিক্ষা তোমরা পাও, আল্লাহ্ই ভাল বলতে পারবে। আমাদের মতো বান্দার পক্ষে এই জিনিস বোঝা সম্ভব না।

আমি বলি, হামিদ, তোমার যুক্তি আর আমার যুক্তি এক জগতের নয়। ভিন্ন ভিন্ন জগতের। এই নিয়ে তোমার সাথে তর্ক করব না। তবু আমার দাবিতে আমি অবিচল, আমি তোমার কাছ থেকে মুক্তি চাই। তুমি আমাকে তালাক দাও, নইলে আমি তোমাকে তালাক দিই।

হামিদ বলে, আমি কেন তোমাকে তালাক দেব, শিশিরকণা? আমার জীবনেরতো কোনও সমস্যা নাই। সব সমস্যাতো তোমার।

আমি বলি, আমার কাছে আমার জীবনের দাম বেশি। তোমার কাছে সমাজের দাম বেশি।

অবশ্যই বেশি, হামিদ বলে। আমার কাছে সবার দাম বেশি। আমার জীবনের, তোমার জীবনের, সমাজের, সব কিছুর। আরও বেশি দাম পিতামাতার জীবনের। তুমি যদি আনন্দ না পাও, আনন্দ পাওয়ার

ব্যবস্থা করা যায়। বাজারে মেশিনপাতি আছে। খেলনা আছে। বড়ি আছে। কত কী আছে? তুমি এত একরোখা কেন, শিশিরকণা? এসো আনন্দ করি, আনন্দ।

তুমি সমাজের ভয়ে ভীত, আমি বলি।

সমাজের ভয়ে কে ভীত নয়, শিশিরকণা? হামিদ বলে। আমার আব্বা, আব্বার বন্ধুরা, যারা সারা পৃথিবীতে কচি মুরগি জবাই করে, কচি ডাব ফাটায়, খাঁটি দুধ আর ঘন মধু খায়, তারা এক জনও কেন তালাকের নাম কখনও মুখে আনে না? ফ্যামিলি ভ্যালুর তোমার কাছে কোনও মূল্য নাই, শিশিরকণা, কোনও মূল্য নাই? এ সব কথা বলতে গিয়ে হামিদের চোখে জল চলে আসে। হামিদ বলে, আমার শ্বশুরের কাছেতো ফ্যামিলি ভ্যালুর মূল্য আছে। তুমি তার মেয়ে। তার কাছ থেকেওতো কিছু শিখতে পারো। উনি ভাল মানুষ, সৎ মানুষ। উঁচু বংশের মানুষ, আমাদের মতো নিচু বংশের মানুষ নয়। উনি কচি মুরগি জবাই করেন না, কচি ডাব ফাটান না, উনি দুধ আর মধুর খনির সন্ধানে নাই। আমাদের তুমি ঘৃণা করো, ভাল কথা, ওনাকেতো ঘৃণা করো না। তুমি ওনার কাছে যাও। ওনার কাছ থেকে পরামর্শ আনো।

আমি দমে যাই। কারণ হামিদের কথা ঠিক। আমার আব্বারও একই ভ্যালু। শুধু আমার মা কোনও মতে তালাক মেনে নিতে রাজি আছে। আমি আব্বার কাছে যাই। আব্বা জীবনে সেদিন প্রথম তার পরনের গেঞ্জিটা আমার সামনে খোলে। নাভি থেকে গলা পর্যন্ত বুকের ফাটাটা দেখায়। ওপেন হার্ট সার্জারি। আর কয়টা দিন কষ্ট করতে পারি কি না, আব্বা জিজ্ঞেস করে। আব্বা বলে, "আবার যদি অ্যাটাক করে, হাসপাতালে যাব না। যাতে এবারেই শেষ হয়ে যায়। তারপর তোমরা তালাক দিয়ো।"

আমার খারাপ লাগে। লোকটার বিরুদ্ধে কোনও ঘুষদুর্নীতির অভিযোগ নাই; সবাই তাকে সম্মান করে; ছোট বেলায় সে আমাকে গোসল করিয়েছে; হাত ধরে হাঁটা শিখিয়েছে; যেখানে আমি হাত দিতে চাইতাম না সেখানে নিজের হাত দিয়ে যত্ন করে আমাকে সে ধুয়েছে; তার বুকের উপর শুয়ে আমি ঘুমিয়েছি, সে নড়েনি পাছে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়; কারও বাসায় গিয়ে বাথরুম নষ্ট করলে সে নিজে আমাকে পরিষ্কার করতে গিয়ে নিজে অপরিষ্কার হয়েছে, তারপর পরিষ্কার আমিকে বের করে নিজে ওই বাথরুম আর নিজেকে পরিষ্কার করেছে, তারপর ভেজা কাপড়ে বের হয়ে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছে যাতে আমার অস্বস্তি দূর হয়ে যায়; কোলের উপর আমার মাথা রেখে সারা রাত আমার গালে হাত দিয়ে বসে থেকেছে আমার দাঁতের ব্যথা ভুলিয়ে রাখতে; হাম হওয়ার পর আমাকে বুকে ধরে রেখেছে, পিঠ চুলকাতে বললে আঙ্গুলের বুক পিঠে বুলিয়েছে, নখ দিয়ে চুলকায়নি, পাছে পিঠ কেটে যায়; নিউমার্কেটের ভিড়ে আমাকে সামনে রেখেছে যাতে স্বপ্নদোষের কবলে পড়া দুষ্ট ছেলেরা আমার পাছায় খোঁচা দিতে না পারে; এক বার রাস্তায় হাঁটার সময় সে আমাকে কোলে তুলে নিয়েছে, পেছন থেকে ঘেউ ঘেউ করে ধেয়ে আসা পাগলা কুত্তা তার পায়ের গুলে দাঁত ঢুকিয়েছে, সে এগারোটা ইঞ্জেকশন নিয়েছে; এর পর রাস্তায় বেরোলে সে আমাকে সামনে রেখেছে, যাতে পাগলা কুত্তা কামড়াতে আসলে তাকে কামড়ায় আর আমি বেঁচে যাই; ধানক্ষেতের আইলের উপর আমাদের দুই ভাইবোনকে কোলে তুলে নিয়েছে, সাপে কাটলে তাকে কাটুক; ভাতে ফুঁ দিয়েছে, চায়ে ফুঁ দিয়েছে, পিঠার পেটের গরম তেলে ফুঁ দিয়েছে, যাতে আমার গাল, গলা, অন্ত্র পুড়ে না যায়।

আব্বা যখন আমার তালাক মানতে নারাজ তখন আমার এ সব কথা মনে পড়ে। তারপরও আমি হামিদকে সহ্য করতে পারি না। যদিও তালাককে আমিও হামিদের মতো ভয় পেতে থাকি, কারণ সারা পৃথিবী, মানে আমি যেই পৃথিবী চিনি তার সবাই, তালাককে ভয় পায়। মনে হয় তালাক হলে তখন জীবনে নতুন সমস্যা যোগ হবে। কী যে সে সমস্যা, তা জানি না। তবে নিশ্চয়ই এমন কিছু হবে যার কারণে ভূমিকম্পে গোটা ঢাকা শহর ধ্বংস হয়ে যাবে; আকাশে তারায় তারায় সংঘর্ষ হয়ে মহাপ্রলয় সৃষ্টি হবে; পাহাড় চলে যাবে সমুদ্রে, সমুদ্র চলে আসবে পাহাড়ে; বন্যায় এক কোটি মানুষ মারা যাবে; তালাকের পর সবাই

রক্তবমি করবে; সকল গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটে যাবে আর পৃথিবীতে কখনও কোনও নারী কখনও গর্ভধারণ করতে পারবে না; রাষ্ট্রপতিদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে, তারা একে অন্যের দিকে পারমাণবিক বোমা ছুঁড়বে; সন্ত্রাসীরা চাইবে ওই সুযোগে যত বেশি দেশ দখল করে নেয়া যায় তত বেশি দেশ দখল করে নিতে; কেয়ামত ঘনিয়ে আসবে; আর সবচেয়ে বড় কথা আমি উলঙ্গ হয়ে যাব; এমন উলঙ্গ হব পৃথিবীর আর কোনও পোশাক আমাকে ঢাকতে পারবে না, না মসলিন, না সাইবেরিয়ার শীতের কোট; আশি স্তর জামা পরলেও আমার শরীরের প্রতিটি লোম, প্রতিটি অন্তরঙ্গ হা করে দর্শনার্থীদের দিকে তাকিয়ে থাকবে, আজীবন; আমি হয়ে যাব ফেরাউনের মমির ঘর কায়রোর জাদুঘরের চেয়ে বিখ্যাত জাদুঘর; আমার সারা জীবন ধরে সারা পৃথিবীর মানুষ আসবে আমাকে উলঙ্গ দেখার জন্য, টিকেট কেটে; আমার দেহ কাফনও ঢাকতে পারবে না, কবরে শোয়ানো আমাকে দেখে শেষবিদায়দানকারিদের কামানগুলি আকাশের দিকে তাক হয়ে যাবে। আমার দাফন হবে অপবিত্র, মানুষের চোখে, ফেরেশতাদের চোখে। আমি কী করে তালাক দিই?

তারপরও আমি হামিদের কাছে এসে তালাক চাই। হামিদ বলে, তালাক হবে না, শিশিরকণা। তুমি বিকল্প দেখো।

আমি বিকল্প দেখি, কারণ একটা তালাকের কারণে সূর্যের আলো নিভে যাবে, এই ভয় আমার মধ্যে ঢুকে গেছে। আমি বলি, হামিদ, আমিতো তোমাকে আগেই বিকল্পের কথা বলেছি। আমি তোমার কাছে আলাদা বিছানা চেয়েছি। হামিদ বলে, আম্মা মরে যাবে। হামিদ বলে, তার চেয়ে দাঁড়াও, আমি অন্য ব্যবস্থা করছি। হামিদ এক শিশা জর্জো আরমানির আকুয়া দি জিয়ো গায়ে ঢেলে বিছানায় আসে। আমি বাথরুমে গিয়ে বমি করি। বমি পরিষ্কার করে আমি সারা রাত বাথরুমের মেঝেতে বসে থাকি ঠাণ্ডা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। হামিদ জর্জো আরমানির আকুয়া দি জিয়ো গায়ে মেখে নাক ডেকে ঘুমায়। ঘুম থেকে উঠে সে আমাকে বাথরুমে পায়। হামিদ বলে, আমার ভাল ঘুম হয়েছে, এখন আমার দরকার। আমি বলি ঠিক আছে, চলো।

হামিদ আমার উপর রিপ্লেন্স লং লাস্টিং ময়েশ্চারাইজার ঢালে। রিপ্লেন্স লং লাস্টিং ময়েশ্চারাইজার বিছানার চাদরে লং লাস্টিং জলাভূমি সৃষ্টি করে, কিন্তু আমার ভেতর ঢোকে না, কারণ মুখ খোলে না। হামিদ বুঝতে পারে আমার যা অবস্থা তাতে ঠোঁটই খোলার সম্ভবনা নাই, মুখতো দূরের কথা। হামিদের আঙ্গুল যতই চেষ্টা করে ততই ঠোঁট দুটি একে অপরকে আঁকড়ে ধরে, এক জোড়া অনাথ জমজ শিশুর মতো, যারা ধরে নিয়েছে তাদের মা তাদের কোরবানি হওয়ার জন্য অকরুণ পূজারীর হাতে ছেড়ে দিয়েছে। ঠোঁট খুলতে ব্যর্থ হয়ে হামিদ তিন বোতল রিপ্লেন্স লং লাস্টিং ময়েশ্চারাইজার একটা গেলাশে ঢালে। শেষ বোতলটা হামিদ ছুঁড়ে মারে। বলে, গন্ধ নাই। যেইখানে যা দরকার তা পাই না। তোমারও গন্ধ নাই। এই মালেরও গন্ধ নাই।

আমি মনে মনে বলি, মায়ের পুত, গন্ধের জন্য মায়ের কাছে যা।

হামিদ বলে, এরপর দেখেশুনে কিনব। দরকার হলে সস্তাটা কিনব। কিন্তু শালার এত টাকা রাখব কই? যদি দামী জিনিস না কিনি এই জীবনের কী মানে? তবে গন্ধ আমার চাই-ই চাই। এরপর আর চার বোতল করে কিনব না, এক কার্টন করে কিনব। শিশিরকণা, তুমি যে ভাবে বাথরুমে রাত কাটাচ্ছ, তাতে আমার আর কী করার আছে?

হামিদ নিজেকে চেপে ধরে নিজেকে গেলাশে ঢুকায়। এক মিনিট হামিদ নিজেকে গেলাশে চুবিয়ে রাখে, যাতে ওর চামড়া রিপ্লেন্স লং লাস্টিং ময়েশ্চারাইজার গিলে মোটা হতে পারে আর আস্তে আস্তে দীর্ঘ সময় আর্দ্রতা রিলিজ করতে পারে, ভোলটারিন ইঞ্জেকশনের মতো। তারপর হামিদ অনেক ঠেলাঠেলি করে। কাজ শুরু করে হামিদ বিরক্ত হয়ে বলে, এই দুইটা দাঁড়ায় না কেন? না দাঁড়াইলে আমি কীভাবে কী করব?

ফকিন্নির বাচ্চারা কী উন্নতি করল? বড় বড় বিল্ডিং আর রকেট বানাল। অথচ এগুলির জন্য এখনও কোনও তেল বানাতে পারল না। এর নাম কি উন্নতি?

হামিদ মাথা ঝাঁকায়, আমি ভাবি ওর মাড়ি থেকে না আবার দাঁত খুলে পড়ে। হামিদ গটগট করে বলে, এটা কীসের উন্নতি?

আমি বলি, হামিদ মুখ খারাপ কোরো না। রাগ করে কী লাভ?

আমার কথায় হামিদ শান্ত হয় না। হামিদ কাঁপতে থাকে। আমি হামিদকে তার হার্টের ভালভের কথা স্মরণ করিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করি। আমি বলি, হামিদ, আমার নিচে চলছে মরিচের ঘষা, আমার মুখ মরুভুমি। তুমি মাথা ঠাণ্ডা করো, আগে ছেপ দাও, তারপর চুনুট পাকাও।

হামিদ গায়ের জোরে চুনুট পাকায়, বিরক্তিসূচক গোঙ্গানি দেয়, বলে, “আমি কেন, বিল এসে ওর ইহুদির আঙ্গুল দিয়ে চুনুট পাকালেও কোনও হবে না।”

হামিদ মেজাজ খারাপ করে কাজ চালায়। ভেতর বার। ভেতর বার।

আমি হামিদকে সাহায্য করেছি যত দিন জহিরের মৃত্যুতে হামিদের জড়িত থাকার কথা আমি জানতে পারিনি। জহিরের মৃত্যুতে হামিদের হাত খুঁজে পাওয়ার পর আমি হামিদকে না বলা শুরু করি। আমি বলি, হামিদ, তুমি লাইভ বাড়াও। হামিদ লাইভ বাড়ায়। হামিদ বলে পনেরো দিন পর্যন্ত বিরতি দেয়া সম্ভব। এর বেশি না। এর বেশি হলে অটো তালাক হয়ে যাবে। আমি ভিমরি খাই। বাইতুল মোকার্‌রম, নীলক্ষেত, কাঁটাবন থেকে হাদিসের বই কিনি, কোরান শরিফের অনুবাদ কিনি। ফিকাহ শাস্ত্র, মকসুদুল মোমেনিন কিনি। সব বই ঘাঁটাঘাঁটি করি। হামিদকে কিতাব-আল-তালাক খুলে দেখাই, ছয় মাস। হামিদ তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। বলে, এ রকম করলে আমার হার্টের ভাল্‌ভগুলি এখনই বসে যাবে। হামিদ মনে করে আমি ওর হার্টের ভাল্‌ভ নিয়ে চিন্তিত, আসলেই আমি চিন্তিত, একটা গরিব ছেলে ধনী হয়েছে, শুধু হার্টের ভাল্‌ভ নষ্ট হওয়ার জন্য মন মতো হাজার হাজার মুরগি জবাই করার আগে মরে যাবে। এটা ভাবতে আমারও কষ্ট হয়। আমি হামিদকে দ্বিতীয় বিকল্প দেখাই: সুরা বাকারার ২২৬ নম্বর আয়াত। আয়াতটা দেখিয়ে আমি ওকে বলি, চার মাস পর্যন্ত বিরতি দেয়া সম্ভব। এটা একেবারে কোরানসম্মত। হামিদ বলে, তুমি কোরান হাদিসের কী বোঝ? নামাজ পড়ো না, রোজা রাখো না। আমি বলি, তুমিওতো নামাজ পড়ো না, রোজা রাখো না। হামিদ বলে, সে জন্যইতো আমি তোমাকে কোরান-হাদিস দেখাচ্ছি না। আমি মসজিদের হুজুরকে জিজ্ঞেস করেছি, হামিদ বলে। হুজুর বলেছে, প্রতি রাতে। মাসিকের দিনগুলি বাদ দিয়ে। আমি হুজুরকে তিন দিন সময় দিই। হুজুর সব পরীক্ষানিরীক্ষা করে আমাকে বলে সর্বোচ্চ পনেরো দিন, এক সাথে থাকলে। আমার মনে হয় বেটা ভয়ে বলেছে। আমার মনে হয়েছে প্রতিদিন বাধ্যতামূলক। আমি গরিব হলে, সৌদি আরবে থাকলে, অবশ্য ভিন্ন ফতোয়া ছিল।

আমি হামিদকে বলি, চলো, আমরা আলাদা থাকি।

হামিদ বলে, আলাদা বিছানাতেই থাকা যাচ্ছে না, কারণ আম্মা মরে যাবে বলে। আলাদা থাকলেতো আমার এই ফকিরের গোষ্ঠীর সবাই মরে যাবে। আর জেহাদে গেলেও ভিন্ন কথা, বা বিদেশে গেলে। আমিতো জেহাদে যাব না। আর বিদেশে গেলেও আমি পনেরো দিনের বেশি থাকব না, কারণ আম্মার হাতের গরুর রেজালা না খেলে আমি মরে যাব। বিদেশে গেলেও আমি পনেরো দিনের মধ্যে ফিরে আসব, নয় আম্মাকে সাথে রাখতে হবে গরুর রেজালা রান্না করার জন্য। আমি এত ঝামেলা করতে পারব না। আমি পনেরো দিনের বিরতিতে রাজি। গুনা হলে হুজুর বেটার হবে। আমার হবে না। আমার মনে হয় আব্বাও হুজুরের কাছে

গেছে। নইলে আব্বা কেন পনেরো দিন পর পর আম্মার সাথে ঘষাঘষি করে। আর সেই খুশিতে আম্মা পরের চৌদ্দ দিন লাফায়। আব্বা জানে সেটা না করলে আম্মা তালাক হয়ে যাবে।

আমি বলি, তালাক হয়ে যাক।

হামিদ বলে, কী বল এ সব? আমার আব্বার বন্ধুরা পর্যন্ত পনেরো দিন পর উন্মাদের মতো ঘরে ফিরে আসে, স্ত্রীর বিছানায় যায় অটো তালাকা ঠেকানোর জন্য। কে চায় ব্যভিচারের জীবন যাপন করতে? বিয়ে না থাকলে সন্তান হবে জারজ। কে চায় অবৈধ সন্তানের বাপ হতে। চৌদ্দ দিন ধরে তুমিও লাইভ করতে পারো, শিশিরকণা, আমার অনুমতি আছে।

আমি বলি, লাইভ করলে গুনা হবে না?

হামিদ বলে, গুনাতো অবশ্যই হবে। আর সে জন্যইতো তওবা করারও ব্যবস্থা আছে। তুমি লাইভ করো। তা হলে আমরা সমানে সমান হব। আর এক সাথে তওবা করব, তাহাজ্জুদের নামাজের পড়ব, কারণ তাহাজ্জুদের পর গুনা মাফ হয়।

আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। হামিদ পাপেও আছে, তওবাতেও আছে। ও এখন বলবে লাল মরিচ খেলে ক্যান্সার ভাল হয়। এক মিনিট পর বলবে লাল মরিচ খেলে ক্যান্সার হয়।

“দুই রকম কথা হল না, হামিদ?” আমি বলতাম।

“আমার কী দোষ,” হামিদ বলত, “বিজ্ঞানীরাইতো দুই রকম কথা বলেছে।”

সাত

ছাব্বিশ দিন এক টানা দাঁড়িয়ে থেকে কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব কি না কে জানে। তবে আমি বেঁচে ছিলাম। যদিও তখন আমার মর-মর অবস্থা। পানি এসে পা দুটি ফুলে গেছে। কোমর অবশ। ঘাড় দুটি কাঠের মতো শক্ত। আমি আমার মাথার খুলি অনুভব করতে পারি, ভারী একটা খুলি, অথচ তার ভেতর নরম কিছু নাই, যেন ওটা ইস্পাতের একটা শূন্য কোঠর। হাত-পায়ের নখ এক-একটা এক ইঞ্চি লম্বা, যা আমি আগে কখনও সহ্য করতে পারতাম না। অথচ তখন আমার সব কিছুতেই বিতৃষ্ণা। যেমন বিতৃষ্ণা ছিল আক্লিমাকে ডেকে বলায়: আয়, আমার নখ কেটে দে। জীবন-মরণ ব্যাপার না হলে আমি ওকে ডাকতাম না। তবে নখের দৈর্ঘ্য আমাকে ততটা কষ্ট দিচ্ছিল না যতটা কষ্ট দিচ্ছিল আমার ফোলা পা দু’টি। মনে পড়ে এক সময় আমি ছিলাম রানের ঘের সতেরোর মধ্যে রাখার খেয়ালে চলা মেয়ে। এখন আমার গুলের বেড়-ই সতেরো ছেড়ে গেছে। আর উরু দু’টি বুঝি বাইরের দিকের তিন কি চারটি খোসা ছাড়ানো দু’টি মোটা কলাগাছের দু’টি সাদা কাণ্ড। ওই রকম অবস্থায় আমি আর আমার পা দু’টির উপর ভরসা করতে পারছিলাম না। আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যত কষ্টই হোক, আমি রাতে বিছানায় যাব।

সেই সন্ধ্যায় আক্লিমা আমার জন্য সাদা বালিশ আর সাদা চাদর দিয়ে বিছানা করে। হামিদ কথায় কথায় আক্লিমার সামনে এক হাজার টাকার নোট ফেলত আর আক্লিমা তা কুড়িয়ে তুলে আঁচলে বাঁধত। আক্লিমা তাই তার প্রাণের দুলাভাইয়ের শোকে কাতর। আমি আক্লিমার চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করি। আমি ছাব্বিশ দিন দাঁড়ানো। আর দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে মরে যাব না। হামিদের প্রতি আক্লিমার দরদে আমার গায়ে ফোসকা পড়ে। আমি আক্লিমাকে বলি, এই মাগী, বিধবার বিছানা কেন বানিয়েছিস, নতুন বউয়ের বিছানা বানা, দরকার হলে তোর মাগের সাথে ঘুমাবো, তাকে বস্তি থেকে ডেকে আন।

লজ্জায় আক্লিমা মাথা নিচু করে। সে লাল চাদর আর লাল বালিশ দিয়ে নতুন করে বিছানা করে। আক্লিমা আমাকে পাঞ্জা করে ধরে, আমি দুই হাত দু'দিকে নিয়ে দুই তালুর উপর ভর করে আমার দেহকে লাল বিছানার উপর বিছিয়ে দিতে সক্ষম হই। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও ফেলি না। যদিও তা না করা ভুল ছিল। তখনও আমি নিঃশ্বাসের গুরুত্ব বা উপকারিতা কোনওটাই জানতাম না।

আমি ঘন্টা দুয়েক স্থির হয়ে ছিলাম। আর চিন্তা করছিলাম পৃথিবীতে কত ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে আমার জন্ম হয়েছিল। আমি নাকে-গলায় কদাচ স্পর্শকাতরতা বা ভার বোধ করেছি, তবে তা কখনও সর্দিতে গড়ায়নি, সর্দি-জ্বরতো অনেক দূরের বিষয়। দুধ-দাঁতে ব্যথা ছিল বটে, নতুন দাঁত দিয়ে চাইলে যা ইচ্ছা তা কাটতে পারি, যদিও তা করি না, দাঁতের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি আমার চারিদিকের পরিচিত মেয়েদের সাধারণ একটা ব্যাধি : ইউরিন ইনফেকশন। আমার তা কখনও হয়নি। আর এ জন্যেই হামিদের লাশের ভার বুকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে যখন আমি টের পাই আমি আরোগ্য লাভ করছি, তখন আমি অবাক হইনি। আমি আমার পায়ের গিরা আর হাঁটুর খোন্দল থেকে পানি সরে যাওয়া অনুভব করি। যেমন করে ফেনীর বছরগুলিতে আমি রাতে ঘুমের মাঝে গাছের কাণ্ড, বাঁশের বেড়া, চায়ের টঙ, রাস্তার ঢালের ঝোপঝাড় থেকে বন্যার পানি সরে যাওয়া অনুভব করতে পারতাম। বন্যায় নেতিয়ে যাওয়া ধান ক্ষেতে যেমন করে কচি পাতা জেগে ওঠে তেমন করে আমার কোমরের চেতনা ফিরে আসে। আমি আমার ঘাড় ঘোরাতে পারি। করোটির কাঠিন্য কমে স্বাভাবিক হয় আর আমি অনুভব করি আমার মাথার ভেতর মগজ আছে, তার বিশুদ্ধ মাখনীয় বৈশিষ্ট্যও আছে।

তবে আমার আরাম স্থায়ী হয় না। বুকের ভেতর লাশের ওজনটা জানান দেয়। আমার পাশ ফিরে শুতে ইচ্ছে করে। আমি দাঁতমুখ খিঁচে শক্ত হয়ে থাকি। তাতে কাজ হয় না। আমি যত শক্ত হই তত পাশ ফেরার জন্য আমার বুকের ছাটনার ভেতর স্পর্শকাতরতা বাড়ে আর তা আমাকে পাশ ফেরার জন্য উত্ত্যক্ত করে। ছাটনা খুলে ছাটনার ভেতর আমার লম্বা নখ দিয়ে চুলকাতে ইচ্ছা করে। এর পরও, ডান দিকে কাত হব না বাম দিকে, এই সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিই। বুকের কোন পাশ নখের আঁচড় বেশি চায় তা বোঝার চেষ্টা করি। আমার লম্বা নখগুলিকে আশির্বাদ মনে হয়। কিন্তু আদতেতো আর বুক খুলে পাঁজরের উপর নখের আঁচড় দেয়া সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত কুণ্ডুলতার কাছে হার মানি। ডান দিকে একটু হেলতেই বুকের ভেতর বিরাজমান পাহাড়টা গড়ানি দেয়। আমি খাটের এক পাশ খামচে ধরি। যাতে পাথরটা আমাকে টেনে নিয়ে মেঝেতে ফেলে না দেয়। ওই ভার নিয়ে মাটিতে পড়লে আমার বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না।

আমার দিন কাটে হামিদের লাশ বুকে নিয়ে। কোনও কোনও রাতে ঘুমের মধ্যে লাশের ওজন আমাকে টেনে উল্কার মতো শূন্যে নিক্ষেপ করে। ঘুমের ওষুধের রাতগুলোর দুঃস্বপ্ন আবার দেখা শুরু করি। মৃত হামিদের আর ক্ষমতা নাই আমার জরায়ুতে মরিচের ঘষা দেয়ার, ক্ষমতা আছে শুধু আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখার। শ্বাসরোধ অবস্থায় বছরের পর বছর কাটে, তবু মনে আসে না যে আমি স্বপ্নে আছি, যখন মনে আসে আমি স্বপ্ন দেখছি, তখন আমি লাফ দিয়ে উঠে বসি। লাশের কুণ্ডলি তখন আমার হৃৎপিণ্ডের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত থেঁতলে দেয়। আমি চেঁচিয়ে আক্লিমাকে ডাকি। আক্লিমা লাফ দিয়ে ওঠে। আমাকে পাঞ্জা করে ধরে দাঁড় করায়। বাকি রাত আমি জানালার রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকি।

প্রতি রাতে বিছানায় যাই। কারণ বিছানায় যাওয়ার পর থেকে আমি বুঝতে পারি আমার অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। কয়েক মাস পর আমি নিজে নিজেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি। উচ্চতাও ফিরে পাই। তিন মাস তেইশ দিনের মাথায় আমি আমার নারীর বুক পুনরায় উপলব্ধি করতে পারি, সেই বুক, যা দিয়ে, একদা জহিরের আবেশ ভরা দৃষ্টি দেখে আমার মনে হয়েছিল, আমি একাই পৃথিবীর সব পুরুষ পালতে পারি।

স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়াতে আমার খুশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমি খুশি হতে পারিনি। ধীরে ধীরে আমার আকাশের মেঘ সরে যাওয়ার কথা। তা-ও হয়নি। আমি খেয়াল করি আমার বুকের ভেতর থেকে ওজনটা একটু একটু সরে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা আবার একটু একটু করে মনের মধ্যে জড়ো হচ্ছে। এটা বুঝতে পেরে আমি বিচলিত হই। আমার চোখ দিয়ে পানি আসে। এক দিন বুঝলাম আমার দেহে হামিদের লাশের ওজনটা নাই, কিন্তু তা আমার মনের মধ্যে পুরোপুরি গেঁথে গেছে। সে দিন আমি দরজা বন্ধ করলাম কাঁদার জন্য। যেন আমি দোজখের দরজা বন্ধ করলাম। আর সে দিন আমার জন্য বেহেশতের দরজাও বুঝি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

আট

খুন করার পর খুনির কেমন লাগে? এ প্রশ্নের সহজ কোনও উত্তর আছে কি? মানুষ যখন খুন করে তখন সে অসচেতন থাকে। এটা হল এক বিশেষ অসচেতনতা যার অর্থ অভিধানে সরাসরি লেখা নাই। এটা সেই অবস্থা, যে অবস্থায় মানুষের শরীর থেকে তার মন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন সে অনুভব করতে পারে না তার একটি দেহ আছে। ধরুন সে দা দিয়ে কাউকে জবাই করছে, অথচ সে তার হাতের মুঠোয় ধরে রাখা দায়ের কাঠ অনুভব করতে পারে না। সে কিছুই স্মরণ করতে পারে না। না বাপের নাম। না মায়ের নাম। না টাকাপয়সা। না ইহকাল। না পরকাল। না তার পুংলিঙ্গ। না তার স্ত্রীলিঙ্গ। এ সময় হঠকারিতা এমন চরমে পৌঁছে যে খুনের কাজটা দ্রুত সারতে পারলে সে বর্তে যায়। অনেক খুনি জীবনে কখনওই সেই সচেতনতা আর ফিরে পায় না। তাই আমরা দেখি শতকরা আটানব্বই জন খুনি শেষ পর্যন্ত বলে যায় তার কোনও অপরাধবোধ নাই। সুযোগ পেলে সে আবার খুন করবে, অন্য কাউকে না, আগে যাকে খুন করেছে তাকেই সে আবার খুন করবে।

খুনির সচেতনতা ফিরে আসে তখন, যখন তাকে তার ফাঁসির সংবাদ দেয়া হয়। তখন তার চিৎকার জানান দেয় তার সচেতনতা ফিরে এসেছে। তখন সে কাঁদতে থাকে। এর মধ্যে যদি সে পাগল হয়ে যায়, মৃত্যুদণ্ডের খবর পাওয়ার সাথে সাথে তার পাগলামিও সেরে যায়। তখন সে বুঝতে পারে অপরাধবোধের কষ্ট।

আবার এমন অনন্যসাধারণ খুনিও আছে, সংখ্যায় যদিও এক লক্ষে এক জন, যে সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় খুন করতে পারে। সে এমনকি আঙ্গুল দিয়ে ছুরির ধারও পরখ করতে পারে, এমনকি ফলার শীতলতাও। আর জবাইকালে যে রক্তের ফোয়ারা তার হাতে-বুকে বাড়ি দেয়, সে তার উষ্ণতাও অনুভব করতে পারে। এমন খুনি সানন্দে ফাঁসির দড়ি নিজেই নিজের গলায় পরে। ফাঁসুড়েকে কনুইয়ের গুতায় সরিয়ে দিয়ে সে নিজের সচেতন বাহাদুরি দেখায়। আর শেষ নিঃশ্বাসটাও সে সচেতনভাবে ত্যাগ করতে পারে।

আমি এই দুই শ্রেণির খুনির কেউ নই। খুনের তিন মাস তেইশ দিনের মাথায় আমি সচেতনতা ফিরে পাই।

তবে আমার অপরাধবোধ সোজা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমার খুনকে বিভিন্ন পবিত্র গ্রন্থের ভাষায় বলা চলে: চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান, প্রাণের বদলে প্রাণ। কিন্তু খুনের যত যুতসই কারণই থাক না কেন, খুনের কাজের নিজেরই একটা খারাপ প্রভাব আছে, যা কোনও কিছু দিয়ে কাটানো সম্ভব হয় না। যারা খুন করতে চান এবং মনে করেন তাদের খুন করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে আমি তাদের রাষ্ট্রীয় আইনের উপর নির্ভর করার পরামর্শ দেব আর রাষ্ট্রকে পরামর্শ দেব ভাল আইন তৈরি করার এবং সে সব আইন যথাযথ প্রয়োগ করার। রাষ্ট্র, খুন প্রত্যাশী মানুষ, খুনি সবাই আমার অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হতে

পারে। যুতসই কারণ থাকা সত্ত্বেও খুনের কাজ আমাকে এমন ডুবানো ডুবায় যে আমি গত দশ বছর পাঁচ মন ওজনের পাপ মনের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি। শুরুতে আমি আর আমার পাগল মা অনেক পাগলের ডাক্তারের কাছে গিয়েছি। তাঁদের ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলেছি, কারণ আমরা খুনের কথা বলতে চাইনি। আমরা বলেছি আমাদের মাথার ডান দিকে সব সময় কামড়ায় কিন্তু মগজের ডাক্তাররা আমাদের মাথায় কোনও টিউমার খুঁজে পাননি। ডাক্তার সাহেব আমাদের বিশ্বাস করেননি, নিজেই আমাদের মাথা নতুন করে স্ক্যান করিয়েছেন, তারপর ফিল্মে কোনও টিউমার না পেয়ে তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন, আমরা পাগল। আমরা বলেছি আমরা এক বসায় দশ কেজি করে গরুর গোস্ত খাই কিন্তু আমাদের ওজন বাড়ে না। আমরা ঘুমের মধ্যে হাঁটি আর জাগরণে ঘুমাই। আমাদের সাথে জিন কথা বলে, ভূত কথা বলে, মাঝ রাতে আমাদের মৃত দাদা-পরদাদারা আমাদের সাথে বৈঠকে বসে। বৈঠকে নানি-দাদিরাও অংশ নেয়। কেমন এ বৈঠকগুলি? কোথায় থাকে এ সব দাদা-পরদাদারা? আমাদের এ সব প্রশ্নের উত্তরও দিতে হয়েছে। আমরা বলেছি এ বৈঠকগুলি হয় শীতকালে গ্রামের বাড়িগুলির পেছনে মাটির যে ধূসর রং তৈরি হয় তেমন ধূসর রঙয়ের উঠানে। পূর্বপুরুষ-ও-মহিলারা ধূসর রঙয়ের কবর থেকে উঠে আসেন। শীতকালের পরিষ্কার কবর, যার পাশ দিয়ে হাঁটতেও ভাল লাগে। আমরা তাদের সাথে বৈঠক করি। বৈঠকের বিষয়বস্তু? আমি বলতে চেয়েছিলাম হামিদের খুন। তা না বলে, বলেছি, বৈঠকের বিষয়বস্তু বৈঠক শেষে আমাদের আর মনে থাকে না। আমরা বলেছি আমাদের জীবনে আরও অনেক অনেক আচানক ঘটনা ঘটে চলেছে। আমরা ইউনুছ নবিকে মাছের পেটে স্বপ্নে দেখি। মুসা নবিকে দেখি তুর পাহাড়ে। আমাদের মাসে পাঁচ বার করে মাসিক হয়, আর এ ভাবে মাসে পঁচিশ দিন আমরা মাসিকের উপর থাকি, তারপরও আমাদের রক্তে লোহার কোনও ঘাটতি হয় না। এ কথা তৃতীয় বার যে ডাক্তারকে বলেছিলাম তিনি এটা গা... বলতে না বলতে নাকে ওড়না চেপে ধরেন, কথা অসম্পূর্ণ রেখে বেসিনে গিয়ে বমি করেন। তাঁর আর ডাক্তারি করা হয়নি। তিনি নিজে পাগল হয়ে গেছেন। তাঁকে পরে পাবনায় নেয়া হয়েছে। তিনি কখনও কাউকে তাঁর নাক থেকে সেই ওড়না আর সরাতে দেননি। আমরা বলেছি অমাবস্যার রাতে আমাদের মাথা আলাদা হয়ে যায়, আমরা তা হাতে নিয়ে বসে থাকি। পূর্ণিমার রাতে আমাদের হৃৎপিণ্ড বের হয়ে আসে, তাতে নীল রং লাগানো থাকে, কাপড়ে যে নীল দেয়া হয়, একদম তা। আমরা সে রং পানি দিয়ে ধূয়ে হৃৎপিণ্ড দুটির গোলাপি রং ফিরিয়ে আনি, আমাদের বুকে ব্যথা লাগে তাই আমরা খুব আস্তে করে গেলাশ থেকে আমাদের হৃৎপিণ্ডের উপর পানি ঢালি। আমরা আমাদের হৃৎপিণ্ডগুলির গা বেশি ডলি না। কারণ আমাদের কষ্ট লাগে। ডাক্তাররা বুঝেছেন এমন পাগল তাঁরা আগে কখনও দেখেননি। আর ভবিষ্যতেও কখনও দেখবেন না।

আমাদের মিথ্যা কথা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। তার মধ্যে একটা অনেক মানবিক ছিল। তা ঘটে ডাক্তার গুল আফরোজের সাথে। তা এক মন খারাপ করা আচানক ঘটনা। যা আমরা কখনও ভুলতে পারিনি। আমার ধারণা ডাক্তা গুল আফরোজ ম্যাডামও তা আজীবন মনে রাখবেন।

নয়

আমাদের কষ্টের তীব্রতা বোঝানোর জন্য আমরা ডাক্তার গুল আফরোজ বানুকে বলেছিলাম, আমরা এক সমকামী যুগল। আমাদের উপর থেকে আক্রোশে-জ্বলা-জনতার সন্দেহের চোখ সরানোর জন্য আমরা মা-মেয়ের বেশে একত্রে বাস করি। আজন্ম সমকামী হওয়ার পাপবোধের দংশনে আমাদের বিশ বছর ধরে ঘুম নাই। আমরা এখন কী করি?

আমাদের কথা শুনে ডাক্তার ম্যাডামের ময়ুরাক্ষী যুগল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চোখের মতো জ্বলন্ত কয়লার রূপ ধারন করে আর লাফ দিয়ে বের হয়ে আসতে চায়। তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে গলা ঠেলে ধরে জিজ্ঞেস

করেন, “তা হলে কি আপনারা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা প্রেম করেন?” তিনি এমন অস্থির হয়ে প্রশ্ন করেন, মনে হয়, আমরা ডাক্তার আর তিনি রোগী। তারপর সহসা তিনি এমন ভাবে বসেন মনে হল তিনি চেয়ারে পড়ে গেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি ডানে বামে তাকান, কী যেন খোঁজেন। তারপর তিনি তাঁর সহকারী আবুলকে ডেকে জানতে চান বাইরে কত রোগী অপক্ষো করছে। আবুল বাইরে গিয়ে এক মিনিট পরে ফিরে আসেন, তাঁর দুই হাতের উপর একটা খোলা রেজিস্টার শোয়ানো, আবুল বলেন, সাতষট্টি জন। ডাক্তার ম্যাডামের মুখ কালো হয়। আমরা দুই পাগল, মা আর মেয়ে, মুখ চাওয়াচওয়ি করি। আমি মনে মনে বলি, আহা তাঁর মনে কত মায়া।

ডাক্তার ম্যাডাম আমাদের অনেক সময় দিলেন। পরের দিন আসতে বললেন। একেবারে বেলা এগারোটায়, বললেন, সবার আগে তিনি আমাদের দেখবেন, এমন জটিল কেস তিনি আগে কখনও দেখেননি। আমরা মা মেয়ে বললাম, আহা তাঁর মনে কত মায়া। আমরা বাসায় এসে আলাপ করলাম, এই সব মিথ্যা কথা বলে কি কোনও চিকিৎসা সম্ভব? পাগল বলল, আমি জানি না, আমিতো ডাক্তারি ভুলে গেছি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এভাবেই আমাদের চিকিৎসা করিয়ে যেতে হবে।

আমরা পরের দিন এগারোটায় ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে হাজির হই। চেম্বারের বাইরের সুবিশাল বসার জায়গায় শ’খানেক চেয়ারের প্রত্যেকটা খালি। ভেতরে কান বন্ধ করা নীরবতা। আমি পাগলের হাত শক্ত করে ধরি। পাগল ভয় পায় না। আমি ভয় পাই। আর আমার বুকটা কেমন যেন করে। মনে হল আমাদের কারণে বিখ্যাত মনোরোগবিদ ডাক্তার গুল আফরোজ বানু, এমবিবিএস (ঢামেক), ডক্টরেট ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি (বার্মিংহাম), ডক্টর অফ ম্যাডিসিন (শিকাগো)-কে তাঁর সব রোগী পরিত্যাগ করেছেন। কারণ তিনি দুই সমকামিনী মানসিক রোগীর চিকিৎসা হাতে নিয়েছেন, যাদের নিয়ে কাজ করতে পৃথিবী প্রস্তুত নয়। আমার আরও খারাপ লাগে কারণ আমরা মিথ্যা কথা বলে গুল আফরোজ ম্যাডামের সহানুভূতি আদায় করেছি। আমরা যত খালি হল ঘর ধরে চেয়ারের সারিগুলি অতিক্রম করে এগুতে থাকি, তত আমাদের বুক কাঁপে। আমরা মা-মেয়ে ফিসফিস করে বলাবলি করি, আমরা ভুল জায়গায় এলাম না তো? গুল আফরোজ ম্যাডামের সহকারী আবুলের তো অন্তত থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনিও নাই। সবই না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু এই যে বিরানির খুশবু, রেজালার খুশবু, বোরহানির খুশবু, গোলাপজলের খুশবু, জর্দার খুশবু, এ সবের কী মানে? ডাক্তারখানা তো আর বিয়ে বাড়ি নয়। আমরা আস্তে আস্তে পা ফেলি। আগাবো কি আগাবো না তা ভাবতে না ভাবতে আমরা দেখি আমাদের থেকে একশ হাত দুরে ফট করে দরজা খুলে যায়। গুল আফরোজ ম্যাডাম দৌড়ে বের হয়ে আসেন। কোনও মানুষের কান এত খাড়া থাকতে পারে, ভাবাই যায় না। কৃতজ্ঞতায় আমার মন গলে যায়। আফরোজ ম্যাডাম দৌড়ে এসে পাগলের হাত ধরার জন্য নিজের হাত বাড়ান। তিনি পাগলের হাত খুঁজে পাবেন না, তা আমি জানি। তাই আমি নিজেই হাত বাড়িয়ে দিই। আফরোজ ম্যাডাম আমার হাত ধরে টেনে টেনে আমাকে ভেতরে নেন। পাগল আমাদের অনুসরণ করে।

আমাদেরকে ভেতরে ঢুকিয়ে আফরোজ ম্যাডাম পেছনে এসে দরজা ভিড়িয়ে দেন। এক রাতের মধ্যে আফরোজ ম্যাডামের চ্যাম্বারের চেহারা বদলে ফেলা হয়েছে, মানে অতিরিক্ত আসবাবপত্র ঢুকানো হয়েছে। দুইটা বড় বড় টকটকে লাল আরামকেদারা রাখা হয়েছে। আমরা আগের দিনের ধূসর রঙের চেয়ারে বসতে গেলে আফরোজ ম্যাডাম ওই দুটি আরামকেদারার দিকে ইশারা করেন। বলেন, বিদেশে মানসিক রোগীদের এ ধরনের আরামকেদারায় আরাম করে বসানো হয় যাতে তাঁরা আরাম পান। তাঁরা আরাম করে কথা বলেন আর ডাক্তার তাঁদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। বিদেশে কোনও মানসিক রোগের ডাক্তার দিনে দশ জনের বেশি রোগী দেখেন না। অথচ এখানে দিনে আফরোজ ম্যাডাম একশ জন করে রোগী দেখেন। কেউ কিছু বলেন না। এখানে রোজগারের কত সুযোগ। “তবু কেন যে মানুষ বিদেশে যায়,” আফরোজ ম্যাডাম বলেন।

পাগল বলে, “আমি নিজে ডাক্তার, আমাকে এত ভোজবাজি দেখানোর দরকার নাই। আমরা চেয়ারেই বসি।”

“অবশ্যই, ম্যাডাম,” “ডাক্তার গুল আফরোজ বানু বলেন, “আপনারা চেয়ারেই বসুন।”

আমরা আগের দিনের চেয়ারে বসি। ডাক্তার গুল আফরোজ তাঁর চেয়ারে বসেন। তাঁর দেহ থেকে আসা খুশবু বিয়ে বাড়ির খুশবু গিলে ফেলেছে। এখন আমরা বেহেশতের খুশবু পাচ্ছি। আমি ভাল খাবার আর সুগন্ধ ভালবাসি। আফরোজ ম্যাডামের চেম্বারের জলবায়ু আমার ভাল লাগে। কিন্তু পাগলের তা ভাল লাগে না। পাগল যেন কেমন করে। আমি পাগলের হাত চেপে ধরি। ডাক্তার গুল আফরোজ ম্যাডাম বসার আগে তাঁর সাদা অ্যাপ্রন খুলে পেছনে ছুঁড়ে মারেন। অ্যাপ্রনের নিচে তাঁর হলুদ কামিজ আর বাঁশপাতা রঙের সালোয়ার। আমরা মা মেয়ে আছাড় খাই। আফরোজ ম্যাডামের কামিজের দুই স্লিভের পরিমাণ আমার মাথার দুটি চুলের সমান।

ডাক্তার ম্যাডাম বলেন, “আপনারা সমকামী কি না তা পরীক্ষা করলাম। যে ভাবে আছাড় খেলেন তাতে তো সন্দেহ হল আপনারা মিথ্যা কথা বলেছেন। আপনার সমকামী নন।”

আমি আর পাগল একে অন্যের দিকে তাকাই। পাগলের গাল শক্ত হয়ে যায়। আমি বুঝে নিই আমাকেই এই পাগল দলের নেতৃত্ব দিতে হবে। আমি বলি, “ম্যাডাম, আসলে এমন কামিজ কখনও দেখিনি তো, সে জন্য এ রকম হল। বিশ্বাস করেন, আমরা আপনাকে সত্য কথা বলেছি। আমাদেরকে তাড়াতাড়ি বড়ির নাম লিখে দিন।”

“সে জন্যই তো আপনাদের একান্তে ডেকেছি,” ডাক্তার বলেন। “ভাল হত যদি আপনারা আরামকেদারায় বসতেন।”

আমি দেখি পাগল উঠে গিয়ে লাল আরামকেদারায় বসে গেছে। কী আর করা? আমি নিজে উঠে গিয়ে পাগলের পাশের লাল আরামকেদারায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। আরামকেদারায় বেশ আরাম। আগস্ট মাসের গরমে এসির আরাম। তার উপর আরামকেদারার আরাম। আমাদের সামনে একটা কাচের টেবিল। তার উল্টা দিকে একটা মধ্যম মাপের লাল আরামকেদারা। ডাক্তার ম্যাডাম ওটাতে আরাম করে বসে কাচের টেবিলের উপর ওনার খালি পা দুটি তুলে দেন। দুই পায়ে দুটি রূপার মল। আমি পাগলের জন্য ভয় পাই। কারণ পাগল কারো খালি পা সহ্য করতে পারে না। এখন সেই পায়ের তালু আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। আশার কথা পাগলের হয় তো তেমন অসুবিধা হবে না। কারণ পা দুটি পরিষ্কার আর তুলতুলে, কিশোরীদের পায়ের মতো। আর আফরোজ ম্যাডামের পা থেকেও বেহেশতি সুগন্ধ ভেসে আসে।

আফরোজ ম্যাডাম হাতে একটা খাতা নিয়ে বসেন। তিনি আমাদের ঠিকানা নেন। আলাদা করে আমাদের মোবাইল নম্বর নেন। তিনি জানাতে চান আমরা কে কখন গোসল করি, একত্রে না আলাদাভাবে, দিনে কত বার দাঁত মাজি আর কোন টুথপেস্ট আর কোন টুথব্রাশ ব্যবহার করি, কে কোন লোশন মাখি, কত দিন পর পর ক্ষৌর কর্ম করি, ক্ষৌর কর্মে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করি, উপরের পোশাকের নিচে ছোট ছোট যে সব পোশাক পরি সেগুলি কোন মাপের, কোন ডিজাইনের, কোন ব্র্যান্ডের? তিনি আরও জানতে চান আমরা কেমন খাটে ঘুমাই, খাটের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কত, উচ্চতা কেমন, কোন ম্যাট্রেস ব্যবহার করি, কেমন বালিশ, কেমন বিছানার চাদর, আর কী কী আসবাবপত্র আছে আমাদের শোয়ার ঘরে, আয়না আছে কি না, কত বড় আয়না, কয়টা আয়না, দুইটা না তিনটা। আমি সব কিছুর বর্ণনা দিই। বলি আমাদের সব কিছু আছে। খাট এত বড় যে চাইলে চার জন নরনারী অনায়াসে ঠ্যাং মেলে ঘুমাতে পারে। আয়না আছে চারটা। আমাদের উপরের পোশাক আছে একশ সেট করে, ভেতরের পোশাক আছে একেক জনের তিনশ সেট করে। দেশি বিদেশি যত

বড় পোশাকের কোম্পানি, ছোট পোশাকের কোম্পানি, ঘড়ির কোম্পানি, লোশনের কোম্পানি, সুগন্ধির কোম্পানি, জুতার কোম্পানি, হারবাল কোম্পানির নাম জানি, সবগুলির নাম বলি। আমি আরও বলি আমাদের সাথে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি বাস করে না। আমার কথা শুনে আফরোজ ম্যাডাম কাচের টেবিল থেকে পা টেনে নামিয়ে দাঁড়িয়ে যান। তিনি বলেন, "আমার এখানে দুই কাজের মেয়ে ছাড়া আর কেউ নাই। এই ফ্লোর থেকে উপরের দিকে আরও তিনটা ফ্লোর খালি।"

এ ভাবে আমরা জানতে পারি পান্থপথের এই চৌদ্দ তলা আবাসিক বাড়ির এগারো তলায় এই চেম্বার। এখানে অন্য কোনও ডাক্তার বসেন না। এই ফ্লোরে অন্য কোনও অফিসও নাই, কিছুই নাই। বাড়িটা ম্যাডামের চা শিল্প মালিক পিতার। ওই পিতার এক মাত্র উত্তরাধিকার হিসাবে ম্যাডাম পুরো বাড়ির মালিক। তাঁর পিতা মারা গেছেন। লন্ডনে। এই বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে তিনিও লন্ডনে চলে যাবেন। আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ি। ম্যাডাম বলেন, "ভয়ের কিছু নাই। আপনাদের ট্রিটমেন্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি বাড়ি বিক্রিতে হাত দেব না।"

"আশ্বস্ত হলাম, ম্যাডাম," আমি বলি।

আমি ভয়ে পাগলের দিকে তাকাই না।

আফরোজ ম্যাডাম আমাদের এবার মূল প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করা শুরু করেন। তিনি জানতে চান আমরা কে কার ভূমিকায় আছি। আমরা বুঝতে না পারাতে তিনি ভাবলেন আমরা ভান করেছি। "খুলে বলেন," তিনি ঘমকের সুরে বলেন, "কে পুরুষের ভূমিকায় আছেন, আর কে নারীর ভূমিকায়।" তিনি মাথা নাড়ান। "ও বুঝলেন না? ভেঙ্গে বলছি। এবার বলুন, কে স্বামীর ভূমিকায় আছেন, কে স্ত্রীর ভূমিকায়? না কি বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড করেন?"

আফরোজ ম্যাডাম তাঁর আরামকেদারায় বসে আমাদের আরও অনেক প্রশ্ন করেন। এর মধ্যে আমি এক বার মাত্র পাগলের দিকে তাকিয়েছি। সে ঘেমে গেছে। আমিও ঘেমে গেছি। আমিই সব কথার উত্তর দিই। আফরোজ ম্যাডাম ধরিয়ে দিলেন, আমরা কে কোন ভূমিকায় আছি, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি এক বার বলেছি, আমি পুরুষের ভূমিকায় আছি, আর দুই বার বলেছি আমি নারীর ভূমিকায় আছি। আফরোজ ম্যাডাম বলেন, এটা স্বাভাবিক, মাঝে মাঝে ভূমিকাওতো বদল হতে পারে। তিনি সবচেয়ে বেশি করে আমাদের পাপবোধের কথা শোনেন। তারপর তিনি চোখ আর নিঃশ্বাস আর মুখ এক সাথে বন্ধ করেন। আমি আর পাগল অনেকক্ষণ একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকি। তারপর একে অন্যের হাত ধরে আফরোজ ম্যাডামের দিকে তাকাই। তখনও আফরোজ ম্যাডামের চোখ, নিঃশ্বাস, মুখ বন্ধ। আমি আমার পাগল মায়ের হাত আরও জোরে চেপে ধরি যখন আফরোজ ম্যাডামের দীর্ঘশ্বাস বের হয়। আফরোজ ম্যাডাম চোখ খোলেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপে।

"আমি নিজেও একই পাপবোধ নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি," কাঁপতে কাঁপতে আফরোজ ম্যাডাম বলেন।

এ কথা বলে আফরোজ ম্যাডাম দাঁড়িয়ে যান আর দ্রুত তাঁর সালোয়ার আর কামিজ খুলে ফেলেন। এরপর তাঁর দেহে তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। আমরা আর এক বার আছাড় খেলাম। তবে তা কততম আছাড় সে কথা ভুলে গেছি। আফরোজ ম্যাডাম কেঁদে ফেলেন। ওনার চোখ থেকে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা পড়ে। ম্যাডামের বয়স পঁয়তাল্লিশের এদিক ওদিক হতে পারে। পেটে এক বিন্দু চর্বি নাই। রোমান দেবী মিনার্ভার নাভির মতো সুন্দর নাভি তাঁর। মাথা ছাড়া দেহের কোথাও একটা পশম নাই। সারা দেহ জলাপইয়ের ত্বকের মতো। হলুদ জলপাই রোদে পুড়লে যেমন তামাটে রং হয় তাঁর ত্বকের রঙও তেমন। তিনি অহেতুক দুই হাত তুলে তাঁর চুলের খোঁপা বানান আবার খোঁপা না বেঁধেই চুল ছেড়ে দেন। তারপর তিনি আমাদের অনেকগুলি

প্রস্তাব দেন। তার মধ্যে প্রধান প্রস্তাব হল: প্রেমের পথে তিনি আমাদের সাথে যোগ দিতে চান। তিনি আমাদের বাড়ি এসে থাকতে চান। নতুবা আমরা তাঁর বাড়িতে উঠতে পারি।

“প্রেমের স্বর্গ গড়ে আমরা তিন জন এক সাথে আমাদের পাপবোধের মোকাবেলা করব,” তিনি বলেন।

আমি জানতাম পাগলের তেজ উঠে যাচ্ছে। ম্যাডাম তো তথ্যের বোমা ফাটিয়েছেন। পাগল ফাটাবে মারের বোমা। পাগল অবশ্য তা করে না। পাগল শুধু আরামকেদারা ছেড়ে উঠে যায়। তাতেই আমার হাত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমি পাগলকে অনুসরণ করি। আফরোজ ম্যাডাম বার বার আশ্বস্ত করতে চান, তিনি বার বার বলেন, তাঁর দ্বারা আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না। আর তা প্রমাণ করার জন্যইতো তিনি সব খুলে ফেলেছেন। তাতেও কি আমরা ভরসা পাচ্ছি না? পাগল দরজার দিকে হাঁটা ধরে। আফরোজ ম্যাডাম পাগলের পেছনে ছোটেন, কিন্তু পাগলকে ধরার সাহস পান না।

“আমাকে ছেড়ে আপনারা যাবেন না,” আফরোজ ম্যাডাম বলেন।

পাগল আমার হাত ধরে আমাকে দরজার দিকে টানে। আমরা কোনও কথা না বলে হাঁটতে থাকি। চেম্বার থেকে বের হয়ে আমরা কয়েক কদম মাত্র সামনে যাই। এমন সময় আফরোজ ম্যাডাম আমাদের পথ আটকান।

তিনি বলেন, “আমার কপালটাই খারাপ।”

তিনি পাগলকে বলেন, “আপনি বেশি কমনীয়, তাই হয়তো আপনি স্ত্রীর ভূমিকাতেই আছেন, আবার আপনার বয়স যেহেতু বেশি, আপনি পুরুষের ভূমিকায়ও থাকতে পারেন। যে ভূমিকাতেই থাকুন না কেন, আমাকে অন্তত দুটি টোকা দিয়ে যান। এখানেই দিতে পারেন। কেউ নাই। আর কেউ আসবেও না। কত দিন, কত দিন, বুঝছেন তো?”

পাগল আফরোজ ম্যাডামকে ঠেলা দেয়। আফরোজ ম্যাডাম মেঝেতে পড়ে যান। আফরোজ ম্যাডাম মাথা নত করে কয়েক সেকেন্ড মেঝেতে ওই অবস্থায় বসে থাকেন। আমার মনে হল ওনার মাথা ঘুরছে। তারপর উনি উঠে দাঁড়ান, আবার তাঁর চোখে পানি আসে। আমার মায়া লাগে। আফরোজ ম্যাডাম বলেন, “শুধু দুটি টোকা। যে কোনও এক জন দিলেই হল। আমার দুর্ভাগ্য যে সহসা বদলে যাবে, এটা ভাবা আমার ঠিক হয়নি। শুধু দুটি টোকা। প্লিজ। আপনাদের কোনও পাপ হবে না। সব পাপ আমার।”

আমি ম্যাডামকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি: আমাদের কারও পক্ষে টোকা দেয়া সম্ভব নয়।

“তা হলে মাত্র একটা টোকা,” ম্যাডাম আকুল হয়ে বলেন। তিনি বলেন, একটা টোকার বিনিময়ে তিনি আমাদের সব পাপ, সারা জীবনের পাপ, নিজের কাঁধে নেবেন। আমরা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাব। বিনিময়ে তিনি জাহান্নামের আগুনে জ্বলবেন।

“আর কীভাবে আমি আপনাদের আমার কষ্টের কথা বুঝিয়ে বলতে পারি?”

এ কথা বলতে গিয়ে ম্যাডামের অশ্রু ঘন হয়। তিনি আমার হাত ধরে টানেন। অন্তত আমি যেন তাঁকে একটা টোকা দিয়ে যাই। একটা মাত্র টোকা।

একটা টোকা, একটা টোকা। আফরোজ ম্যাডাম ডুকরে ডুকরে কাঁদেন, সেই শিশুর মতো যার পিতামাতা বেঁচে নাই, বা থাকলেও যারা তাকে ফেলে রেখে অন্য জায়গায় প্রেম করতে চলে গেছে।

আফরোজ ম্যাডামের কষ্টে আমার বুক ফাটে। তাঁর সাথে আমাদের যা হয়ে গেল, তা তো একটা খুন কিংবা একটা বিয়ের মতোই জীবন বদলানো দুর্ঘটনা। আমরা যদি মিথ্যা না বলতাম, আমরা নিজেরা যদি সত্যি তা-ই হতাম, যা তাঁকে বলেছি, তা হলে তো তিনি শুধু টোকাই নিতেন তা নয়, আমাদেরকেও প্রাণ ভরে টোকা দিতেন। আমাদের দোষে এখন তাঁর এই অবস্থা। আর একটা টোকা যদি তাঁকে দিয়েই দিই, তাতে এমন কী হবে? পৃথিবী নামক গ্রহে এই মুহূর্তে কত জায়গায় কত জন কত জনকে টোকা দিচ্ছে, তা আমি জানি না। কিন্তু টোকাটুকিতো হচ্ছে, ভূমিকম্পও হচ্ছে, অগ্ন্যুৎপাতও হচ্ছে, আকাশে বিমান বিকল হচ্ছে, সমুদ্রে জাহাজ ডুবছে, কেউ ফুটপাতের উপর মনের সুখে ট্রাক চালাচ্ছে, কেউ বাচ্চাদের ইস্কুলে ঢুকে হ্যান্ডগানের ট্রিগার চেপে আঙ্গুলের সুখ করে নিচ্ছে, কেউ সোমালিয়ার উপকূলে মালবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেনকে চাবুক দিয়ে পেটাচ্ছে, আর এখানে সেখানে শত শত কর্কটরোগী, কেউ একাকি, কেউ প্রিয়জনের হাত ধরে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেই। এত কিছুর পরও পৃথিবী থেমে নেই। আর শুধু একটা টোকাতেই কি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস এক টোকায় পৃথিবী ধ্বংস হবে না। সূর্য যত দিন বাঁচার তত দিনই বাঁচবে। এক দিন আগেও সে নিভবে না।

“একটা টোকাতেই আমার জীবন হয় তো সার্থক হয়ে যেতে পারে,” আফরোজ ম্যাডাম আমার হাত চেপে ধরে মিনতি করে বলেন। “আমার মতো নারীর জীবনে সার্থক মুহূর্ততো বেশি আসে না। তুমি নিশ্চয়ই এটা বোঝ।”

একটি টোকায় কারও জীবন যদি সার্থক হয়ে যায়, তা হলে সেই টোকাটি কি দেয়া উচিত নয়, আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি। আমার কাজটি না হয় ধাত্রীর কাজ হল। ধাত্রীর কাজে ধাত্রীর কি আর এমন লাভ বা ক্ষতি হয়, অথচ অন্য পক্ষ তাতে মাতৃত্ব লাভ করে। আমি সিদ্ধান্ত নিই, আমি টোকা দেব।

“মা ওই দিকে ফিরে তাকাও,” আমি বলি। “এই দিকে তাকিয়ো না।”

মা দাঁতমুখ খিঁচে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। আফরোজ ম্যাডাম আমাকে টেনে তাঁর চেম্বারে ঢোকান।

এক টোকার কথা বলে আফরোজ ম্যাডাম দুশ টোকা নিলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে অনবরত গলা কাটা ছাগলের শব্দ বের হয়। আমাকে তিনি এমন ভেজানো ভেজান, আমি তাঁর চেম্বারের বাথরুম, যেটা তিনি ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করেন না, তা ব্যবহার করে আরও ভিজে যাই।

ধুয়ে আসার পর আফরোজ ম্যাডাম আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, “তোমরা কেন আমার কাছে মিথ্যা বললে, বুঝলাম না। তবু তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি একটা ভাল মেয়ে। আমার কত স্বপ্ন ছিল জানো? গতকাল তোমরা যাওয়ার পর মাথা ঘুরে পড়ে গেছি বলে মিথ্যা কথা বলে সব রোগীকে না দেখেই বিদায় করে দিয়েছি। তারপর থেকে প্রস্তুতি নিতে থাকি। তোমাদেরকে নিয়ে কী কী করব তার আয়োজন করি। উপরে রান্না হচ্ছে। অনেকগুলি রেশমি গাউন নতুন করে ধুয়ে ইস্ত্রি করা হয়েছে। তিন জনে পরব বলে। উপরে নাচের একটা ঘর আছে। ওটাতে নতুন কয়েকটা লাইট লাগিয়েছি। যদি এক বার গিয়ে দেখে আসতে। তবে বাইরে যিনি অপেক্ষা করে আছেন, তিনি বোধ হয় তোমাকে তা করতে দেবেন না। আশা ছিল তোমাদের দুই জনকে নিয়ে একেবারে বেহেশতের পরিবেশে বাহাত্তর ঘন্টা প্রেম করব। বুঝছ তো?। আমরা আমরা। নারীতে নারীতে। যেখানে লজ্জার কোনও জায়গা থাকবে না। শুধু অসংযম আর অসংযম। আমিতো গত রাতেও ঘুমাই নাই। আরও বাহাত্তর ঘন্টা কেন, প্রেম পেলে আমি পরবর্তী বাহাত্তর মাস জেগে থাকতে পারব। আমার চোখে এক বিন্দু ঘুম আসবে না। কিন্তু আমার পরিকল্পনা ছিল এক নাগাড়ে বাহাত্তর ঘন্টার। তারপর তিন জন মিলে রানের উপর রান তুলে আটচল্লিশ ঘন্টা ঘুমাব। এই ছিল পরিকল্পনা। যেই বিশাল খাট বানিয়েছি। যদি এক বার দেখতে। কিন্তু কী কপাল আমার?”

আফরোজ ম্যাডামের চোখ থেকে অনবরত পানি পড়ে। তিনি আমার কাছে আর একটা ছোট জিনিস চান। আমি তা দিতে পারি না। পরিবর্তে আমি তাঁকে আমার দুই গাল দিই।

নারী যে নারীকে এত ভালবাসতে পারে আমার তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল। মনে হচ্ছিল না, দুই গাল নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব। তবে উনি এত ভাল যে দাঁতের ব্যবহার করেননি।

আমি গাল ধোয়ার জন্য আর এক বার বাথরুমে গেলাম। ফিরে আসার সময় আফরোজ ম্যাডাম আমার দিকে যে কৃতজ্ঞতার চোখে চাইলেন, তা আমি কখনও ভুলতে পারিনি। তাঁর এত আছে অথচ তাঁর কিছুই নাই। তিনি বললেন, তোমাদের কোনও উপকার করতে পারিনি বলে খারাপ লাগছে।

পরে আমি যখন মেডিটেশন শুরু করি, আমি আফরোজ ম্যাডামকে মেডিটেশন করার জন্য পরামর্শ দিতে অনেক খুঁজি। আমাদেরকে প্রত্যেক ডাক্তারই মেডিটেশন করতে বলেছিলেন। আফরোজ ম্যাডামের তা অজানা থাকার কথা নয়। তবু আমি তাঁকে খুঁজেছি নিজে তাঁকে মেডিটেশনের কথা বললে শান্তি পাব এই ভেবে। আমি আফরোজ ম্যাডামকে আর পাইনি। তিনি তখন লন্ডন চলে গেছেন।

ফেরার পথে পাগল গাড়িতে বমি করে। কারণ আমার জামা, মুখ, বুক, হাত, চুল সব কিছু থেকে ডাক্তার গুল আফরোজ বানুর সুবাস বের হতে থাকে। পাগলকে কী দোষ দেব? আমার নিজেরই অস্বস্তি লাগছিল।

বাসায় এসে পাগল চার কি পাঁচ ঘন্টা ধরে গোসল করে। পাগল যখন গোসলখানা থেকে বের হয় ততক্ষণে আমি নিজে গোসল করেছি, আব্বার দুপুরের খাবার তদারক করেছি। আর ওই অবস্থায় আমি, আমার ভাই রাশেদ যে অনেক আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, সে জন্য আল্লাহ আর রাশেদ দুজনের কাছেই মনে মনে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

সে দিন গোসলখানা থেকে বের হয়ে পাগল আমাকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে মারে। আফরোজ ম্যাডামের সুবাস মুক্ত আমাকে পাগল ইচ্ছেমতো ধোলাই করে। গালে, পিঠে, বুকে, কোনও জায়গা নাই যেখানে পাগলের হাত আমাকে আঘাত করে না। আমি পাগলের মার হজম করি। কারণ আমি তার কষ্টের কথা জানি। পাগল তো আমাকে শুধু আফরোজ ম্যাডামের সুবাসের জন্য মারছে না। সে আমাকে মারছে আমাদের পরিবারের যাবতীয় দুঃখের জন্য। যার শুরু জহিরের আগমন আর শেষ হামিদের খুনের মাধ্যমে। আমি গন্ধ-পাগল হামিদের কথা স্মরণ করি, তার জন্য এক দীর্ঘশ্বাসও ফেলি। আমি পাগলকে বলি, গন্ধকে তুমি এত ঘৃণা কর কেন? আমার আর রাশেদের যখন জন্ম হয়, তখন কোন গন্ধ বের হয়েছিল?

এ কথা বলার পর পাগল থামে। আমি ইচ্ছে করে পাগলকে আঘাত করি।

সে রাতে আমি আর পাগল আর আব্বা এক সাথে খানা খাই। আব্বা জিজ্ঞেস করে, আমার গালে কী হয়েছে। আমার গাল লাল কেন? আমি বলি, কিছু হয়নি, আব্বা। হামিদের খুনের পর থেকে আমি আব্বার জীবন থেকে নির্বাসিত ছিলাম। মা পাগল হয়ে নিজেই আব্বার বিছানা ত্যাগ করেছে। তারপর থেকে লোকমান, মানে আমাদের ড্রাইভার, আব্বার ঘরে ঘুমাত। কারণ আব্বাকে ধরে বাথরুমে নিয়ে যেতে হত। লোকমান আব্বাকে ভালবাসত। আমাদের গাড়ির তেমন ব্যবহার ছিল না। লোকমানের প্রধান কাজ ছিল আব্বার দেখাশোনা করা। খাবারের টেবিল থেকে উঠে আব্বা লাঠির সাহায্যে হেঁটে নিজের ঘরে যায়। আমি আর পাগলও আব্বাকে অনুসরণ করি। আব্বার ঘরে ঢুকে দেখি লোকমান বাথরুমে আব্বার সিপাপ মেশিনের নল ধুচ্ছে। ওই মেশিনের বাতাস ছাড়া আব্বা ঘুমের মধ্যে নিঃশ্বাস নিতে পারত না। আমি খেয়াল করি, লোকমান ভাল করে সিপাপের নল ধুতে পারছে না। সিপাপ মেশিন ভাল করে ধোয়া না হলে আব্বার বিপদ

হবে। ওই মেশিনের অপরিষ্কার নল থেকে আব্বার ফুসফুসে সংক্রমণ হতে পারে। আব্বার নিউমোনিয়া হলে আব্বা মরে যাবে। আমি সিপাপের নল আর মাস্ক ভাল করে ধুয়ে দিই। আমার গালে নিপীড়নের ছাপ দেখে আব্বার বুঝি দয়া হয়। আমার গলা ঘেমে যায় যখন ভাবি আফরোজ ম্যাডাম কীভাবে নেহারিতে সুখ টান দেয়ার মতো করে আমার গালে টান দিয়েছেন আর কীভাবে তা চিবিয়েছেন। আমি হামিদকে খুন করার আগে আব্বাকে বাগে পেলে আব্বাকে অবশ্য খুন করতাম। কিন্তু হামিদকে খুন করার পর আমার তেজ শেষ হয়ে যায়। সে রাতে আব্বার করুণা পাওয়াতে আমার মন আফরোজ ম্যাডামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

আমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে লোকমানকে আব্বার ঘর থেকে স্থানান্তর করা হয়। পাগল আক্লিমাকে দিয়ে লোকমানের সিঙ্গেল খাটটায় নতুন বিছানা করে দেয়। সে রাতে আমি নিজে আব্বার নাকে সিপাপ মেশিনের মাস্ক পরাই। লোকমান চলে যায় নিচতলায়, সেখানে একটা খালি ঘর আছে, ম্যানেজার মাজহারের ঘরের পাশে। আমি আব্বার জন্য মশারি টাঙাই। লোকমানের খাটে না শুয়ে আমি আব্বার খাটে শুই। আমার গভীর ঘুম হয়। অনুভব করি আব্বার একটা হাত আমার মাথার উপর। যত তা অনুভব করি তত গভীর ঘুমাই। পাঁচ কি ছয় দিন পর আমি লোকমানের খাটে শুতে গেলে আব্বা নাক থেকে সিপাপের মাস্কটা দুই হাত দিয়ে একটুখানি খুলে ধরে জিজ্ঞেস করে, এর কারণ কি? আমি বলি, আপনি কিছু বোঝেন না? আপনি নামাজ পড়েন। আব্বা বলে, তুমি তো নামাজ পড়ো না। এ কথা বলে আব্বা আবার সিপাপের মাস্কটা নাকে স্থাপন করে। আব্বার কণ্ঠের তীক্ষ্ণতা আমি অবহেলা করতে পারি না। আমি গিয়ে আব্বাকে জড়িয়ে ধরি। আর তাতে এমন সুখ পাই মনে হল শৈশবে চলে গেলাম। মন চাইল লোকটার বুকের উপর গিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে শুই, তারপর ঘুমাই, যেমন করে শৈশবে ঘুমাতাম। কিন্তু ওই লোকের তখন আর সেই শক্তি ছিল না। তার বুকের উপর যদি আমার হাতও রাখতাম তাও তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হত। তারপরও সে রাতে তার বুকে ঘুমিয়েছি। গভীর ঘুম। এক মুহূর্তের জন্য তার একটা হাত আমার মাথা থেকে সরেনি। আর সেই সুখে সে রাতে আমি একের পর এক আসমানে উঠে গেছি। এ ভাবে সপ্তম আসমানে উঠেছি। এত সুখ পেয়েছি মনে হয়েছে ঘুমের মধ্যে আমি ছিদ্রাতুল মুনতাহার চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছি। এর পর আব্বার মৃত্যু পর্যন্ত একটা রাত যায়নি যে রাতে আব্বার একটা হাত আমার চুলের উপর ছিল না। আব্বা হাসপাতালে মারা যায়। রাত একটা ছয় মিনিটে। আব্বার বাম হাত ছিল আমার চুলের উপর। তবে আব্বা আমার ক্ষমা না পেয়েই মৃত্যু বরণ করেছে। সে কথা এখন থাক।

হামিদের খুন আমাকে যে রোগ দিয়ে যায় তার জন্য ডাক্তার গুল আফরোজ বানুর ঘটনার পর আমি আর কোনও ডাক্তারের কাছে যাইনি। তবে পাগলকে আরও অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, কারণ পাগলের অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হতে থাকে। আমি আগের ডাক্তারদের দেয়া বিভিন্ন বড়ি খেতে থাকি। পাগলও নতুন নতুন ডাক্তারের দেয়া বড়ি খেতে থাকে। বড়িতে আমার কী উপকার হয়েছে, তা আমি জানি না। পাগলের কোনও উপকার হয়নি।

এ ভাবে প্রায় নয় বছর চলে। এর পর আমি বড়ি ছেড়েছি। কিন্তু হাল ছাড়িনি। হাল না ছেড়ে আমি খুনের পাপবোধকে আমার জীবনের অংশ করে নেয়ার সংগ্রামে লিপ্ত থাকি। অনেক বার মনে হয়েছে তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে মন খুলে কথাটা বললে শরীর কিছুটা হালকা হবে। তার জন্য আমি তানিয়াকে বেছে নিলাম। ভাবলাম ওকে খুনের ঘটনাটা বলব। অনেক বছর ধরে তানিয়ার সাথে আমার পরিচয়। আমাদের মধ্যে আস্থার সম্পর্কও তৈরি হয়েছিল। দু'এক দিনের মধ্যে তানিয়াকে বলব, এমন সিদ্ধান্ত আমার চূড়ান্ত ছিল।

আজ সেই সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। আগামী দিনগুলিতে আমার কী হবে, কে জানে ? আগামী দিনগুলিতে তানিয়ার জীবন আবর্তিত হবে মুক্তি ক্লিনিক ঘিরে। তানিয়া যদি আরও পনেরো বছর ঋতুবতী থাকতে পারে, তবে সে পঁয়তাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ বার মুক্তি ক্লিনিকে যাবে। মুক্তি ক্লিনিকে তানিয়া ক্ষণিকের জন্য

মুক্তি পাবে। আবার ভারী হবে। আবার মুক্তি ক্লিনিকে গিয়ে মুক্ত হবে। মুক্তি ক্লিনিক তানিয়াকে মুক্তি দেয়। মুক্তি ক্লিনিক আমাকে খুনি বানিয়েছে, কারণ তখন আমি অবুঝ ছিলাম। খুন করে আমি বুঝদার হয়েছি। কিন্তু তাতে আমার মুক্তি আসেনি।

দশ

উপদেবী এজিনাকে সুনিও গিরির নিচে সাদা বালুতটে স্নান করতে দেখে দেবরাজ জিউসের কামনার উত্থান ঘটে। সেই উত্থানের ঝড়ে দেবরাজের ক্লামিস খুলে যায় আর উপদেবীর কাইতেন উড়ে গিয়ে মাঝ সমুদ্রে পড়ে। কয়েক দিন সাগর জলে ডুবে থেকেও দেবরাজের ঘাম ঝরা বন্ধ হয় না। দেবরাজ এজিনাকে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। তিনি বলেন অপ্সরা এজিনা না নেভালে তাঁর কামনার আগুন মাউন্ট অলিম্পাসের পুরো জঙ্গল পুড়ে ছাই করে দেবে। তখন দেব-দেবীরা সূর্যের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? তারা যখন তখন লোকালয়ে হামলা করবে। যাকে তাকে ধরে নিয়ে কামনা মেটাবে। এজিনা কি এমন অনাচার চান? যদি না চান তিনি যেন দেবরাজের জন্য কিছু করেন।

এজিনা পৃথিবীর নারীদের কথা ভেবে মহামহিম জিউসের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। জিউস এজিনাকে নিয়ে মিলনের উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে ছুটতে থাকেন। এজিনার পিতা নদ-দেব আসোপাস তাঁদের দেখে ফেলেন। আসোপাস দেবরাজের কামকাতর চরিত্র ঘৃণা করতেন। দেবরাজের হাত থেকে নিজের মেয়েকে বাঁচানর জন্য তিনি তাঁর কন্যার অপহরনকারীকে তাড়া করেন। করিন্থে এসে আসোপাস রাস্তা হারিয়ে ফেলেন।

করিন্থের রাজা সিসিফাসের চোখ কিছু এড়ায় না। তিনি আসোপাসকে বলেন, যদি আসোপাস করিন্থের উপর এক বারোমেসে ঝর্না প্রবাহিত করেন তবে তিনি আসোপাসকে অপহরণকারীর পথ দেখিয়ে দেবেন। আসোপাস সিসিফাসের শর্ত পূরণ করেন আর কন্যাকে উদ্ধার করার জন্য সিসিফাসের দেখানো পথে জিউসকে তাড়া করেন। আসোপাস জিউসের ছোঁড়া বজ্রের কাছে নতি স্বীকার করেন। জিউসের প্রেমে এজিনা রাজা একাসের জন্ম দেন।

দেবরাজ জিউসের ক্রোধ সিসিফাসকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে।

মৃত্যুদেব থানাটস আসেন সিসিফাসের জান কবজ করতে।

“পবিত্র জিউসের নির্দেশ,” থানাটস সিসিফাসকে বলেন। “আমাকে তোমার আত্মা নিয়ে তারতারুসের গুহে ফেলে দিতে হবে।”

তারতারুস হল পরকাল হেডিজের নিকৃষ্টতম স্থান।

“পবিত্র জিউসের নির্দেশ শিরোধার্য,” সিসিফাস বলেন। “তার আগে আমি কি একটা ফরিয়াদ জানাতে পারি, মৃত্যুদেব?”

“কী চাও তুমি?”

“ধন্যবাদ, মৃত্যুদেব।” সিসিফাস থানাটসকে প্রণাম করেন। “আমি দেখতে চাই আপনি কেমন করে আপনার হাতের এই শিকলের গোছা দিয়ে আমাদের আত্মাকে বন্দি করেন।”

“এটা খুব সহজ ব্যাপার,” থানাটস বলেন। “দেখে নাও, সিসিফাস। এমন করে।”

থানাটস যেই সিসিফাসকে প্রাণসংহারের কৌশল দেখাতে যান অমনি সিসিফাস মৃত্যু-শিকল কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে থানাটসকেই বেঁধে ফেলেন।

মাউন্ট অলিম্পাসে জিউসের নেতৃত্বে দেব-দেবীদের সভায় উপস্থিত পসাইডন, আথেনা, হেডিজ, হেরা, আপোলো, আরিস, আফ্রোদিতেসহ সব শক্তিমানের কপালে ভাঁজ পড়ে। সিসিফাস কত চালাক! যতক্ষণ থানাটস শিকলে বন্দি থাকবেন ততক্ষণ পৃথিবীতে কোনও মানুষের মৃত্যু হবে না। মানুষ অমর হয়ে যাবে বিষয়টা অমর দেব-দেবিগণ কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। ক্রোধোন্মত্ত জিউস তাঁর পুত্র আরিসকে নির্দেশ দেন থানাটসকে মুক্ত করতে। আরিস বলপ্রয়োগ করে থানাটসকে উদ্ধার করেন আর সিসিফাসকে তাড়া করতে থাকেন।

সিসিফাস জানেন তিনি বেশি দিন দেবতাদের ফাঁকি দিতে পারবেন না। সিসিফাসের মাথায় তখন আর এক বুদ্ধি আসে। থানাটস পুনরায় দেখা দেয়ার আগে সিসিফাস তাঁর স্ত্রীকে বলেন, যদি স্ত্রী তাঁকে সত্যিই ভালবাসেন, তিনি যেন সিসিফাসের মৃত্যুর পর তাঁর উলঙ্গ মৃতদেহ শহরের মূল চত্বরে ফেলে রাখেন। সিসিফাসের স্ত্রী তাঁর স্বামীর মতলব সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেন।

পরকাল হেডিজে এসে সিসিফাসের আত্মা হেডিজের রানি পেসেফোনিকে জ্বালাতে থাকে। সিসিফাসের আত্মা বলে, “রানিমাতা দেখুন, কত নিষ্ঠুর আমার স্ত্রী। কেমন করে তিনি আমার প্রাণহীন দেহটা শহরের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, আর কেমন করে তা পচে চলেছে, কেমন করে কাক আর শুকুন একসাথে আমার দেহের উপর বসে আমার গলতে থাকা নরম মাংস ঠোঁট দিয়ে কেটে কেটে ভক্ষণ করে চলেছে। দয়ার রানী, আপনি কী করে এমন অন্যায় মেনে নিতে পারছেন?”

সিসিফাসের আত্মা পেসেফোনিকে দিনরাত উত্ত্যক্ত করতে থাকে। এক সময় পেসেফোনি সিসিফাসের আত্মাকে পৃথিবীতে ফেরার অনুমতি দেন। যাতে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে তাঁর অপকর্মের জবাব নিতে পারেন।

পৃথিবীতে এসে সিসিফাস আর হেডিজে ফিরতে চান না। তিনি আবার দেবতাদের ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করেন। জিউসসহ সব বড় বড় দেবতা সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা সিসিফাসকে আর কোনও সুযোগ দেবেন না। তাঁরা সিসিফাসকে শাস্তি দিবেন।

দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত মৃত্যুর পর হেডিজে এনে সিসিফাসকে পুনর্জন্ম দেয়া হয়। দেবতাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৃত্যুকে দুই বার ফাঁকি দেয়ার শাস্তি হিসাবে সিসিফাস এক ভারী শিলাখণ্ড ঠেলে ঠেলে উঁচু এক পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে উপরের দিকে তোলেন। পাহাড়ের চূড়ায় ঠেলে পাঠানর ঠিক আগে পাথরটা সিসিফাসের হাত ফসকে পড়ে যায় আর গড়িয়ে পাহাড়ের পাদদেশে যেতে থাকে। সিসিফাস গড়ানো পাথরের পেছনে ছোটেন। আবার তিনি পাদদেশ থেকে ওই পাথরকে ঠেলে চূড়ার দিকে তুলতে থাকেন। চূড়ার কাছে এসে আবার পাথর সিসিফাসের হাত থেকে বের হয়ে যায়। আবার সিসিফাস গড়ানো পাথর তাড়া করেন। গোড়ায় এসে তার নাগাল পান। আবার সিসিফাস সে পাথর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরের দিকে ঠেলতে থাকেন।

সিসিফাসকে অনন্তকাল পাথরটা পাহাড়ের গা বেয়ে ঠেলে যেতে হবে।

সিসিফাস দেবতাদের দেয়া শাস্তি মেনে নেন। নিজের করনীয় হিসাবে। হোমার সিসিফাসের সিদ্ধান্তকে প্রজ্ঞা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কামু হোমারের সাথে একমত। কামু এমনও বলেছেন আমাদের উচিত সিসিফাসকে সুখী মনে করা।

আমি শিশিরকণা। পৃথিবীতে দাম্পত্যের অস্তিত্ব আমার দুর্ভোগের কারণ। আমি সিসিফাসের মতো তা মোকাবেলা করি।

এগারো

তেরো বছর বয়সে জীবনে আমি প্রথম দাম্পত্যের বিপর্যয় দেখি। আমার আব্বা তখন ফেনীর ডিসি। আম-কাঁঠালের বাগানের ভেতর একটা লাল বাড়িতে আমরা থাকি। বাড়ির দোতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় আমার ঘর। ঘরের পেছনের বারান্দায় গেলে আমি একটি আমগাছ আর একটি কাঁঠালগাছ দেখতে পাই। আমার ঘরে সবার আগে সূর্য ওঠে। এর আগের বছর হেমন্তের এই সময়ে আমি আমগাছে হলুদ রঙের বোল ফুটতে দেখেছি। যখন বোল আমে রূপান্তর হচ্ছিল তখন কাঁঠাল গাছে ফুল ফোটে। সাদা-হলুদ কাঁঠাল ফুল। ফুল থেকে মুচি বের হয়। রক্তের প্রকাশ আমার নারীর প্রকাশ এক ধাপ এগিয়ে দেয়। ফুল থেকে ফলের রূপান্তর দেখে দেখে আমি আমার বিকাশ অনুভব করি।

তার নয় মাস পরের ঘটনা। সে-দিন ভোরে আমি ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। সোনালি আলোয় আমার হাত ডুবে যায়। আমি আমার সীমানার আমগাছ আর কাঁঠালগাছ দেখি। দেখি কাঁঠাল পাতা। বৃষ্টি-ধোয়া কাঁঠাল পাতার রং। সবুজের সবচেয়ে খাঁটি রূপ। নিষ্পাপ কৈশোরের আলোয় ডুবে আমি ভাবছিলাম। এই বিশ্বে মানবী হিসাবে আমার আবির্ভাবের প্রভাব। সেই দিনের অনুভব আজকের পরিণত মস্তিষ্ক দিয়ে প্রকাশ করলে যা দাঁড়ায় তা হল: পৃথিবীতে আমি একটা আধ্যাত্মিক রাজত্ব করব। আমার অনুভব দিয়ে। আমাকে ধোয়া বাতাসের ঢেউ পৃথিবীর এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ছড়িয়ে যাবে। কামনার বারুদে কখনও আগুন লাগাব না। ওটা যেমন আছে তেমনি থাকবে। পৃথিবীতে থরে থরে সাজিয়ে রাখা পারমাণবিক বোমাগুলির মতো। আহা, জীবন কত মধুর। রিক্সার টুংটাং শব্দে। হেমন্তের ধানের গন্ধে। আমার দেহের প্রতিটা কোষ দিয়ে আমি শরতের ভোরের রূপ-গন্ধ-স্পর্শ আস্বাদন করি। অথচ তখন সচেতনতা সম্পর্কে আমি কিছু জানতাম না। না জেনেই আমি সচেতন, সপ্রতিভ। আসলে শিশুর চেয়ে সপ্রতিভ আর কে আছে। এ সময় আমি টেলিফোনের ট্রিং ট্রিং শব্দ শুনি। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কর্কশ শব্দ আমার নিষ্কলুষ সপ্রিতভতার সুখে বিঘ্ন ঘটায়। আমার স্বপ্নপ্রয়াণ ভেঙ্গে যায়।

“হ্যালো।” আমার আব্বার গলার দরাজ, মার্জিত আওয়াজ। তারপর আর কিছু শুনি না। মিনিটখানেক পরে আবার আব্বার কণ্ঠ শুনি। “আচ্ছা।”

আব্বা বারান্দায় এসে আমার ঘাড়ে হাত রাখে, সামান্য ভেজা হাত। ঘামে ভেজা। কিন্তু কেন?

“চলো,” আব্বা বলে। “করিমের বাড়ি।”

আমার ভাল লাগে। আব্বা আমাকে গুরুত্ব দেয়। আমার ভাই রাশেদ যদিও এখনও ছোট। ও শুধু দুধভাত খায়। আর আব্বা আমাকে বাইরে নিয়ে যায়।

বৈঠকখানায় ঢুকে আমি ডাইনিং টেবিলে মাকে দেখি। সবুজ শাড়ি পরা মার সামনে নাদুসনুদুস রাশেদ খালি গায়ে বসা। আমি রাশেদের গোলাপী বাহুর তুলতুলে শিশু-মেদ দেখি। মা রাশেদের জন্য দুধ-ভাত-কলা

মাখছে। রাশেদ অপলকে মায়ের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন রাশেদ শুধু ওই দুধভাতই নয়, ও পৃথিবীর সব কিছু চায়। আমি ভাবি আমি রাশেদের জন্য দুধের নদী আর কলার পাহাড় বানাব যাতে ওর কখনও দুধ আর কলার অভাব না হয়। রাশেদের জন্য অনেক ধানের জমি চাষ করব এমনটা ভাবতে ভাবতে আমি আর আব্বা ওদের পেছনে রেখে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ি।

আব্বা নিজে গাড়ি চালায়। গাড়িতে উঠে আমি বুঝতে পারলাম আব্বা কতটা বিচলিত। আব্বাকে কখনও এর আগে ভিড়ের রাস্তায় এত অধৈর্য হতে দেখিনি। ড্রাইভার কখনও ধৈর্য হারালে আব্বা বলত, রাজা মিয়া, আমি কি কখনও তোমাকে পেছন থেকে তাড়া দিয়েছি? না, স্যার, দেন নাই। এ কথা বলে রাজা মিয়া মসৃণভাবে গাড়ি চালাত। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা পার হতে দেরি হচ্ছিল। আব্বা স্টিয়ারিং হুইলটার চারদিকে তার মুষ্টি দৃঢ়তর করে। পরপর তিনটা রিক্সার কারণে আমাদের সরকারি ভ্যানটা রাস্তায় যথেষ্ট জায়গা পাচ্ছিল না। কে যেন আব্বাকে চিনে ফেলল। ডিসি সাব গাড়িতে। তারপর সবাই বুঝে ফেলে। মুহূর্তে রিক্সাগুলি যে যে-দিকে পারে সরে যায়। একটা রিক্সা রাস্তা থেকে নেমে ঘাসের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর ফাঁকা রাস্তা। আব্বা এক নিঃশ্বাসে গাড়ি টেনে করিম চাচার উঠানে গিয়ে থামে।

আমরা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামি। আর সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে লাল বাড়িটার দোতলায় উঠি। আব্বা বেশ জোরে করিম চাচার ফ্লাটের দরজায় আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করে। একটা মেয়ে আমাদের দরজা খুলে দেন। আমি মেয়েটাকে দেখি। সতেরো কি আঠারো বছরের একটা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী নারী। লম্বায় বোধ হয় আমি তাঁর চেয়ে একটু বেশি হব। তিনি লাল শাড়ি পরা। তিনি পান খাচ্ছেন আর তাঁর গা থেকে আতরের সুগন্ধ বের হচ্ছে। তাঁকে দেখে আমার বুক হালকা হয়। মানুষের চেহারা আর দেহভঙ্গি থেকে বের হওয়া বাতাস যে শান্তি ছড়াতে পারে সে বিশ্বাস আমার পোক্ত হয়। তবে সে নারীর মুখে কোনও হাসি নাই। আবার চোখে কোনও আতঙ্কও নাই।

আব্বা আমাকে টান দেয়। আমি কিছু শব্দ শুনি। অস্বাভাবিক শব্দ। আমি কান পাতি। আমি পেছনে ফেলে আসা মেয়েটার দেয়া শান্তি আর ধরে রাখতে পারি না। বরং অজানা শব্দগুলি আমার বুকে টিপটিপ করে বাজা শুরু করে। আমরা করিম চাচার ফ্ল্যাটের ভেতরের দিকে যাই।

মূল বেডরুমের দরজা ঠেলে আমরা ভেতরে ঢুকি। আব্বা বাতাসে ধাক্কা খায়। আমি ধাক্কা খাই আব্বার সাথে। আমি আব্বার ছাটনার কোনা দিয়ে উঁকি দিই। করিম চাচা একটা ধাক্কা খান। কিন্তু চাচির কোনও দিকে তাকানোর মতো অবস্থা নাই। আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু আমি জানতাম ওই দৃশ্য না দেখে ওখান থেকে ফেরা যাবে না। আমি জোর করে চোখ খুলি।

চাচি তাঁর লোহার ধজি দিয়ে চাচাকে পেটাচ্ছেন। চাচির নিঃশ্বাসের হুতাশ আর চাচার মনুষ্য-পেশিতে ধজির বাড়ির ধেব ধেব আওয়াজ ছাড়া পুরো বাড়িতে আর কোনও শব্দ নাই। মাঝে মাঝে প্রহারের শব্দ তীক্ষ্ণ হয়। তখন আবার আমার চোখ বন্ধ হয়ে যেতে চায়। ধজি চাচার হাঁটুতে বাড়ি দেয়। ঠাশ্ করে শব্দ হয়। আমি আর আব্বা ঝাঁকুনি খাই।

ধজি শব্দটা ফেনীর ভাষা। ধজি দিয়ে চুলার উপর বসানো তরকারি নাড়ানো হয়। বৈয়াম থেকে ধজি দিয়ে লবন তুলে তরকারিতে লবন দেয়া হয়। গ্রামের কোনও মহিলা তরকারিতে লবন কম বা বেশি দিলে তাঁর স্বামী তাঁকে সংশ্লিষ্ট ধজি দিয়ে পিটিয়ে শাস্তি দেন। আমরা তখন ধজির এই তিনটা ব্যবহার জানতাম। ধজি সাধারণত কাঠের হয়। চাচির ধজি লোহার। আমি চাচার পিঠ দেখি। অন্তত বিশ জায়গায় কাটা। আমি মনে মনে বলি, চাচা আপনি কেন খালি গায়ে মার খেতে গেলেন? এখনতো জুলাই মাসের গরম পড়ছে না, যে গরমে ঘরের মধ্যে অবশ্য কোনও পুরুষই শরীরের উপরের অংশ ঢাকে না। ব্যতিক্রম শুধু আমার আব্বা।

আমার আব্বার এমন কোনও গেঞ্জি নাই যা বাহুর অর্ধেক ঢাকে না। করিম চাচার পরনে একটা পাজামা ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি খেয়াল করি আমাদের উপস্থিতিতে করিম চাচার চোখে লেগে থাকা আতঙ্কের প্রলেপ ক্ষীণ হয়ে আসে। সেই চোখজোড়া তিনি আমাদের থেকে সরিয়ে নিয়ে নীরবে ধজির বাড়ি গিলতে থাকেন, যেমন করে কোনও সুবোধ শিশু চোখ নামিয়ে মাথা কামানোর সংবেদনশীলতা হজম করে।

ধজির একটা বাড়ি চাচার পাঁজরে পড়ে। চাচা বাড়ি খাওয়া সাপের মতো আঁকাবাঁকা হন। তিনি ডান দিকে কাত হয়ে যান। অনুনয় করেন, "খাদিজা, রানের উপর মারো।"

চাচা তাঁর উরু দুটি চাচির দিকে বাড়িয়ে দেন। তিনি চাচিকে তাঁর রানের দিকে ইশারা করেন। চাচি আমার বা আব্বার উপস্থিতি স্বীকার করছেন না। তিনি এক কদম পিছিয়ে গিয়ে তাঁর কোমরের উপরের অংশ মেঝের সমান্তরালে এনে ডান হাত টেনে চাচার উরুতে দ্বিগুণ জোরে বাড়ি দেন। আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখে চাচি কায়দা করে তাঁর ধজি দিয়ে চাচার রান আর গুলে আক্রমণ চালান।

"ভাবী, আপনি ওকে মেরে কি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন?" আব্বা বলে।

"না, পারব না।" চাচি খেঁকিয়ে উঠেন। "আর আপনাকে কে বলেছে আমি সমাধান চাই?"

চাচি ধজিটা আকাশে ছুঁড়ে মারেন আর নৃত্যশিল্পীর দক্ষতায় লাফ দিয়ে ওটার আগাটা পাকড়াও করেন। উনি নিজের কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে নেন, তারপর ধজির গোড়াটা চাচার ডান চোখে ঠেসে ধরেন।

চাচার মাথা কেঁপে ওঠে। শীতল ঘামে আমার জামা ভেজা শুরু হয়। চাচি এক হাতে ধজির গোড়া চাচার চোখে ঠেসতে থাকেন, অন্য হাতে চাচার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা টেনে ধজির দিকে আনেন।

আমার মুঠিতে থাকা আমার আব্বার শার্টের পাঁজরের উপর আমার বন্ধন দৃঢ় হয়। মনে হয় চাচার চোখ গলে তরল পদার্থের ফোয়ারা ছুটবে। এর পর আমার ভেতরের প্রত্যঙ্গগুলি শক্ত হতে থাকে। আমি চোখ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাই, আমার চোখের সামনে পড়ে মানব-রচিত তিনটি চিরস্থায়ী দুঃখের উপমার একটি: চাচা-চাচির বিয়ের ছবি। লাল কাতান শাড়ি পড়া চাচি আর লাল সিল্কের পাঞ্জাবি পরা চাচার বিয়ের ওই ছবিটা আমার চোখে চিরতরের জন্য গেঁথে যায়, যে ছবি দেখলে যে কারও মনে হবে, বাসরে তাঁরা যে মিলন করবেন, তা চিরকালের, যে শূলে চাচা চাচিকে গেঁথে নেবেন, চাচি ইহকাল আর পরকাল কোনওকালেই সেই শূল থেকে এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে আলগা করতে চাইবেন না, প্রয়োজনে আত্মহত্যা করবেন; আর চাচা, তিনি যে মধুর বানে ঠোঁট ডুবাবেন, মৃত্যু ছাড়া সেই ভাণ্ড থেকে তাঁর মুখ আলগা করার মতো পৃথিবীতে আর কোনও শক্তি থাকবে না।

দেয়ালে টাঙানো ওই বিয়ের ছবিতে কী সুন্দর তাঁরা। আর তাঁরাই এখন এখানে এই জমিনে কত কুৎসিত। সাদা পাজামা পরা আর মোটকা পেটের ওজন ধারণ করা আর পিঠে মারের ঘা নিয়ে খাটের কানায় পাছা ঠেকিয়ে বসে থাক করিম চাচা। আর রঙ উঠে যাওয়া আর বোরকা সদৃশ ম্যাক্সি পরা, যার তলে আর কোনও পোশাকের আভাস নাই, আর ধজির ব্যবহারে ঘর্মাক্ত-পরিশ্রান্ত আর ঠোঁটের দুই কোনায় জমা হওয়া কশ শুকিয়ে যাওয়া করিম চাচার স্ত্রী।

আমি প্রহসনের রূপকালঙ্কারের দিকে তাকিয়ে চাচার আর্তচিৎকারের জন্য অপেক্ষা করি।

চাচার আর্তচিৎকার আসে না। আর ওই ছবিটাও দেখতে আমার ভাল লাগছিল না। আব্বা একটু সরে দাঁড়ায়। আমিও আব্বার শার্ট ধরে চাচির ডান দিকে সরে যাই। সেখান থেকে চাচির মুখ দেখা যায়। আমি ছবি থেকে চোখ ফিরিয়ে চাচির দিকে তাকাই। তাকাই চাচার দিকে। দেখি চাচার চোখ তখনও গলেনি। তবে

চাচির কাঁপুনি বেড়েছে। মনে হল না চাচি একটা চোখ গেলে থেমে যাবেন। দুই চোখ হারালে চাচা জনমের মতো অন্ধ হয়ে যাবেন। আমার দুশ্চিন্তা হয়। অন্ধ চাচাকে কে দেখবে? ওই মেয়েটা দেখবে কি, যে আমাদের দরজা খুলে দিয়েছিল? আমি স্পষ্ট দেখতে পাই চাচা হাত-পা ছেড়ে দিয়েছেন। যেন চোখ গলে গেলে গলে যাক। তবু এই যাতনার শেষ হোক। চাচি ধজির আগা চাচার চোখে ঠেসতে থাকেন।

"দিলাম, এখনই দিলাম ঢুকিয়ে। দেখি, তোরে কে বাঁচায়।"

চাচির হুমকিতে আমার বুক কাঁপে, আমি আব্বার যে পেশি মুঠো করে ধরেছি সেই পেশিও কাঁপে।

আমি বুকের কাঁপন সহ্য করে চাচার মুখের দিকে তাকাই। দেখি তাঁর বিকৃত মুখ। চাচা মাথা নাড়াতে সাহস পাচ্ছিলেন না। চাচার কপালটা শক্ত হয়ে আছে। চোখ গলার ধাক্কা সামলানোর জন্য।

চাচি কাঁপেন। চাচার নিচের ঠোঁট ঝুলে গেছে। সেটা বেয়ে লালার ধারা গড়িয়ে পড়ছে। গালের পেশিকে কাজে লাগিয়ে বহু কষ্টে চাচা সেই ঠোঁট উপরের দিকে আছাড় দিয়ে কাতর হয়ে বলেন, "স্যার, আমি আল্লাহর আইনে কোনও অপরাধ করিনি।"

আমার আব্বা চাচার কথার উত্তর দেয় না। চাচি আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে একটা গালি দেন। গালি দিতে গিয়ে তাঁর চোখ ঘোলা হয়ে যায়। মনে হয় চাচি মূর্ছা যাবেন। আব্বা বুঝি চাচিকে ধরার জন্য প্রস্তুতি নেয়, যদি চাচি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কিন্তু চাচি মূর্ছাও যান না, মাটিতেও লুটিয়ে পড়েন না। তবে চাচার চোখ থেকে যে তাঁর হাতের ধজি সরে গেছে, তা চাচার খেয়ালে নাই। আমি নিঃশ্বাস ছাড়ি। চাচির গালিতে লাল মরিচের ঝাঁজ। আমি বলছি আমার তেরো বছর বয়সে দেখা ঘটনা। এখন আমার বয়স মধ্য তিরিশে। আজ সকালে আমি আমার মাকে অনেক মন্দ গালি দিয়েছি। তারপরও আমি চাচির সে গালি এখানে উল্লেখ করতে পারছি না। তা উচ্চারণ করলে আল্লাহর আইন আর রাষ্ট্রের আইন, দুই আইনেই অপরাধ হয়।

"আমি রাষ্ট্রের আইনে অপরাধ করতে পারি, কিন্তু আল্লাহর আইনে কোনও অপরাধ করিনি," করিম চাচা বলেন।

চাচি তাঁর ধজি দিয়ে করিম চাচার পিঠে ঢাশ্ ঢাশ্ করে চারটা বাড়ি দেন আর একই সাথে মুখ দিয়ে আল্লাহর উপর তাঁর ক্রোধ ঝাড়েন।

"একটা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করব, ভাবি," আমার আব্বা বলে।

চাচি আব্বার দিকে তাকান। চাচির চোখে রং ফেরে। সে রং লাল। চাচির চোখ দুটি প্রায়ই লাল থাকত। আর তখন মনে হচ্ছিল চাচি এক মাস ঘুমাননি। চাচি তাঁর চোখজোড়া আব্বার চোখে রেখে একটা কথা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পরিষ্কার জানিয়ে দেন। যার অর্থ হল চাচির সমস্যা সমাধানে আমার আব্বা চাচির দেহের একটা নির্দিষ্ট অংশের একটা চুলও ছেঁড়ার ক্ষমতা রাখেন না। চাচির কথার বিভৎসতায় আমার মনে হল কেউ আমার পায়ের পাতা আর সেন্ডেলের মাঝে দুটি জ্বলন্ত তক্তা বসিয়ে দিল। চাচি যে চুলের কথা বলেছেন তার সম্পর্কে দশ বছর বয়সেও হয়তো আমি তেমন কিছু জানতাম না। অথচ তখন আমি তা নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছি। পায়ের পাতার পাশাপাশি আমার কান দুটিও পুড়ে যাচ্ছিল।

"পারবেন না, ভাই, পারবেন না। একটাও ছিঁড়তে পারবেন না।"

"অবশ্যই পারব," আমার আব্বা বলে, আহাম্মকের মতো।

"কী?" চাচি গলা ফাটান।

“একটা কিছু সমাধানতো করতে পারব।”

“তা হলে করেন। এখনই সমাধান করেন। করে দেখিয়ে দেন।”

চাচি উধাও হয়ে যান আবার মুহূর্তের মধ্যে ফিরেও আসেন। চাচির হাতে একটা চকচকে চাক্কু।

আমি এতক্ষণ কোনওমতে নিজেকে সামলেছিলাম। চাক্কুর রুপালি ধার দেখে মনে হল আমি পড়ে যাব। এর মধ্যে আমি ভেবে ফেলেছি, চাচি শুধু চাচাকে অপমান করে ছেড়ে দেবেন। এখন বুঝলাম আমার সেই ধারণা ভুল ছিল। মনে হল চাচি চাচার চোখ গেলে যথেষ্ট শান্তি পেতেন না। চাক্কু দিয়ে চাচাকে খতম করে তবে তিনি শান্ত হবেন। আব্বা আমাকে আড়াল করে। আমি আব্বার পিঠের পেশি খামচে ধরে নিজেকে সোজা রাখি।

“করেন, ভাই, করেন।” চাচি বলেন। “ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করেন। আপনি আর আপনার মেয়ে,” চাচি দুইটা শব্দ উচ্চারণ করেন। একটা শব্দের লক্ষ করিম চাচার মা, যা চাচি বিশেষণে রূপান্তরিত করে মুখ থেকে ছুঁড়ে মারেন। আমার মাথা যথেষ্ট গরম না হলে ওইসব শব্দ আমি উচ্চারণ করতে পারি না। এখন আমার মাথা ঠাণ্ডা। তাই শব্দ দুইটা উচ্চারণ করতে পারছি না, যদিও তার একটা শব্দ আমি আর আমার মা আজ পরস্পরের উপর যথেচ্ছ বর্ষণ করেছি।

“হাত দুইটা ধরেন, ভাই,” চাচি বলেন, “আর আমি চাক্কুটা ব্যবহার করি।”

চাচি আসলে ব্যবহার করি, এই কথাটাও বলেনি। অন্য কিছু বলেছিলেন। চাচির উদ্দেশ্য পরিষ্কার। চাচি চাচার শরীরের একটা অঙ্গ সমূলে উৎপাটন করতে চান।

“এটাই ন্যায়সঙ্গত সমাধান,” চাচি বলেন। “যতক্ষণ ওটা আছে ততক্ষণ আমার আশা নাই। আর ওইটা না থাকলে এই জানোয়ারকে কেউ পুছবে বলেন? যেমন নাকের ডাক তেমন, বুচ্ছেনতো, কিসের গন্ধ? আপনি থাকবেন এই জানোয়ারের সাথে, আপনি?” চাচি আব্বার দিকে লাফ দেন আর আব্বাকে মনে হয় একটা ঝড় পেছনের দিকে ঠেলে ধরেছে। “আজ আমি সেটা তালের শাসের মতো বের করে আনব,” চাচি বলেন। “আর সেটা রাস্তার কুত্তাকে খাওয়াব। কই, ধরেন!” চাচি আব্বাকে ধমক দেন।

আব্বা ধরল না।

“ধরছেন না কেন আপনি?”

চাচির চিৎকারে আমি কাঁপি, আব্বা কাঁপে, বোধ হয় ক্ষণিকের জন্য পুরো ফেনী শহর কাঁপে। কী যে চাচির অসহায়ত্ব!

চাচি চাক্কুটা বিছানার উপর ছুঁড়ে মারেন।

“বলছিলাম না, ভাই।” চাচি আব্বাকে আবার তার পশম উৎপাটনের অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। “আপনি যে পারবেন না, তার প্রমাণ দিলাম, ভাই। দেখলেন তো? আপনি একটুও এগিয়ে এলেন না। না আপনি। না আপনার মেয়ে।”

চাচির শেষ কথা ছিল ওটাই: চাচির সমস্যা সমাধানের কোনও চাবিকাঠি আমার আব্বার হাতে নাই। চাচি একটা অস্ত্র অর্জন করতে চেয়েছিলেন। গর্ভবতী হয়ে। করিম চাচার বুদ্ধির কাছে চাচি সেখানেও হেরে গেছেন। চাচির হাতে সেই অস্ত্র যাতে না যায় এই জন্য করিম চাচা নাকি পৌরাণিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। শুনেছি চাচি চাচাকে অজগর সাপের মতো বেড় দিয়ে ধরতেন। আর সাপের মতোই ফোঁসফোঁস

করতেন। চাচা তারপরও দিশাহারা হতেন না। বিপদের জায়গায় অবোধ প্রাণকে তিনি ফেলতেন না। চাচি খামচে চাচার পিঠের মাংস তুলে ফেলতেন। সেটাই বরং চাচা মেনে নিতেন। চাচি তখন বুঝে যান রাষ্ট্রের ক্ষমতা কিংবা দৈবের ক্ষমতা, কোনওটাই চাচির সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। রাষ্ট্র, দৈব, চাচি সবাই চাচার স্নায়ুর শক্তির কাছে অসহায়।

করিম চাচা চাচির মারকে ততটা ভয় পেতেন না যতটা ভয় পেতেন তিনি চাচির পরিবারকে। চাচির বাবা ছিলেন মুন্সেফ, জ্যাঠা ছিলেন পুলিশের মহাপরিদর্শক। করিম চাচার চাকরি যাবার ভয়, জেলে যাবার আতঙ্ক। পুলিশের ডান্ডার বাড়ির চেয়ে চাচির ধজির বাড়িকে চাচা কম বিপজ্জনক হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। চাচি ছিলেন লম্বা, কালো, হালকা, আর তিনি বই পড়তেন। চাচা চাচির উচ্চতা, গঠন, গায়ের রং, বই পড়ার অভ্যাস কোনওটাই সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি ফর্সা, বেঁটে, মাখনের মতো নরম আর পাকা আমের মতো টসটসে অল্প বয়সী মেয়েটাকে বিয়ে করেছেন।

সেই মেয়ে, যিনি আমাদের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। অনেক তথ্য পরে জেনেছি। সাতকানিয়া থানার কোনও এক গ্রামে করিম চাচার বাড়ি। মেয়েটির বাড়িও সেখানে। তিনি এসেছেন করিম চাচার সাথে সংসার করতে। গ্রামে একা থাকলে সুন্দরী মেয়েদের যেসব সমস্যা হয়, মেয়েটা সেসব সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় সমস্যা হত রাতে। সবাই ঘুমিয়ে গেলে গুণ্ডারা তাঁর জানালার বাইরে এসে শিস্ দিত, জানালার কাঠে ধাক্কা দিত। এই বুঝি জানালা ভেঙ্গে ওরা এক বা একাধিক ডাকাত ঘরে ঢুকে পড়ল। ভয়ে মেয়েটা সারা রাত গুটিসুটি হয়ে থাকতেন। এই আতঙ্ক থেকে বাঁচার জন্য তিনি করিম চাচার দ্বিতীয় স্ত্রী হতে রাজি হয়েছিলেন। আবার করিম চাচার সাথে করা সমঝোতা ভেঙ্গে তিনি করিম চাচার বাড়িতেও চলে এসেছিলেন।

ফেরার পথে সে দিন আমি মেয়েটাকে ভাল করে দেখি। মেয়েটা যেমন ছিলেন তেমনই। তাঁর মধ্যে না ছিল ভয়, না ছিল উচ্ছ্বাস। কিন্তু ওই অবস্থায়ও তাঁর মধ্যে কী যেন একটা জ্যোতি ছিল। শান্তি ছিল। তিনি ছিলেন ওই সব দুর্লভ মানুষের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা মনের মধ্যে বাস না করে শরীরের মধ্যে বাস করেন। ফলে এঁদের সচেতনতার যেমন বিচ্যুতি ঘটে না, এঁদের সুখেরও কোনও অভাব হয় না, আর এঁদের সুখশান্তি কোনও পরিস্থিতির উপরও নির্ভর করে না, আর এঁরা দুশ্চিন্তায় সময় নষ্ট না করে সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যেমন মেয়েটা করেছিলেন। গুণ্ডায় ভর্তি গ্রাম ছেড়ে দিয়ে তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ জায়গা সতীনের বাড়িতে চলে এসেছিলেন।

চাচি সেদিনই স্বেচ্ছায় চলে যান। প্রথমে তিনি যান পিতার বাড়ি, পরে আমেরিকায়। সেখানে তিনি মনের মতো মানুষকে বিয়ে করেন। চার পুত্রের জননী হন। সেই সব পুত্রের কেউ সিলিকন ভ্যালিতে চাকরি করে, কেউ নিউইয়র্কে ট্যাক্সি চালায়। চাচি কিছু দিন আগে বিধবা হন এবং এখন তিনি একজন ইউটিউবার, সেলিব্রিটি। রাজনীতিবিদ, আমলা আর ব্যবসায়ীদের চাচি কচুকাটা করেন। চাচি বাংলাদেশে আসলে আমার সাথে দেখা করেন। চাচি করিম চাচার জন্য দুঃখ করেন, কিন্তু নিজের জন্য করেন না, কারণ তিনি শেষ হাসি হেসেছেন। চাচি সমাজের আচারকে গালি দেন, বলেন, শিশিরকণা, সমাজ আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, যার সামনে প্রথম সায়া খুলেছি, তাকে ছাড়লে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ আমার কোথাও কি একটা ফোস্কা পড়েছিল? না পড়েনি। সমাজের কেউ মরেছে? মরেনি। মরলে আমিই মরতাম। করিমের ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে কী যে শান্তি পেয়েছি, তোকে বলে বুঝাতে পারব না।

আমি মমতার সাথে চাচির কথা শুনি। আর নিজের কথা ভাবি। চাচি নিজেকে মুক্ত করেছেন। আমি চিরদুঃখে জড়িয়েছি।

বারো

আমরা করিম চাচার বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরও আব্বা অস্থিরভাবে গাড়ি চালায়। আমরা আমার মায়ের চেম্বারে যাই। ততক্ষণে মা সেখানে চলে এসেছে। আমি সেন্ডেল খুলি, আব্বা তার জুতা খোলে। আমার ডান পাশে কাঠের তৈরি জুতার তাক, তার নয়টা খোপের উপরের দিকের তিনটা খোপ খালি থাকে। আমি আব্বার জুতা আর আমার সেন্ডেল উপরের দুইটা খোপে রাখি। পাশের খোপে মার জুতা। রোগী দেখার বিছানাটার পর্দা সরানো। নার্স রেহানা ওটাতে জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছে। স্যাভলনের গন্ধ নাকে আসে। মনির নামক ছেলেটা বালতি আর তোয়ালা নিয়ে বের হয়ে যায়। মা এর মধ্যে সাদা হাত মোজা পরে ফেলেছে। মার থুতনিতে আকাশী রঙের মাস্ক ঝুলছে। আমি মা ছাড়া আর কোনও ডাক্তারকে হাত মোজা আর মাস্ক পরে রোগী দেখতে দেখিনি। এ জন্য মার কাছে রোগী বেশি আসে কি না কে জানে? মা বিলাত থেকে এফসিপিএস পাশ করেছে। সে ওষুধের উপর বিশেষজ্ঞ। এ জন্য সব জায়গায় সে চিকিৎসা করতে পারে। সে আব্বার প্রত্যেক কর্মস্থলে চেম্বার খোলে। রোগী দেখে।

সে দিন শুক্রবার ছিল। তখন সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার করা হয়েছে। মায়ের টেবিলের উল্টা দিকের দুইটা চেয়ারের একটাতে বসে ছিলেন লাল শার্ট আর সাদা টুপি পরা লম্বা একটা লোক আর তার পাশে ধূসর রঙের হাফ-প্যান্ট আর কালো টি-শার্ট পরা একটা শ্যামলা রঙের ছেলে। লোকটার নাম আমিনুর রহমান চৌধুরী। ছেলেটা হামিদুর রহমান চোধুরী। এক জন আমার ভবিষ্যৎ শ্বশুর। এক জন আমার ভবিষ্যৎ স্বামী। আব্বাকে দেখে আমিনুর রহমান চৌধুরী উঠে দাঁড়ান।

"স্যার, আন্নে আইচেন্নে। বইয়েন।" আমিনুর রহমান চৌধুরী বলেন।

আমি টেবিলটা দেখি। নিখুঁতভাবে তাকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। প্রতিদিন তা করা হয়। মা ছাড়া মার চেম্বারে কেউ জুতা পরে না। মার চেম্বারে পরার সেন্ডেল চেম্বারেই থাকে। মা কাজ শেষ করলে নার্সের দায়িত্ব হল ওই সেন্ডেলকে জীবানুমুক্ত করে জায়গামতো রেখে দেয়া।

আমিন চাচার পা খালি, হামিদেরও পা খালি। আমিন চাচা ব্যবসা করে জীবনের উন্নতির সংগ্রামে লিপ্ত। আমি হামিদকে দেখি। হামিদ তখন নবম শ্রেণির ছাত্র, বয়সে আমার থেকে তিন কি চার বছরের বড়। তখন আমার আব্বা বা মা কেউ ধারণাও করতে পারেনি এক দিন হামিদের সাথে আমার বিয়ে হবে। তখন আমি এত সুখী একটা কিশোরী ছিলাম যে প্রেম-পরিণয়-বিয়ে সব কিছু আমার কাছে হাস্যকর ছিল। আমি হামিদকে দেখি। ওর গলায় একটা ময়লার দাগ। বেচারা তখনও ভাল করে গোসল করা শেখেনি। আমার মায়া লেগেছিল। মন চাইছিল ওকে গোসল করা শিখিয়ে দিই। কিন্তু আসলে আমি হামিদের সাথে কোনও কথা বলিনি। আর হামিদও লাজুক ছিল। সেও আমার সাথে কোনও কথা বলেনি। লিকলিকে হামিদের তখন পাছা ছিল না। আর আমি যখন হামিদকে বিয়ে করি, অনেক বছর পর, তখন হামিদের ছিল ডবকা পাছা। হামিদের কথা মনে হলে আমার সব সময় হামিদের ওই পার্থক্যের কথা মনে পড়ে।

আব্বা আর আমিন চাচা করিম চাচার বিপদ নিয়ে আলোচনা করেন। আমিন চাচা বলেন, "স্যার, কী কন। আঁর উরপে ছাড়ি দেন।"

আমি আব্বাকে দেখলাম নিশ্চিন্ত হতে।

রোগীদের আসা শুরু হলে আমিন চাচা ছেলেকে সাথে নিয়ে বের হয়ে যান। যাওয়ার সময় আমিন চাচা আব্বাকে বলেন করিম চাচার ব্যাপারে কোনও চিন্তা না করতে। আম্মাকে কাজে রেখে আমি আর আব্বা

বাসায় ফিরি। আব্বা জুমার নামাজের জন্য তৈরি হতে গোসলখানায় ঢোকে। আমার কানের লতিতে আগুনের তাপ আর নাই। অথচ করিম চাচার বাড়িতে তখন মনে হয়েছিল, বাসায় ফিরে আমার দুই কানের উপর বরফ না ঘষলে আমার কান দুটি ঠাণ্ডা হবে না। আমার তখন কান ভাল হয়ে গেছে। আমি রাশেদের জন্য দুধভাত মাখতে যাই। ঘুরে ফিরে তিন জন পুরুষ আর দুই জন মহিলা বাসায় কাজ করে। কিন্তু রাশেদের জন্য দুধভাত মাখি শুধু আমরা দুজন: আমি আর মা। আর এক জন অবশ্য মাখেন। তিনি আমাদের মায়া খালা। তখন মায়া খালা থাকেন ঢাকাতে।

মা বোনের হাতে দুধ ভাত খাওয়া রাশেদকে কোন ওসিডি সর্বনাশ করেছে তা আমি জানি না। তবে সব সময় সন্দেহ করি। আমি হামিদের ওসিডি দেখেছি। আমাদের চেয়ারম্যান স্যারও একই ওসিডিতে আক্রান্ত। কিন্তু কেন? কোনও দিন সময় পেলে হয়তো তা ভাবব। আমার চৌহদ্দিতে হামিদের ভূতের কোনও উপস্থিতি এখন আর নাই। হামিদের জন্য আমার মায়া হয়। বেচারা বেঁচে থাকলে কত দুধভাত খেতে পারত। রাশেদ যেমন খেয়ে চলেছে। চেয়ারম্যান স্যার যেমন খেয়ে চলেছেন। করিম চাচাও অনেক দুধভাত খেয়েছেন মর্যাদাহীন মৃত্যুর কাছে পরাজিত হওয়া পর্যন্ত। সবচেয়ে বেশি দুধভাত খেয়েছেন বাহার চাচা। দুধভাত তাঁদের ওসিডির আর এক নাম।

তেরো

আমার দাদা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। চট্টগ্রাম থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন। করিম চাচা আর আব্বা দুজনেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র ছিলেন। সাঁতার না জানা আব্বা পতেঙ্গাতে সাগরের জলে ভেসে যাচ্ছিলেন। করিম চাচা আব্বাকে টেনে কূলে আনেন। যে জীবন এক সেকেন্ড পরে চলে যেত সে জীবন করিম চাচা আব্বাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। করিম চাচাকে আব্বা উপেক্ষা করতে পারত না। করিম চাচা মেধাবী মানুষ ছিলেন। যদিও দুধভাত ছাড়া আর কোনও কাজে তাঁর মেধা তিনি ব্যয় করেননি। আমরা ফেনী ছাড়ার পরও করিম চাচা আমাদের বাড়িতে আসতেন। এমনকি অনেক সময় তিনশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েও এসেছেন। প্রথম স্ত্রী চলে যাবার পর করিম চাচা আরও চৌদ্দো কি পনেরোটা বিয়ে করেছেন। তবে তিনি আর কখনও কোনও বড়লোকের ঘরে পা মাড়াননি। গ্রাম থেকে বেছে বেছে তিনি সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করে আনতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা চিকন ছিল করিম চাচা তাঁদের মধু আর মাখন খাওয়াতেন। বিছানায় করিম চাচার পছন্দ ছিল মোটা উরু আর ছুটন্ত অশ্বারোহীর মতো ঝম্পমান শরীর। করিম চাচা ঘি, মধু, মাখন খাইয়ে তিনি তাঁর পছন্দের মতো করে স্ত্রীগুলির দেহ গঠন করতেন। তদুপরি তিনি ওই সব স্ত্রীর ভাইদের বিদেশ পাঠাতেন, বোনদের বিয়ের খরচ দিতেন। বোনের স্বামীদের চাকরি দিতেন। ওদের কেউ কাউকে তালাক দিতে চাইলে তা যাতে সহজে তারা করতে পারে, তিনি তার ব্যবস্থা করতেন। তিনি তাঁর স্ত্রীদের পরিবারগুলোর আরও অনেক উপকার করতেন। কিন্তু তিনি ওই স্ত্রীগুলোর কাউকে চার-পাঁচ বছরের বেশি রাখতেন না। শেষ পর্যন্ত চাচার জীবনে চারজন তরুণী স্ত্রী স্থায়ী হন।

জীবনের শেষের দিকে এসে করিম চাচা ঝামেলায় পড়েন। যে পদ্ধতিতে তিনি স্ত্রীগুলিকে নিঃসন্তান রাখতেন, তা নিয়ে নতুন চার স্ত্রীর মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হতে থাকে। তাঁরা এক জোট হয়ে সিদ্ধান্ত নেন অন্তত তাঁদের এক জনকে সন্তান জন্ম দান করতে হবে। স্ত্রীগুলি এক জোট হয়ে এক জন আর এক জনকে বোন বলে সম্বোধন করেন, বলেন যে কোনও এক জনের একটা পুত্র সন্তান হলেই চলবে, তাঁরা সবাই সেই সন্তানের মা হবেন। তখন, বিশ বছর বিরতির পর, করিম চাচার পিঠে আবার দু-এক ঘা পড়তে থাকে। এবার আর ধজির নয়, শলার ঝাড়ুর বাড়ি। ওই স্ত্রীগুলি সাতকানিয়া, মহেশখালি, রাঙ্গুনিয়া ইত্যাদি এলাকার শক্তপোক্ত শলার ঝাড়ু ব্যবহার করে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁরা সবাই গ্রাম থেকে শলার ঝাড়ু আনিয়ে রাখতেন। বিবাদ শুরু

হওয়ার পর করিম চাচার বাড়িতে শলার আমদানি ও ব্যবহার দুটোই বেড়ে যায়। অবসর জীবনে এসে করিম চাচা আগের মতো সহজে আর তালাক দিতে পারছিলেন না। আর সরকারের নারী ক্ষমতায়নের কর্মসূচীর বদৌলতে পরের দিকের স্ত্রীগুলোর কেউ কেউ বিএ, কেউ বা এমএ পাশ ছিলেন। এই স্ত্রীগুলোর কারও পরিবারকে করিম চাচা ভয় পেতেন না, ভয় পেতেন শুধু স্ত্রীগুলিকে। তাঁদের হইচই আর চেঁচামেচিকে তিনি ভয় পেতেন। স্ত্রীগুলো ব্যাপারটা বুঝে যান। করিম চাচাকে পেটানোর পাশাপাশি তাঁরা চেঁচানো শুরু করেন, যেন ঝাড়ুর বাড়ি করিম চাচার পিঠে নয়, তাঁদের পিঠে পড়ছে। শুনেছি তাঁরা করিম চাচার চারিদিকে জড়ো হয়ে নাকি একবার করিম চাচার কানের কাছে আর একবার জানালার দিকে ফিরে চেঁচাতেন। করিম চাচা চাইতেন দরকার হলে তাঁর স্ত্রীরা চেঁচিয়ে তাঁর কান ফাটিয়ে দিক, তারপরও তাঁদের চেঁচানোর কোনও আওয়াজ যেন জানালার বাইরে না যায়। যখন তাঁরা বুঝলেন করিম চাচার কানের ধৈর্য অসীম তখন তাঁরা তাঁর কান ত্যাগ করে সব চেঁচামেচি জানালার বাইরে পাঠিয়ে দিতেন।

লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য করিম চাচা শান্তিনগরে তাঁর সাড়ে তিন হাজার বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে সাভারে পাট ক্ষেতের মধ্যে একটা নিরিবিলি বাড়ি তড়িঘড়ি করে বানিয়ে ওটাতে উঠে যান। আগে দাম্পত্য গণ্ডগোলের শব্দ শুনে আসত আসেপাশের বাসার মানুষরা, যাঁরা এক সময় ককটেল ফুটার আওয়াজ শুনলেই ভয়ে কেঁপে উঠত। এখন পাটক্ষেত দ্বারা ঘেরা বাড়িতে আসে চাষীরা, মেম্বাররা, চেয়ারম্যানরা, আর অনেক গুণ্ডাপাণ্ডা, যারা এক সময় ককটেল ফুটাত। করিম চাচার অবস্থা শোচনীয় হয়। আব্বা মরে যাওয়ার পর করিম চাচাকে সাহায্য করার আর কেউ রইল না। এক জন তাঁকে সাহায্য করতে পারতেন, তিনি হলেন আমিন চৌধুরী, আমার প্রয়াত স্বামী হামিদের বাবা। আমি হামিদকে খুন করার পর করিম চাচার পক্ষে আর আমিন চৌধুরীর নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না। তারপরও শেষ সময়ে করিম চাচা তিন জন স্ত্রীকে তালাক দিতে সমর্থ হন। এক জনকে রাখেন এই শর্তে যে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ওই স্ত্রী তাঁর সেবা করবেন। আর চাচার মবিল চেঞ্জ করবেন। চাচা নিজেকে গাড়ির সাথে তুলনা করতেন। মবিল চেঞ্জ না করলে গাড়ি যেমন অচল হয়ে যায়, চাচার বিশ্বাস ছিল তাঁর মবিল চেঞ্জ না করতে পারলে তিনিও অচল হয়ে যাবেন। নিঃসন্তান থাকার শর্তে চাচা ওই মেয়েটাকে তাঁর যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সব সম্পত্তি লিখে দেন।

করিম চাচার মৃত্যু আসতে দেরি হচ্ছিল বলে সেই স্ত্রী অস্থিরতা দেখাতে শুরু করেন। একদিন করিম চাচার মরদেহ বাড়ির পাশের বিল থেকে উদ্ধার করা হয়। মামলা কোর্টকাচারি ইত্যাদি হয় আর ওই সময় সেই স্ত্রী কিছু দিন জেল খাটেন। তবে চূড়ান্তভাবে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ছাড়া পান। শুনেছি সেই স্ত্রী নাকি এখন করিম চাচার শান্তিনগরের ফ্ল্যাটে উঠেছেন। সাভারের এক চেয়ারম্যানকে বিয়ে করেছেন, যিনি প্রেমের প্রভাবে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁদের একটা ছেলেও হয়েছে। ঢাকা শহরে যেই দিন যে রেস্তোরাঁর উদ্বোধন হয়, ওই দম্পতি সেই দিন সেই রেস্তোরাঁয় খানা খান।

আব্বার সাথে বাহার চাচার কোনও আন্তরিকতা ছিল না। আর বাহার চাচার ভাগ্য করিম চাচার চেয়ে খারাপ ছিল। তাঁর বিয়ের ঘটনা করিম চাচার অনুরূপ, মার খাওয়ার ঘটনাও অনুরূপ। করিম চাচা ধর্মের কোনও বিধানই মানতেন না। আর বাহার চাচা ঘুষ খাওয়া ছাড়া ধর্মের অন্য অনুশাসনগুলি মেনে চলতেন। বাহার চাচা কখনও জন্মনিরোধের ব্যবস্থা করেননি। মৃত্যুর সময় বাহার চাচা নিশ্চয়ই এর জন্য অনুশোচনা করেছিলেন। বছর দুয়েক আগে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাহার চাচার তেত্রিশ সন্তান-সন্ততি একদিন তাঁর মগবাজারের বাড়িতে এসে হাজির হয়। তারা পিতার চুল ছিঁড়ে, দাঁড়ি টানে, টাকের উপর আঘাত করে, পিঠে ঘুসি দেয়, পাছায় লাথি মারে। তারা তাঁকে মারতে মারতে কয়েকটা দাঁত উপড়ে ফেলে আর তাঁর দুই হাঁটু জখম করে। মাস দুয়েক পরে বমি করতে করতে বাহার চাচা মরে শয়নকক্ষে পড়ে থাকেন। আমি খবরের কাগজে বিষয়টা দেখার পর খোঁজ নিই।

আমি অবশ্য প্রথমে তেত্রিশ নম্বরটাকে অতিরঞ্জণ মনে করেছিলাম। পরে শুনলাম মরহুম বাহার চাচার সন্তানের সংখ্যা আরও বেশি ছিল। বদলির চাকরি করার সুবাদে বাহার চাচা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাঁর বীজ বুনে গেছেন। ছোট দেশ, অল্প জায়গা, মানুষ বেশি, নারী বেশি, উর্বরতা আরও বেশি। পৃথিবীর তাবৎ প্রাণি তাদের উত্তরাধিকার থেকে শান্তি আর নিরাপত্তা পায়। বাহার চাচা তাঁর বংশধরদের ভয়ে জীবনের শেষ দশ বছর নাকি ঘুমাতেই পারেননি।

তারপর আরও অনেক দাম্পত্যের বিপর্যয় আমি দেখেছি। কিন্তু এর সুরাহা কিসে কেউ বলতে পারে না। এক মাত্র আমাদের চেয়ারম্যান স্যার ছাড়া। চেয়ারম্যান স্যারের কথা হল দাম্পত্যকে বেআইনি ঘোষণা করে তা ফৌজদারি অপরাধের অন্তর্ভুক্ত করা হল এই বিপর্যয় ঠেকানোর এক মাত্র উপায়। স্যার জ্ঞানী মানুষ। তাঁকে বিশ্বাস করার কারণ আছে। কিন্তু আমরা জানি স্যারের কথা শুনলে পৃথিবীতে কেয়ামত নেমে আসবে। আর আমরা আমাদের পবিত্র বিশ্বাস কখনও ত্যাগ করব না। স্যার এত খারাপ মানুষ। তিনি বলেন, দাম্পত্যকে ব্যভিচার দিয়ে প্রতিস্থাপন করো, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। আমি আল্লাহ্‌র হাতে স্যারের বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে নিজেকে পাপমুক্ত রাখি।

চৌদ্দ

আমার মন যতটা দূর অতীতে ঘুরে এল, ধারণা করি, হামিদের ভূতও ততটা দূর অতীতে চলে গেছে। এতই দূরে যে, মনে হয়, সে এখানে আসেইনি। সে আমাকে ঠেলে ঠেলে এই বাথরুমে ঢুকায়নি। সে হাসাহাসি করেনি। তার সাথে আমার কোনও বাদানুবাদ হয়নি। এখন আমার আশে পাশে কোনও ভূতের অস্তিত্ব নাই। অস্তিত্ব আছে এক আয়নার। আমার সামনে। কলের নলের উপর দেয়ালে লাগানো সোনালি রঙের অষ্টভুজ ফ্রেমে বাঁধানো মুরানো দ্বীপপুঞ্জের আদি-কারিগরদের তৈরি ভেনিশিয়ান কাচ।

আমি আর পাগল মুরানোর একত্রিশটা দোকান আর আটটা কাচের কারখানা ঘুরে এই আয়না কিনেছিলাম। এই বাড়িতে সকল ধাতব জিনিসে কিছু না কিছু মরিচা পড়ে গেছে। এই আয়না এখনও অনাক্রান্ত আছে। পাগল সোনিয়াকে শিখিয়েছে কী করে এটাকে মুছতে হয়। এটাতে যাতে কোনওভাবেই পানি না লাগে পাগল সোনিয়াকে সে খেয়াল রাখতে বলেছে। আর যদি এটাতে পানির ছিটা পড়ে, সোনিয়া যেন সাথে সাথে সূতি কাপড়ের রুমাল দিয়ে ওটা মুছে শুকিয়ে ফেলে। সোনিয়া এ কাজে কোনও ভুল করে না। দিনে দশ বার সে আয়নাটা পরীক্ষা করে। পানির দাগ না থাকলেও সে ওটাকে সূতি কাপড়ের রুমাল দিয়ে মোছে। আর সেই সুযোগে সোনিয়া নিজের চেহারাটাও দেখে নেয়। সোনিয়া বার বার আয়নায় নিজেকে দেখতে ভালবাসে।

আমি মুখ ধুই। আমার চোখ পড়ে আমার তর্জনিদ্বয়ের উপর। দেখি কমনীয় সরু আঙ্গুলের মাথা। আয়নায় মুখ দেখি। নারীর মুখ, যা বুকের ওজন, পেটের নির্ভারতা, কটিদেশের ফ্লোরা এন্ড ফাওনা অনুভব করতে সক্ষম। আমার ত্বকে ঘামের ইঙ্গিত। আমার গরম লাগছে।

পেট্রোলিয়াম জেলি ছাড়া আমি মুখে কিছু মাখি না। তারপরও মা-নানি থেকে পাওয়া ত্বকের রংটা একই রয়ে গেল। ধর্মে, মর্মে সবখানে এই রঙের সুনাম। চাহিদা। কে মানুষকে শেখাল কোন রং নাড়িতে টান দেয়, কোন রং বিবমিসা ডেকে আনে? এত রঙে রঙিন প্রকৃতি। এত ধনে ধনী। এত প্রাণের বৈচিত্র্য। অভাব শুধু ন্যায়বিচারের।

ভূততো গেছেই। এখন আমার চোখে আর পাপের সীসাও নাই। তারা এখন নিখাদ মানবিক নির্যাসের দর্পণ। আমার মণি দুটির ভেতর মায়ার দ্যুতি। দেখি আমার মানানসই খাড়া নাকের আকর্ষণ। সকলে আমার প্রলম্বিত চিবুকের প্রশংসা করে। আমাদের চেয়ারম্যান স্যার বলেন আমার চিবুক তাঁর কাছে বিধ্বংসী এক তীর, এক অদৃশ্য চুম্বক। আমার চিবুক নাকি স্যারকে নাকে রশি বাঁধা উটের মতো ঘোরাচ্ছে। তা-ও নাকি সতেরো বছর ধরে। যে দিন প্রথম আমি তাঁর ক্লাশে যাই, সে দিন থেকে। তারপর তিনি নাকি পনেরো বছর অপেক্ষা করেছিলেন, আমাকে কথাটা জানানোর জন্য। স্যার একটা বিরক্তিকর শব্দ ব্যবহার করেছেন। যে শব্দ সবাই ব্যবহার করে। রুচির দুর্ভিক্ষে। যা এখন আমার মুখে আসছে না। এমন চিবুক নাকি স্যার আর একজনের মধ্যে দেখেছেন। তিনি হলেন ভার্জিনিয়া উল্ফ। মিসেস ডালওয়ে নামক এক উপন্যাসের লেখিকা। স্যার আমাকে এও বলেছেন, বর্তমানে টেলিভিশন আর সিনেমার পর্দায় যত নারী চিবুক দেখা যায় তার সবগুলোই নাকি এ রকম। তবে সেগুলি নকল। আর্টিফিশিয়াল ম্যাটেরিয়্যাল। কোনওটা ছয় মাস থাকে, কোনওটা পাঁচ বছর। নির্ভর করে কে কত খরচ করে আর কোন শল্যবিদ দিয়ে তা নির্মাণ করে তার উপর। মেয়াদ চলে গেলে নাকি আবার নতুন চিবুক লাগাতে হয়। আর আল্লাহ আমাকে তা অসীম দয়ায় এমনি-এমনি দিয়েছেন। চেয়ারম্যান স্যার নাকি শুধু এমন চিবুক দেখার জন্য এক সময় দিনে সাত-আট ঘন্টা বোম্বাই নায়িকাদের নাচ দেখতেন। টিভিতে নায়িকাদের নাচ। মগজে ডোপামিনের উৎপাদন। আহা, স্যার বলেন। আমি বিশ্বাস করি স্যার বোম্বাই নাচ দেখে জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় কাটিয়েছেন। তাতে শুধু নাচ কেন, আরও অনেক কিছু দেখা যায়। সচল বাঁক, উন্মুক্ত রান, খোলা বাহু, রং করা চোখ, পলিস্টার সূতার অক্ষিপক্ষ্ম, বদলানো চেহারা, সবই এক সাথে দেখা যায়। ডোপামিন, আহা।

কেউ শুধু চিবুক দেখার জন্য বোম্বাই নাচ দেখতে বসে না। স্যার চিবুকের কথাটা আমাকে খুশি করার জন্য যোগ করেছেন। স্যার বলেছেন, তিনি যখন জানলেন ওই চিবুকগুলো আর্টিফিশিয়াল, তখন থেকে বোম্বাই নাচ দেখা ছেড়ে দিয়ে তিনি আবার ভার্জিনিয়া উল্ফে ফিরে গেছেন। আমার ধারণা স্যার কোনও সুনির্দিষ্ট নায়িকার কাছে ফিরে গেছেন। স্যার চমক দিতে পছন্দ করেন। আর সেই জন্য হয়তো তিনি ভার্জিনিয়া উল্ফকে আবিষ্কার করেছেন। স্যার বলেছেন, "তুমি বিশ্বাস কোরছ না? শোনো। আমার কাছে ভার্জিনিয়া উলফের সাতাশটা ফটো আছে। আরও কিছু ফটো আমি পেয়েছিলাম, তবে ওগুলি ঝাপসা ছিল।" স্যার দুঃখ করেন কেন উল্ফ বেঁচে থাকতে ডিজিটাল যুগ আসল না। তা হলে তিনি উল্ফের হাজার হাজার ফটো সংগ্রহ করতে পারতেন। "তবে শিশিরকণা, তোমার চিবুক দেখে আমার সেই অনুশোচনা ঘুচে গেছে," স্যার বলেছেন।

স্যারের কথা সত্য হলে ভাল। আমার চিবুকতো আর ফটোতে দেখতে হয় না। উন্মুক্ত লাইভ চিবুক। এক মিনিট দেখলে স্যারের নাকি পঞ্চাশ হাজার ফটো দেখার সাধ মেটে। আমার চিবুক তাঁর নাকে দড়ি লাগিয়েছে। সেই ছিদ্রে, যেই ছিদ্রে মেয়েরা, এবং অনেক দেশে ছেলেরাও, লটকন পরে। আমি লটকন, নাকফুল কিছুই পরি না। আমার নাকে নাকফুল পরার একটা ছিদ্র করা হয়েছিল। তা এখনও আছে। হামিদকে খুন করার পর আর কখনও নাকফুল পরিনি। যেই জায়গায়টায় লটকন লাগানোর ছিদ্র করা যায়, স্যারের নাকের সেই জায়গাটা সুপরিসর। স্যার নিজে আমাকে দেখিয়েছেন। আর বলেছেন, "তুমি দেখতে পাচ্ছো না, কিন্তু এখান থেকে একটা দড়ি ঝুলছে। আর সেই দড়ির মাথা বাঁধা রয়েছে তোমার চিবুকের সাথে। এখন বলো আমি কী করি? তবে আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আর কখনও অন্য কোনও চিবুকের দিকে আমি আর তাকাব না। তোমার চিবুকে হাত রেখে আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। আল্লাহর কসম, শিশিরকণা।"

স্যার এর পর আরও পঞ্চাশ কি বায়ান্নটা জিনিসের কসম খেয়েছেন শুধু আমার চিবুকের উপর। বারবার কসম খায় মিথ্যাবাদিরা, আমি পবিত্র কোরান থেকে আয়াত উদ্ধৃত করে স্যারকে স্মরণ করিয়ে দিই। স্যার তাঁর জিভে কামড় দেন।

স্যারের দাবি, এবং আমি তা বিশ্বাস করি, স্যার নারীর সৌন্দর্যের সমঝদার। স্যার বলেন আমার দুই গালে এখনও কিশোরীর আভা। আমার শরীর নাকি রানীদের মতো টাটকা। উদয়পুরের রানী। জর্দানের রানী। স্পেনের রানী। হল্যান্ডের রাজকুমারী। প্রিন্সেস অফ ওয়েলস। ডাচেস অফ সাসেক্স। প্রিন্সেস অফ আস্তুরিয়াস। প্রিন্সেস অফ অরেঞ্জ। রাজকুমারী সুরাইয়্যা। স্যার এঁদের কথা বলেন। রুদফোর্ডের রাজকুমারী ওফেলিয়া রুদফোর্ডের প্রধান হাসপাতালে নার্স হিসাবে যোগদান করেছেন সিফিলিস রোগীদের সেবা করতে। মেলোমোলিয়ান জলদস্যুদের বন্দিশালা থেকে সিফিলিস নিয়ে পালানো এক সাইরেনকে রুদফোর্ড রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। আর ছয় মাসের মাথায় ছোট দেশ রুদফোর্ডে সিফিলিস রোগীর সংখ্য এক লাখ ছাড়িয়ে যায়। এদের মধ্যে যাঁরা পাগল হয়ে যান, রাজকুমারী ওফেলিয়া নিজেকে তাঁদের সেবায় নিয়োজিত করেন। স্যার রাজকুমারী ওফেলিয়ার একটা আকাশী-নীল রঙের অ্যাপ্রন পরা ছবি দেখিয়ে কয়েকদিন আগে আমাকে বলেছিলেন, তুমি এমন একটা অ্যাপ্রন পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখো। দেখবে তুমি এই রাজকুমারীর চেয়ে কত বেশি সুন্দর।

আমি রানী বা রাজকুমারীদের জৌলুসপূর্ণ জীবনের সাথে নিজেকে মেলাতে পারি না। তবে তাদের দুঃখের সাথে আমি নিজেকে সনাক্ত করতে পারি। এই জগতের কোন রানী সুখশয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে? যাদের গল্প পড়েছি তাদের কাউকে জীবনের শেষ বিশ-ত্রিশ বছর কোনও পুরুষ স্পর্শই করেনি। কেউ কেউ দশ বছর গোসল করেনি। তাদের শরীরের চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে ছত্রাক বাসা বেঁধেছে, চামড়ার উপর শত শত তিল গজিয়েছে। কারও কারও আঁচিল পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়েছে। অনেকে আঁচিলের দৈর্ঘে সান্ত্বনা খুঁজেছে। অনেকে ঠ্যাঙানি খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছে। রানী হওয়ার যদি এত কষ্ট, প্রজা শ্রেণির নারী হওয়ার কষ্ট তাহলে কত? আর রাজা হওয়াই কি অনেক আনন্দের? খুনখারাবি না করে কোন রাজা কবে ধরাধাম ত্যাগ করেছে? সবচেয়ে বড় করুণার বিষয় হল সব রাজাই অসচেতনতা নিয়ে মরে, মানে শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাওয়ার আগে আতঙ্কে বেহুঁশ হয়ে যায়। বুদ্ধিমান মানুষ কখনও রাজা-রানী হতে চায় না।

ওজন বাড়েনি বলে আমার দুই গাল এখনও কোমল আছে। চর্বি এসে ভর করলে তা আর থাকবে না। টাইট মনে হবে। আমার পা দু'টি অনেক লম্বা। আমি জানি রাস্তার ধারে ধারে তারা প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে। চেয়ারম্যান স্যারকে তারা খাড়া রাখে। যে সব সুন্দরী মেয়ে অল্প বয়সে সৌন্দর্যের সফল ব্যবহারের একটা পরিকল্পনা করে ফেলে, আমি তাদের সাধুবাদ জানাই। তবে এমন কয়েকজনের কথা আমার জানা আছে। ওদের কে কোথায় গিয়ে শেষ আস্তানা গেড়েছে, তা-ও আমি জানি। আর তানিয়ার স্বরূপতো আজকেই দেখলাম। সকাল থেকে বারাঙ্গনাটা আমার মগজে সাঁতার কেটে চলেছে।

বাথরুমের দরজায় টোকা পড়ে। আমি সোনিয়ার গলার আওয়াজ শুনি। "খালাম্মা! আইন্নে কুনু ?"

"আমি এখানে।"

আমি এমনভাবে সোনিয়ার সাথে কথা বলি যেন কিছুই হয়নি। যেন আমি দোজখ আর বেহেশত ঘুরে আসিনি।

"খালাম্মা?" বাথরুমের দরজার আড়াল থেকে সোনিয়া ডাকে। "ছাদো যাইতাইন না?"

"ছাদে কী?"

“আপনে কি হাতকালা ? কানে কি কিছু হুনুইন না?”

আমি শুনছি। আতশবাজির শব্দ।

বাথরুম থেকে বের হয়ে আমি আরও কিছু আতশবাজির শব্দ শুনি। মনে হয়, আহা, যদি তানিয়াকে আতশবাজির মতো উড়িয়ে দেয়া যেত।

বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখি আমার বিছানার বেহাল দশা। আমি সোনিয়াকে বলি, “তাড়াতাড়ি কর্।” আমি আমার বিছানার চাদরের এক কোনা ধরি। সোনিয়া আর এক কোনা ধরে। দুজনে মিলে আমরা আমার ঘর ঘুছাই। ঘর ঘোছানোর আগে আমি ঘর থেকে বের হতে পারি না।

আমি দরজা খুলে বারান্দায় আসি। ত্রিকোণাকার ছোট একটা বারান্দা। এখানে ধূলার আধিপত্য। এত বড় বাসা। পরিষ্কার করা অনেক ধকলের ব্যাপার। সোনিয়ার একার পক্ষে তো আর তা সম্ভব নয়। আমি মাঝে মাঝে হাত লাগাই। সব সময় লাগাই না। বাড়ির অনেক জায়গায় ধূলার আধিপত্য আমি মেনে নিয়েছি। কিছু জায়গা পাগলের জন্য পরিষ্কার রাখতে হয়।

বারান্দায় আমার সাথে সোনিয়া। নিচে রাস্তায় রিক্সার টুংটাং শব্দ। পথচারীও আছে। রাস্তাটাতে আলো আছে, তবে অপর্যাপ্ত। আমি উপরের দিকে তাকাই। আকাশে লাল-নীল আলো দেখি। এটা ভাল। ঢাকা শহরে এখন আতশবাজি ফোটে। এক সময় সারা দেশে ককটেল আর পাইপগানের শব্দের দৌরাত্ম্য ছিল। মানুষ ভয়ে কাঁপত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ইত্যাদি জায়গায় ক্যাডাররা প্রতি রাতে বন্দুকযুদ্ধ করত। তাদের গোলাগুলির আওয়াজে আশপাশের মানুষ ঘুমাতে পারত না। শহরবাসিরা কোনও দিন সকালে খবরের কাগজে পড়ত অমুক হলের পানির টাংকিতে দুইটা লাশ পাওয়া গেছে, কোনও দিন পড়ত তমুক হলের পুকুর পাড় থেকে পুলিশ তিনটা লাশ উদ্ধার করেছে। তখন আমি ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এখন শিক্ষক। এখন এই শহরে এমনকি টেম্পুর সংখ্যাও অনেক কমে গেছে।

বাইরের সংঘর্ষ কমেছে। আর আমাদের মধ্যে ঘর্ষণের ওসিডি বিস্তার লাভ করেছে। ব্যাপারটার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা না দিয়ে এটাকে নেশা বলাটা অন্যায্য। চাইলে ভাতকেও নেশার দ্রব্যে পরিণত করা সম্ভব, সম্ভব ভাতের একটা বড় কালোবাজার তৈরি করা। নিয়ম করা হোক এক প্লেট ভাত খেতে হলে পঁচিশ বার অজু করতে হবে। তখন মানুষ অজু না করে ভাত খাওয়ার সুযোগ খুঁজবে। তখন দেখা যাবে ভাতের কালোবাজারের জিডিপি রাষ্ট্রের মোট জিডিপির বিশ শতাংশ হয়ে গেছে। ঘর্ষণ যেহেতু অবৈধ, তাই তা নেশারূপে আবির্ভূত হয়েছে। আর শূন্যস্থান পূরণের জন্য ব্যাপক বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশেষ বাজারে, কিংবা কালোবাজারে, পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ দুই-ই বেড়েছে। তাতে শান্তি যদিও আসেনি। বরং মানুষের বাসনা আর সমাজের বিশ্বাসের মধ্যে ফারাক থাকায় এই চাহিদা বিপর্যয় ঘটিয়ে চলেছে। তাই প্রায়ই মেয়েদের সিলিং ফ্যানের ডান্ডা থেকে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। অবশ্য দরজা ভেঙ্গে ঘরের ভেতর ঢোকার পর। এ মেয়েগুলোকে সবাই এতটাই চোখে চোখে রাখে যে কারও লাশ গলার আগেই তার খবর চলে আসে পত্রিকায়। কদাচিত দুই একটা ছেলেও এই হোটেলে, সেই সুঁড়িখানায় মরে পড়ে থাকে। যদিও ওদের লাশের দিকে পিতামাতা ছাড়া আর কেউ তাকায় না। পৃথিবীর অনেক শহরেই ঘর্ষণের জন্য লোকলজ্জায় কাউকে আত্মহত্যা করতে হয় না। জানি না, কোন শহরের প্রশংসা করব: নিজ শহরের, না দূরদূরান্তের ওই শহরগুলোর?

আতশবাজির শব্দে আমার ধ্যান ভাঙ্গে। বোধ হয় আমাদের দুই ব্লক পরের কোনও একটা বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। কনেকে বরের বাড়ি নেয়া হবে। তার আগে আকাশে শব্দ আর আলো ছুঁড়ে পৃথিবীকে

জানানো। ধরনী তৈরি হও। রোমাঞ্চ ঘটতে চলেছে, রোমাঞ্চ। কৌমার্য বিসর্জনের রোমাঞ্চ। মহাবিশ্ব তন্ময় হয়ে একটা সতীচ্ছদ খোঁজে। এক ফোঁটা রক্ত না ঝরলে কেয়ামত হয়ে যাবে। ছেলেটা কী ভাবছে, তা আমি জানি। মেয়েটা কী ভাবছে, তা আমরা কেউ জানি না। ওদের জন্য শুভ কামনা। ওরা সুখী হোক। সবার উপর সত্য হল দাম্পত্যের উপর সমাজের বিশ্বাস অটুট রয়েছে। দাম্পত্যের বিপর্যয়ের মহামারি এই আস্থায় কোনও চিড় ধরাতে পারেনি।

“খালাম্মা, দেরি অইতাছে,” সোনিয়া বলে।

সোনিয়ার মায়াভরা চোখে ব্যগ্রতা। আমি সোনিয়াকে বুঝি। আতশবাজির শব্দে মন চঞ্চল হয় না এমন তরুণী কে আছে?

পনেরো

কোনও দয়ালু জমিদার তার দাসীর ঘরে জন্ম নেয়া সন্তানকে যে চোখে দেখে, যতটুকু ভালবাসে, সোনিয়াকে আমি সে চোখে দেখি, ততটুকু ভালবাসি। তবে সোনিয়ার জন্য আমার ভালবাসাকে আপনার প্রশংসা না করে উপায় নাই। সোনিয়া আমার ঘরে ঘুমায়। তবে এক বিছানায় অবশ্যই নয়। আবার মেঝেতেও নয়। আমি যে কাপড়ের জামা পরি সোনিয়াও সে কাপড়ের জামা পরে। আমি যে খানা খাই সোনিয়া সেই খানা খায়। তবে সোনিয়ার বাথরুম আমার ঘর থেকে একশ মিটার দূরে। সোনিয়া রাতে দুই বার করে বাথরুমে যায়। দরজা খোলার একটা কট্ শব্দ করে। আর এতে করে রাতে আমার চার বার ঘুম ভাঙ্গে। তবু আমি সোনিয়াকে আমার ঘরে রাখি। আমি মনে করি আমি সোনিয়ার জন্য অনেক করেছি।

এক সময় আমাদের আশরাফ শ্রেণির জীবন কাজের লোক ছাড়া অচল ছিল। তখন আমাদের বাসায় এক ঝাঁক চাকর-চাকরানি ছিল। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। চাকর-চাকরানি সবাই বাইরে চলে গেছে। এখন তারা গার্মেন্টসের কারখানায় সেলাইয়ের কাজ করে। সেলাইয়ের কাজ দিয়ে জীবন শুরু করে এদেরই অনেকে আবার কারখানার মালিকও হয়। তারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে আর পারে উড়োজাহাজে চড়ে বিদেশ ভ্রমণ করতে। এখন বাসাবাড়িতে কাজের লোক দুর্লভ। অবশ্য ধনীদের কথা বাদ। আমি যখন হামিদের বাড়িতে ঢুকি তখন তাদের চাকরচাকরানির সংখ্যা ছিল নয়। আমি যখন সেখান থেকে বের হই তখন সেই সংখ্যা ছিল বারো। আমি বলছি আমাদের মধ্যবিত্ত আশরাফ শ্রেণির কথা। যারা কাজের লোক আর তেমন খুঁজে পায় না। তবে আমি আর পাগল এ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যের অধিকারিনী। আমাদের আছে সোনিয়া, যাকে আমরা মায়া খালার মাধ্যমে পেয়েছি।

সোনিয়া আমার প্রিয় মানুষ হলেও সোনিয়ার নামটা আমার প্রিয় নয়। হিন্দি সিনেমাগুলিতে এ নাম অনেক বার শুনেছি। ওরা চুম্বকের মতো আকর্ষণীয় ছবি বানায়। আর নায়িকাদের নাম রাখে সোনিয়া, সানজানা, কবিতা, প্রিয়া, পিয়া, মালা, লিলা, খেলা। অবশ্য অনেক রাশিয়ান মেয়ের নামও সোনিয়া। সোনিয়া বুঝি একটা আন্তর্জাতিক নাম। নিউইয়র্কেও আছে। ময়মনসিংহেও আছে।

সোনিয়ার কালো মুখের উপর সাদা পাউডার ধূসর মসৃণ আবরণ তৈরি করেছে। কোনও পেশাদার মেকআপম্যান ছাড়া মুখের উপর প্রসাধনের এমন প্রলেপ তৈরি করা সম্ভব নয়। এমন কাজ শুধু নিজের জন্য করা সম্ভব। আমার গালে এমন করে সোনিয়া কখনও পাউডার লাগিয়ে দিতে পারবে না। শত চেষ্টা করলেও না। যে যত্ন নিয়ে সোনিয়া নিজের গালে পাউডার লাগায় সে যত্ন সে আমার ক্ষেত্রে করতে পারবে না, এটাই স্বাভাবিক।

সোনিয়া আমার জীবনের এক সিসিফাস। ও কত সুখী তা ওর চুল দেখেও বোঝা যায়। চুল শক্ত করার মেশিন ছাড়াই ও শুধু চিরুনি দিয়ে দিনের পর দিন ভেজা চুল টেনে টেনে তা সোজা করেছে। আর সেই চুল ওর ঘাড়ের উপর খাড়া হয়ে আছে। সোনিয়ার মাথায় অনেক চুল। এই চুলে বেনী করলে ওকে অনেক ভাল দেখাত। সোনিয়া তা করবে না। কারণ ও চায় ওর চুলের বাদামি আভা চারিদিকে ছড়িয়ে যাক। বাদামি আভাটা অবশ্য আমার কাছে ওর ছোটবেলার অপুষ্টির লক্ষণ বলে মনে হয়। তবে আমি এটাও জানি এই ঢাকা শহরের কত মহিলা চুল বাদামি করার জন্য কত বিউটি পার্লার চষে বেড়ায়।

সোনিয়ার হাসিটা এখন অনেক সুন্দর আর ছিনাল হয়েছে। দুই বছর আগে যখন ও আমাদের কাছে আসে তখন ভোতা রঙের কারণে ওর দাঁতগুলি চোখে পড়ত না। এখন সোনিয়া হাসলে ওর সুন্দর বড় বড় দাঁত দেখা যায়। সোনিয়া টিভি দেখে সাজগোজ শিখেছে। দিনে ও আটটা নাটক দেখে। নয়তো তিনটা সিনেমা। ইউটিউব সোনিয়ার স্বর্গ। এখনও ওর জীবনের স্বপ্ন কোনও পুরুষ নয়, ওর স্বপ্ন হল শুধু রাতদিন ইউটিউবে নাটক আর সিনেমা দেখা। তবে আমি জানি প্রথম সুযোগেই সোনিয়া পেট বাধাবে। অবশ্য আমি ওকে রক্ষা করার চেষ্টা করে যাব। আমি না থাকলে ও তো মুক্তি ক্লিনিকেও পৌঁছতে পারবে না। রাস্তার ধারে কিংবা ডাস্টবিনের পাশে সন্তান প্রসবের ঘটনার সংখ্যা কি কম?

সোনিয়ার বয়স এখন ষোলো। বাড়ি ময়মনসিংহে। আমাকে বলেছে ওর গ্রামের নাম চরদুলালবাড়ি। সোনিয়া তার থানার নাম জানে না। তাই আমিও তা জানি না। দাম্পত্যের বিপর্যয় সোনিয়া আমার চেয়ে বেশি দেখেছে। দুই বছর আগে সোনিয়া আমাকে বলেছে ওর মায়ের বয়স আটাশ। বাবার বয়স একশ কুড়ি। ধনী মানুষের স্বভাব তার বয়স পঞ্চাশ বছর হলে তা ত্রিশ বছর বলা, আর গরীব মানুষের স্বভাব তার বয়স আশি বছর হলে তা একশ কুড়ি বছর বলা। আমি ধরে নিয়েছি সোনিয়ার বাবার বয়স আশি বা তার একটু বেশি।

সোনিয়ার বাবা সোনিয়ার মাকে ত্যাগ করেছেন যখন সোনিয়ার বয়স পাঁচ। তারপর সোনিয়ার বাবা বার বার বিয়ে করতে থাকেন। তাঁর ঘরে সব সময় দুই কি তিনটা করে বউ থাকে। সোনিয়ার বাবা সর্বশেষ বিয়ে করেছেন দুই বছর আগে। সেই বউয়ের বয়স ছিল তখন তেইশ। জানা গেছে সম্প্রতি সোনিয়ার বাবা আবার বিয়ে করেছেন।

সোনিয়ার বাবা সোনিয়ার মাকে ছেড়ে দেয়ার পর সোনিয়ার মার আরও কয়েকটি বিয়ে হয়। এখন সোনিয়ার মা থাকেন সোনিয়ার নানার সাথে। নানার ঘরেও এখন দুইটা বউ আছেন। সোনিয়ার নানি মারা গেছেন হাঁপানিতে। সোনিয়ার অনেক বড় ভাই আছে। কয়টা কে জানে? তাদের ঘরেও একাধিক স্ত্রী। সবচেয়ে বড় ভাইগুলিরও সন্তান রয়েছে। ওই সব সন্তানের মধ্যে যারা পুরুষ, তাদেরও একাধিক স্ত্রী।

"খালাম্মা, আইন্নের মা এক্কানি?" দুই বছর আগে সোনিয়া যখন আমাদের বাসায় আসে, তখন এটা ছিল আমার প্রতি সোনিয়ার প্রথম প্রশ্ন।

সোনিয়ার প্রশ্ন শুনে আমার আব্বার কথা মনে পড়ে যায় আর আমি কান্না ঠেকানোর জন্য চোখে পানি দিতে যাই।

পৃথিবীর পুরুষদের মধ্যে সোনিয়া সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে ওর নানাকে। নানার বহুবিবাহ সোনিয়ার কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার। ও জানে পুরুষরা বিয়ে করে এক-একটা চাহিদা মেটানোর জন্য। ওর বাবা বিয়ে করে সে-মেয়েকে, যে-মেয়ে ভাল পা টিপতে পারে। এক বার হাতের উপর পুতা পড়ে সোনিয়ার মার কব্জি ভাঙ্গে। কয়েকদিন তিনি সোনিয়ার বাবার পা টিপতে পারেননি। তিনি স্বামীর পা মাড়িয়ে স্বামীকে সুখ দেয়ার চেষ্টা করেন। ওই পদ্ধতিতে সোনিয়ার বাবা তাঁর পেশিগুলিতে কাঙ্ক্ষিত আরাম পেতেন না। তবে সেটা বড় সমস্যা ছিল না। অঘটন ঘটে অন্য কারণে। স্ত্রী তার স্বামীর পায়ের উপর উঠে পা মাড়াচ্ছেন, ব্যাপারটা

সোনিয়ার এক ফুফু দেখে ফেলেন। সেই ফুফুর পাঁচ বিয়ে হয়েছে। কোনও স্বামীর ঘরেই তিনি স্থায়ী হতে পারেননি। ফুফু সোনিয়ার মাকে তাঁর ভাইয়ের পায়ের উপর থেকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে আনেন। তারপর তিনি পুরুষের পায়ের উপর নারীর দাঁড়ানোর শাস্তিস্বরূপ সোনিয়ার মাকে উঠানে পড়ে থাকা হাসমুরগির বিষ্ঠা মাখানো একটা ঝাড়ু দিয়ে পিটান। সোনিয়ার ফুফু সোনিয়ার মাকে যত আঘাত দেন সোনিয়ার বাবা সোনিয়ার মাকে তত জোরে গালি দেন। এর পর সোনিয়ার মাকে বাপের বাড়ি চলে যেতে হয়। সোনিয়ার বাপ তত দিন একটা মেয়েকে তাঁর ঘর করতে দেন যত দিন মেয়েটা তাঁর পা টিপে তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেন।

সোনিয়ার বাবা, নানা আর প্রতিবেশি পুরুষগুলি ভাগ্যবান। তাঁদের দাম্পত্যের বিপর্যয় হয় ক্ষণস্থায়ী। তাঁরা যত খুশি তত বিয়ে করেন আর যখন যাঁকে ইচ্ছা ছেড়ে দেন। আবার প্রথম সুযোগেই আর একজনকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসেন। এলাকার হুজুর এই আসা-যাওয়ার বিষয়টা তদারকি করেন। এতে কোনও ঝক্কিঝামেলা নাই।

আমি আশরাফ শ্রেণির করিম চাচা, বাহার চাচা ইত্যাদি পুরুষের প্রতি যত উদার তার চেয়ে বেশি উদার আতরাফ শ্রেণির মানুষ সোনিয়ার পিতা, নানা, ফুফা এঁদের প্রতি। সোনিয়া এখন জেনে গেছে তার পিতাকে শরীরে নিরন্তর জেগে ওঠা উত্তাপে বরফ ঢালতে হয়। বিয়ে করা ছাড়া তাঁর এই আগুন নেভানোর বিকল্প কোনও পথ নাই। তাঁর সুযোগ আছে একাধিক মেয়ে রাখার। তাই তিনি রাখেন। তিনি জীবনকে সহজ রাখতে চান। একটার পর একটা বিয়ে করে ঘরে মেয়ে নিয়ে আসা তাঁর জন্য সহজ কাজ। আর ওই মেয়েগুলি কত না কাজে লাগে। সোনিয়ার বাবা তাঁর বউদের দিয়ে ধান কাটান, জোতদারের বাড়িতে কাজ করিয়ে টাকা উপার্জন করান। এতে করে তিনি চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়ার অবসর পান, টেলিভশন দেখতে পারেন। শুধু একটা জিনিস তাঁর কপালে নাই। সুখ। বুড়ো বয়সেও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল। তারপরও তিনি নাকি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হা-পিত্তেশ করেন, আকাশের পানে তাকিয়ে সবাইকে গালিগালাজ করেন, ধানের জমির আইলে আইলে পাহাড়-ভারী জীবনটাকে টেনে বেড়ানোর কষ্টের বিবরণ নিরন্তর আল্লাহকে জানাতে থাকেন। তিনি জানেন না সুখ তাঁর কপালে যেমন নাই, তিনি যাঁদের হিংসা করেন, সেই ধনীদের কপালেও তা তেমনই নাই। এটা জানলে গরিব হওয়ার জন্য তিনি এত অনুশোচনা করতেন না। সোনিয়া দেখেছে, কষ্টের নামে তার পিতা যত আহাজারি করেন, কষ্ট তাঁর তত বাড়ে। সোনিয়াও তার পিতার দুঃখে দুঃখিত। মাতার দুঃখেও দুঃখিত। মানুষকে বিচার না করা সোনিয়ার সহজাত অভ্যাস, ঠিক আমার আব্বার মতো। যে জ্ঞান আমি কষ্ট করে অর্জন করেছি, সে গুণ সোনিয়া মায়ের পেট থেকে নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে।

ষোলো

আতশবাজির শব্দ। এক এক বার মনে হয় এক গামলা খই ফুটছে। চালের বা গমের বা ভুট্টার খই নয়। চল্লিশ-পঞ্চাশটা খিরা বা শশার খই এক সাথে ফোটে। সৃষ্টি হয় শব্দের ফোয়ারা।

“কী অইতাছে খালাম্মা?”

“বিয়ে।”

“তাত্তাড়ি আয়ুইন।”

“একটু দাঁড়া,” আমি বলি।

আমি পাগলের ঘরে যাই। আলো জ্বালাই। পাগল লাল কম্বলটা মুড়ি দিয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে। কম্বল দিয়ে সে পুরো মাথা ঢেকে রেখেছে। তারপরও তার পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে সেই কালো পোশাক। সে তা বদলায়নি। আর সে নড়ছেও না। আমি তার এ অবস্থা বুঝি। সে জেগে আছে। এখন সে আমার দিকে তাকাবে না। আমি ডাকলেও সে সাড়া দেবে না। আর এখন তাকে ডাকার সাহসও আমার নাই। আর কোনও দিন কি সেই সাহস হবে? আমার বুক চিপে। আজকে আমরা যে দোজখ সৃষ্টি করলাম, তার পর যদি আর কখনও সে আমার ডাকে সাড়া না দেয়, তা হলে আমার কি কিছু বলার থাকবে? এমন কিছু যদি হয়, তা হলে আমি কী করব? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাদের ঝগড়ার পর আমি সব সময় ভান করে ধরে নিই সে ঘুমাচ্ছে। সেও ভান করে, সে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু আজকের ঝগড়া! আমি একটা কড়া ঝাঁকুনি খাই। আমার মাথা শিনশিন করে। চোখ বন্ধ করে আমি মাথা ধরা থামাই।

চোখ খুলে আমি কিছু সময় পাগলের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার চোখ ভিজে যায়। সবাই চলে গেছে। পাগল যায়নি। সকল কষ্ট সহ্য করে পাগল আমার জন্য পড়ে আছে। অনুভব করি অশ্রু আমার অক্ষিপক্ষ্ম ছুঁয়েছে। আমি আলো নিভিয়ে নীরবে পাগলের ঘর থেকে বের হই। বাকি অশ্রু ছাদে গিয়ে ঝরাব।

সোনিয়াকে নিয়ে আমি ছাদের উদ্দেশে রওয়ানা দিই।

সিঁড়িতে সোনিয়া আমাকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় বিয়ে হচ্ছে? আমি যেন পাড়ার সব খবর রাখি।

আমাদের এই বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় চট্টগ্রামের অনেক ধনী মানুষ বাস করেন বলে শুনেছি। তাঁদের দিল অনেক বড়। কারণ হিসাবে বলা হয় এঁদের পূর্বপুরুষদের বেশির ভাগ মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছেন। আরব সাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগরের পাড় থেকে নৌকা ছেড়ে তাঁরা চিটাগঙে এসে নোঙর ফেলতেন আর স্থানীয় নারীদের ইসলামি রীতিতে বিয়ে করতেন। বিয়ে করে অনেকে সস্ত্রীক নাকি মালয় উপদ্বীপে চলে যেতেন। পেনাং ছিল তাঁদের প্রিয় গন্তব্যস্থল। যাঁরা থেকে যান তাঁরা পরে সওদাগর হিসাবে পরিচিতি পান। তাঁরা বন্দরে বাণিজ্য করে অনেক টাকা কামান। তাঁদের ওয়ারিশরা ছেলেমেয়েদের বিয়েতে দুহাত খুলে টাকা খরচ করেন।

বিশ বছর আগের বসুন্ধরার সাথে আজকের বসুন্ধরার তুলনা চলে না। আমরা যখন এখানে জায়গা কিনি তখন এই এলাকা পানির নিচে ছিল। জায়গাটা কেনার আগে এক বর্ষায় আমরা নৌকায় চড়ে এখানে এসেছিলাম। অনেক মজার নৌকা ভ্রমণ ছিল সেটা। শরৎ কাল বুঝি প্রায় যায় যায়। যে বৃষ্টি পড়ছিল তার জন্য ছাতা মাথায় না দিলেও চলত। আমার চুলে অনেক পানি জমা হয়েছিল। চারিদিকে বৃষ্টির গন্ধ। আমাদের তখন সুখের বসন্ত। নৌকাতে আব্বা আমাকে তার কোলে বসিয়ে রাখে, কারণ আমি সাঁতার জানি না। আমি অবশ্য আজও সাঁতার জানি না। আর মার পাশে ছিল রাশেদ। রাশেদ সাঁতার জানত। আমি তখন এখান থেকে কচুরিপানার ফুলের ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। ছবিটা এখনও একটা অ্যালবামে আছে। কচুরিপানার ফুল যে এত সুন্দর তা বোধ হয় আমি কখনও জানতামই না ওই ছবিটা না তুললে। সেই বসুন্ধরা এখন একটা পুরোদস্তুর আবাসিক শহরতলী। এবং ঢাকা শহরের অন্যতম গোছানো এলাকাও বটে। আর এখানে তুলনামূলকভাবে বাসা ভাড়াও কম। আমি যেহেতু বাড়িওয়ালী, আমার জন্য এটা সুখবর হতে পারে না। তবে অনেক ভাল মানুষ এখানে বাসা নিতে আসেন। কম ভাড়ার সুযোগ গ্রহণ করতে। যাতে তাঁরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য একটু বাড়তি খরচ করতে পারেন। মন্দ কী তাতে?

বসুন্ধরায় এখন ছয় তলার নিচে কোনও ইমারত নাই। আতশবাজি ফুটছে বেশ দূরে। বড় কোনও বাড়িতে নিশ্চয়ই। না হলেতো বিয়ের জন্য হল ভাড়া করা হত। হলের মধ্যে আতশবাজি পোড়ানো সম্ভব নয়। তবে এটা বিয়ে ছাড়া অন্য কিছুর অনুষ্ঠানও হতে পারে। বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আতশবাজি ফোটার

পাশপাশি অবিরাম গান চলছে। হিন্দি ছবির কল্যাণে আমরা জানি বিয়েতে স্থানীয় শিল্পীদের ডেকে এনে আমরা কী গান গাওয়াই। আর আমাদের ছোট ছোট মেয়েগুলিকে কোন ঢংয়ে নাচাই। বোলে চুড়িয়া বোলে কাঙ্গনা। মেহেদি লাগাকে রাখনা। সাজান তুমসে পেয়ারকি লাড়াই মে। মুঝে সাজান কি ঘার যানা হে। তেরে ঘর আয়া মে আয়া তুঝকো লেনে। দুলহে কা চেহরা সুহানা লাগতা হে। মেহেঁদি হে রাচনেওয়ালি। আমরা সবাই নাচনেওয়ালি। আমার দুই পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুল ড্রামের বিটে সাড়া দেয়।

“খালাম্মা, আইন্নে কি আর বিয়া কত্তাইন না?” সোনিয়া বলে।

“চুপ কর্,” আমি বলি। তারপর ডানে বামে পেছনে তাকাই। হামিদের ভূত কোথাও নাই। ওই ভূত আবার কবে আসবে কে জানে? হামিদকে মেরেছি। এখন আর তার প্রতি আমার কোনও রাগ নাই। মাঝে মাঝে ভূত যদি আসে আসুক। আমাকে পীড়ন করুক। আমার কিছু শাস্তি হোক। তাতে যদি আমার অপরাধবোধ একটু কমে তা তো আমারই লাভ।

সোনিয়া আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

“করব,” আমি বলি।

সোনিয়া আনন্দের হাসি হাসে। “খালাম্মা, আমারে অনেক বাজি কিন্যা দিয়ুন লাগব। আইন্নের বিয়াত জ্বালায়াম।”

জ্বালাস। আমি মনে মনে বলি।

“আজকে যে পাত্র দেখলি তাকে কেমন লাগল?” আমি বলি।

“হেরে আমি ঝাড়া দিয়া বাইরায়াম।”

“ওর সাথে আমার বিয়ে হলে কেমন হত চিন্তা কর্,” আমি সোনিয়াকে বলি। “তোর বাবার আর মার বিয়ের মতো। তোর কি বয়স্ক পাত্র পছন্দ নয়?”

“বুইড়া অইলে কুনো সমস্যা নাই,” সোনিয়া বলে। “তবু হেরে ঝাড়া দিয়া বাইরায়াম।”

সোনিয়া যদি বন্দুকের ব্যবহার জানত, তা হলে হয়তো বলত, “হেরে আমি গুলি কইরা মাইরালায়াম।”

সোনিয়া সব দেখেছে। সব বুঝেছে।

“এক পাত্র না হয় গেছে,” আমি বলি। “আর একটা আসতে কতক্ষণ।”

“এরুম কেউরে আনুইন না যে, যারে আমার ঝাড়া দিয়া বাইরান লাগব,” সোনিয়া বলে। “আইন্নে কি একটাও বালা মানুষ চিনইন্না।”

আমি হাসি। হাসিতে আমার মন খুলে যায়। আমি মনে মনে বলি, দেখা যাক, সোনিয়া, কী হয়?

তবে একটা কথা ঠিক। চেয়ারম্যান স্যারের মতো এমন ক্লাসিক পাত্র আর পাব না। সে পাত্র চিরতরের জন্য আজ হাত ছাড়া হয়ে গেল। তারপর কী ভীষণ দুর্যোগই না এল। আমি পাগলকে মারলাম। তারপর থেকে পাগল নির্জীব।

আমি পাগলের কথা ভাবি। আর আমার ভেতর থেকে সারা দেহ দুমড়েমুচড়ে সন্তরণশীল ডলফিনের বেগে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে।

সতেরো

চেয়ারম্যান স্যার গতকাল সকাল এগারোটায় আমার অফিসে এসেছিলেন। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমাদের অনেক শিক্ষকেরই কোনও বসার জায়াগা ছিল না। এখন যখন আমরা শিক্ষক হয়েছি তখন আমার নিজেরই একটা ছোট অফিস আছে। আর চেয়ারম্যান স্যারের অফিসটাতো শুধু ঐতিহাসিকই না, বিশালও বটে।

স্যার এসে সরাসরি আমার পায়ের উপর পড়েন। স্যারের সাথে আসা বাতাসের ঝড় থেমে যায়। শুরু হয় প্রেম নিবেদনের ঝড়। এটা স্যারের স্বভাব। উনি যখন আমাকে একা পান তখন আমার পায়ে পড়েন। আর যখন আমাদের সাথে অন্য মানুষ থাকেন তখন তিনি আমার চোখ আর চিবুক দেখেন। আহা, ডোপামিন।

স্যারকে হামাগুড়িরত রেখে আমাকে উঠতে হয়। স্যার ওঠেন না। যেই জায়গায় আমার পায়ের ছাপ পড়ে ছিল সেই জায়গায় স্যার ঠোঁট ঘষা শুরু করেন। মেঝের উপর স্যারের ঠোঁট ঘষা আমি ভাল করে উপভোগ করতে পারিনি। কারণ আমাকে লাফ দিয়ে গিয়ে পেছনের জানালার পর্দাটা টেনে দিতে হয়েছিল। আর তা করার সাথে সাথে ছোট ঘরটাও অন্ধকার হয়ে যায়। কোনও লাইট যে জ্বালানো ছিল না, সেটা আমার খেয়ালে ছিল না। তবে আমার চোখের ক্ষমতা অনেক। আমি অন্ধকারেও সব দেখতে পাই। সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা যে দরকার, সে বিষয়ে আমার ধীশক্তি সজাগ হয়ে যায়। আমি জানালা থেকে উল্টো দিকে দৌড় দিই দরজার ছিটকানি বন্ধ করার জন্য। ছিটকানি লাগানো পর্যন্ত আমার নিঃশ্বাস আটকে থাকে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর আমার নিঃশ্বাস বেশ জোরে মেঝেতে আঘাত করে। আমার শরীরেও শিথিলতা ফিরে আসে।

আমার ছোট্ট অফিস কক্ষে তখন শতভাগ রোমাঞ্চের পরিবেশ। তিনটা চেয়ার আর একটা টেবিল আর বইয়ের একটা ছোট আলমারি ছাড়া আমার অফিসে আর কিছু নাই। আমার পায়ের ছাপের উপর আমার প্রেমিক সেজদারত। আমি টেবিলে আমার জায়গায় ফিরে এলে স্যার উঠে দাঁড়ান। স্যারের দৃষ্টিশক্তি বুঝি আমার দৃষ্টিশক্তির চেয়েও প্রখর। তিনি আমার গালের রং খুঁজছেন বুঝি। কে না জানে এমন সময় কুমারী মেরি হোক, কিংবা অজাচারিণী ক্লিওপাত্রা হোক, কিংবা আমার মতো ছিনাল হোক, সবাই লজ্জায় লাল হয়ে যায়। বুঝলাম স্যার আমাকে দেখে সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন। কামনায় ওনার চোখ দুটি রাজহাসের ডিমের মতো ফুলে ওঠে। ওই চোখ দিয়ে তিনি ডানে বামে দেখেন। আমি তাঁকে দেখি। আমার প্রাথমিক ঘোর কেটে গেছে। দরজা বন্ধ করতে পেরেছি। জানালা বন্ধ করতে পেরেছি। এই খুশিতে আনন্দধারা একবার আমার মাথার তালু থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত গড়িয়ে যায় আবার পায়ের পাতা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত বেয়ে বেয়ে ওপরে ওঠে। স্যার কী খুঁজছেন আমি জানি। কিন্তু কী করা? জীবনে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়। স্যারের দৃষ্টি কোনও সুবিধাজনক আসবাবপত্র খুঁজে পায় না। আমার কতক চাচার অফিসে চেয়ারের পেছনে ছোট একটা ঘরে একটা করে খাটও আমি দেখেছি। সে ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই। ভিসি স্যারের অফিসে আছে হয়তো। আমি তা জানি না। সেই জায়গায় আমার কখনও যাওয়া হয়নি। চেয়ারম্যান স্যার চোখ নামিয়ে আমার অফিসের ফ্লোরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে থাকেন। আন্দাজ করতে থাকেন কোন দিকে একটা কবর খোঁড়া যেতে পারে। পূর্ব-পশ্চিমে? উত্তর-দক্ষিণে? কোনাকুনি? টেবিলটা একটু সরালে কেমন হবে? ওটার ভার কত? উনি একা সরাতে পারবেন? না কি আমাকেও ধরতে হবে? চেয়ারগুলি টেবিলের ওই পাশে রাখলে কেমন হয়? স্যারের

দৃষ্টি টেবিলটার ওপর আটকে থাকে। আবছা অন্ধকারে স্যারের চোখ দুটি চকচক করে, যেন তারা অন্ধকার মহাসড়কের ক্যাট'স আই। আবার স্যারের চোখজোড়া মিইয়েও যায়। টেবিলটার প্রস্থ অপরিমেয়। আমি ওটার উপর পা ঝুলিয়ে বসতে পারি। তবে আমার পেছনে হাতের তালু ঠেকানোর মতো যথেষ্ট জায়গা টেবিলটাতে নাই।

কী আশা যে জেগেছিল স্যারের মনে। কিন্তু স্যারের অর্ন্তজ্ঞানও বেশ টনটনে। আর তা হবেই না বা কেন? তাঁর অভিজ্ঞতারতো কোনও ঘাটতি নাই। ছয় দশক আর পাঁচ মহাদেশের অভিজ্ঞতা। আর কত শত নারীর রানের চিপার, তা আমি নিজেও জানি না। যেই বুঝলেন পর্দা টানা আর দরজা বন্ধের উদ্দেশ্য শুধু ভেতরের এই মানবিক দৃশ্যটাকে লোকচক্ষুর আড়াল করা, আর তাঁর সমগ্র বাসনা এক তরফা, যেমন খদ্দের বারবনিতাকে চুমু খায় কিন্তু বারবনিতা খদ্দেরকে প্রতিচুমু দেয় না, আমার পক্ষ থেকে সব ব্যবস্থা শুধুই সতর্কতামূলক, কামনা-প্রভাবিত নয়, অমনি স্যারের লাল আর ফুলেফেঁপে ওঠা আর্য মুখ একটা পচা এক কেজি ওজনের গোল বেগুনের রং ধারণ করে।

স্যারের পরিস্থিতি মেনে নিতে বিশ সেকেন্ডের মতো সময় লাগে। আর ওই সময়টা ওনার মুখটা এতটা হা হয়ে থাকে যে আলো থাকলে আমি তাঁর কলিজা দেখতে পেতাম। বিশ সেকেন্ড পর স্যার নিজেকে ফিরে পান। তিনি আবার আমার পায়ের উপর সেজদায় চলে যান। আমার যে আঙ্গুলগুলো এখন বিয়ে বাড়ির গানের তালে তাল দিচ্ছে তখন স্যারের হতাশ নিঃশ্বাস তাদের ধুলা ঝাড়ছিল। আর কী যে গরম স্যারের নিঃশ্বাস। আমি নরম না হয়ে পারি না। সেজদারত পুরুষকে ফিরিয়ে দেয়া কত কঠিন আমি তা বুঝি। আমার খারাপ লাগে। আমি বলি, “উঠুন, স্যার। যা বলার আগামী কাল আমার বাসায় এসে বলবেন।”

আঠারো

স্যার আজ ভোর ছয়টায় এসে হাজির। আমি তখন ঘুমাচ্ছিলাম। সোনিয়া এসে বলে, “খালাম্মা খালাম্মা, কেডা জানি আইছে।” আমি ইন্টারকম টেলিফোনের শব্দ শুনি: কিরকিরকির কিরকিরকির। বাধ্য হয়ে উঠে গিয়ে রিসিভারটা কানে লাগাই। আমাদের ম্যানেজার মাজহার ব্যাগ্র হয়ে বলেন, “ম্যাডাম, ম্যাডাম, গেরামের স্যার আইছে।” ম্যানেজার কানে কম শোনেন। আমি বলি, “আসতে দেন।” আমি বাইরের দরজা খুলি আর সোনিয়াকে বলি, “এখানে দাঁড়িয়ে থাক। মেহমানকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে দিস। দরজা বন্ধ করিস না।”

আমি তৈরি হতে চলে যাই। বাথরুমে ঢুকে ভাবি চেয়ারম্যান স্যারকে ঘন্টা দুয়েক বসিয়ে রাখি। এমনিতেই আমার বাথরুমে বেশি সময় থাকতে হয়, যদিও তা পাগলের মতো এত বেশি নয়। সচেতনতা আসা মাত্র আমি আমার ব্রেইনকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করি। আমি পাগলকে বলেছিলাম একই রকম করতে। পাগল বলেছে, সে চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে তার কোনও কাজ হয় না। তারপরও আমি চেষ্টা চালাই পাগলের জন্য। মাঝে মাঝে বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলি, “মা, তোমার ব্রেইনকে বলো, তুমি পরিষ্কার আছো। চিৎকার করে তোমার ব্রেইনকে জানিয়ে দাও সে বেয়াদবি করছে। জানাও মা, জানাও। দেখবে তোমার ব্রেইন শান্ত হবে, যুক্তি মেনে নেবে। তুমি পানির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।” পাগল এখন আর আমার কথা শোনে না। পাগল বাথরুমে থাকা অবস্থায় এখন যদি আমি কিছু বলি, বাথরুম থেকে বের হয়ে পাগল আমাকে মারে। পাগল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসবে না। আমি পাগলের উল্টো সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি বের হয়ে আসব। আমি এসেছি। যদিও এখনও পুরোপুরি তা পারিনি। তবে ধীরে ধীরে আমি তা করে ছাড়ব। কোনও ডাক্তারের সাহায্য ছাড়াই।

আমার জন্য চেয়ারম্যান স্যারের যে ধৈর্য, তাতে দুই দিন তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে রাখা সম্ভব। আমি যদি তেমনটা করি তিনি এমনকি বাথরুমেও যাবেন না, বড় বা ছোট প্রয়োজন, কোনওটাতেই সাড়া দেবেন না, ঠায় বসে থাকবেন, মগজে ডোপামিন তৈরি করবেন আমার চিবুক কল্পনা করে করে। আর সে তো মাত্র কথার কথা, কী কী কল্পনা করবেন তা কি আর আমি জানি না? আমার ভূগোল। ভূমিরূপ, নদীনালা, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, পাহাড়পর্বত, প্রেইরি, গ্রত্তে দি ফ্রাসাসসি, হট স্প্রিংস্ অফ পামুকালে। আমার সমগ্র ফ্লোরা ও ফাওনা। আবহাওয়া ও জলবায়ু। গ্রীষ্ম মণ্ডল ও বর্ষা মণ্ডল। অনেক লম্বা কাজ। দুই ঘন্টায়ও সারবে কি না কে জানে? আমি ভাবি বেলা আটটায় স্যারের সামনে যাব।

স্যারকে এমন শাস্তি দিয়ে কী লাভ আমার? আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি। যা প্রত্যক্ষ করার তাতো করতেই হবে। সম্মুখীন হতেই হবে, প্রেমিকের কি ঘাতকের। আমার খারাপ লাগে তাঁর জন্য। চেয়ারম্যান স্যার শয়নে স্বপনে জাগরণে টিকলো বোঁটার কথা ভাবেন আর নিজের অজান্তে নিজের জিভ দিয়ে বারা বার ঠোঁট ভেজান। কী যে গভীর তাঁর আকাঙ্ক্ষা। কত তীব্র তাঁর বাসনা। আর কত ব্যাকুল তা। যা আমি এক নারীর মিটিয়েছিলাম, মানে আমার পক্ষে যতটা মেটানো যায়, আফরোজ ম্যাডামের। সে কাজ এখনও আমাকে আনন্দ দেয়। মানুষের যে কোনও প্রয়োজন মেটাতে পারলে আমার ভাল লাগে। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি চেয়ারম্যান স্যারের সাথে দাতার আচরণ করছি? না, করছি না। যদি এক অপরিচিত নারীর বাসনার ডাকে সাড়া দিতে পারি, তা হলে চিরচেনা চেয়ারম্যান স্যারের ডাকে সাড়া না দেয়া নিশ্চয়ই একটা পাশবিকতা। এই কূপমণ্ডূকতা যতই আদরণীয় হোক, শেষ বিচারে তা সভ্যতার পথে বাধা। আমি সভ্যতার অগ্রগতির সমর্থক। তা হলে এত দেরি কেন? আমি একটা টেলিফোন সেরে নিই। তারপর কাপড় বদলে একটা লাল-সাদা শাড়ি পরে মিনিট পনেরোর মধ্যে তৈরি হই। সোনিয়াকে বলি রুটি বেলতে, আলু ভাজি করতে, ডিম ভাজতে, আর চায়ের জন্য পানি গরম করতে।

গতকাল আমার অফিসের ভেতর আমার বিচলিত হবার কারণ ছিল। চাকরির জায়গাটা আমি নিষ্কলুষ রাখতে চাই। ওটা আমার শান্তির জায়গা। অবশ্য চেয়ারম্যান সাহেবের উৎপাতের বিষয়টা বাদে। তা ছাড়া এত ছোটখাটো বিষয়কে উৎপাত হিসাবে আমার আর ভাবার অবকাশ যে নাই, তা আমি জানি। অধিকন্তু, এসব সহ্য করাতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সপ্তম শ্রেণি থেকে এই উৎপাতের সাথে আমি পরিচিত। চেয়ারম্যান স্যার আমার পেছনে ঘুরছেন এক বছরেরও কম সময় হবে। তার আগেও আমার পেছনে কেউ না কেউ ঘুরেছে। সব সময়। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে জীবনে এখনও একটা দিন পার করিনি যে দিন কোনও না কোনও পুরুষ, কোথাও না কোথাও, আমাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত ছিল না, ক্ষেত্র বিশেষে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এমনকি চৌদ্দগোষ্ঠী পরিত্যাগ করে হলেও। কেউ কেউ সব জঞ্জাল, যার অন্তর্গত নবতিপর মাতা থেকে নবজাতক শিশু সবাই ছিল, রাতের অন্ধকারে ঝেড়ে ফেলার, মেরে নদীতে ডুবিয়ে দেয়ার, কিংবা মাটি চাপা দেয়ার, কিংবা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলার, প্রতিজ্ঞাও করেছে। চেয়ারম্যান স্যারকে এই প্রতিজ্ঞাগুলি করতে হয়নি। কারণ তাঁর বাড়ি খালি। "একেবারে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত, শিশিরকণা" তিনি বলেছেন। "আর বিশাল বাগান, বুঝছ তো? সামনে পেছনে। আপেল গাছও লাগিয়েছি। সবুজ আপেলের বাগান, বুঝেছো তো? চেষ্টা করেছি আদম-হাওয়ার আপেল বাগানের মতো করে বানাতে, যেখানে তুমি আমি আদম হাওয়ার মতো ঘুরতে পারব, বুঝেছো তো কী বলতে চাচ্ছি? পুরো চৌহদ্দি উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বুঝছো তো? একেবারে বেহেশতের মতো। দুনিয়ার মতো নয়। দরকার হলে একটা সাপও নিয়ে আসব। বিষদাঁত উপড়ে ফেলা সাপ। তোমার কোনও ক্ষতি করবে না। শুধু তোমাকে প্রেমের শীতল প্যাঁচে জড়িয়ে ধরবে। তুমি তাকিয়ে আপেলের দিকে। আর, আমি? বুঝছো তো? বেহেশতের মতো, বেহেশতের।" চেয়ারম্যান স্যার এখানেই থেমে যাননি। তিনি মাঝে মাঝেই বলেন, শুধু পৃথিবীতেই নয়, কবরেও তিনি আমার সাথে শুতে চান। তবে কবরে আমার মৃতদেহের যে অবস্থা হবে তা চেয়ারম্যান স্যার কল্পনা করতে চান না। তিনি চান আমাদের কবর হোক সাহারা

মরুভূমিতে, যেখানে লাশ পচে না। এক দিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, ধরো তোমার আর আমার লাশ পুড়ে ছাই করে ফেলা হল। ছাইগুলিকে মিশিয়ে ফেলা হল। আমি তোমার মধ্যে মিশে গেলাম, বুঝছ তো? তারপর আমাদের বঙ্গোপসাগরে ছড়িয়ে দেয়া হল। আমি বলেছিলাম, স্যার, গুনা হবে। স্যার বলেছিলেন, হবে তা ঠিক, তবে কতটা? এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ না পড়লে যে গুনা হয়, ওই গুনা তার চেয়ে অনেক কম, বুঝছ না, বুঝছ তো? আর আমিতো কোনও নামাজই পড়ি না। আমার স্যারের কথা শুনতে ভাল লাগে। নারীর অপানের পানে পুরুষের চোখ। এটা ফেরানোর কোনও শক্তি কি পৃথিবীতে আছে? আমার তা উপভোগ করতে কোনও দ্বিধা নাই। নগদ ডোপামিন। নগদ আনন্দ।

ড্রয়িং রুমে ঢুকে আমার মন ভরে যায়। স্যারের বয়স আমার চেয়ে পঁচিশ বছর বেশি। অথচ মনে হল আমার চেয়ে পঁচিশ বছরের ছোট কোনও কিশোরের সাথে আমি অভিসার করতে এসেছি। যেন তিনি গভীর রাতে অষ্টাদশী অ্যানের খাট থেকে নেমে আসা দশ বছরের উইলো। কী চমৎকার করে তিনি শেভ করেছেন। আর কী খুশবুই না ছড়াচ্ছেন। পরেছেন রক্তলাল কাশ্মিরি সোয়েটার। তার নীচ থেকে শান্তি-নীল টিশার্টের কলার স্যারের ভাঁজহীন গর্দানে উপর মসৃণ করে টানা। ফ্যাকাশে নীল জিন্সের হাঁটুর উপর দুটি অস্পষ্ট সাদা রঙের তালি। বলা চলে বয়সের সাথে মানানো স্টাইল। মাথা ভর্তি সাদা চুল। স্যার সেগুলোকে টেনে নিয়ে পেছনে বিশেষ একটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে ঝুঁটি বেঁধেছেন। স্যার এই ব্যান্ডগুলি প্রিটোরিয়া থেকে আনান। স্যারের চেহারায় রোশনাই আছে। স্যারের দাদা ছিলেন উত্তর প্রদেশের এক জমিদার, যিনি তাঁর সময়ে ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পেরেছিলেন। জমিদারি বিক্রি করে দিয়ে হিন্দুদের হাতে মার খেতে খেতে গত শতকের পঁয়তাল্লিশ সালে তিনি কোলকাতা পৌঁছেন। সেখানে স্যারের দাদা এক বছর বাস করেন। ছেচল্লিশের আগস্ট মাসে আগের মারের শোধ নিতে স্যারের দাদা কোলকাতায় ডজন খানেক হিন্দুকে জবাই করেন। সাতচল্লিশে ভারত ভাগ হয়। আটচল্লিশে তিনি সপরিবারে ঢাকায় আসেন। এখন ধানমন্ডির দুইটা ব্লকের মালিক আমার স্যার। স্যার বলেছেন তিনি তাঁর দাদার চোখ পেয়েছেন। যেমন স্বচ্ছ তেমন তীক্ষ্ণ। এমন চোখ না হলে কি আর নারীকে দেখে আনন্দ পাওয়া যায়? যত্ন করা চকচকে সাদা দাঁত। তবে বয়সের সাথে সাথে ওগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে। ফাঁকগুলি দৃশ্যমান তবে বেমানান নয়। স্যারের মেদহীন পেট সোফিয়া লরেনের পেটের মতো মনোহর হবে বলে ধারনা করি, যে পেট দেখিয়ে বয় অন ডলফিন সিনেমা ব্যবসা করেছিল। সুযোগ পেলে স্যারের পেটটা দেখে নেব। আশা করি কোনও চুল নাই ওখানে। স্যারের সব কিছু উৎকৃষ্ট আর মানানসই।

আর যা সতেজ লাগছিল স্যারকে। রাত তিনটায় যে তিনি গোসল শুরু করেছেন তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আর তা সন্দেহাতীত প্রেমের লক্ষণ। আমি কেন তবে প্রেম দেব না? উনি বরের সাজে না সাজলেও জামাইর সাজেতো সেজেছেন। আমার মনে লোভ হয়। বিজ্ঞানের বাণী: বয়স এখন আর ধ্বজের উত্থানে কোনও বাধা নয়। পাগলকে বললে কাজির ব্যবস্থা পঁচিশ মিনিটে সেরে ফেলবে। আর কাবিন হয়ে গেলে পাগল বয়োজ্যেষ্ঠ এই পণ্ডিতের মাথায় হাত রেখে জামাই বাবাজি বলে ডাকবে। তার জন্য পঞ্চাশ রকমের তরকারি রান্না হয়ে যাবে। পাগলের ওসিডি সেরে যাবে। তা যে সেরে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমার হাতে খুন দেখে সে পাগল হয়েছিল। আমার আলিঙ্গনে জীবনবল্লভ দেখলে সে আরোগ্য লাভ করবে। অন্তত পাগলের পাগলামি সারানোর জন্য হলেও স্যারকে বিয়ে করার কথা আমার নিষ্ঠার সাথে বিবেচনা করা উচিত।

“অপেক্ষা একেবারেই সহ্য হচ্ছিল না, তাই না স্যার?”

“ঠিক তাই, শিশিরকণা।”

“তা, এখন কী করবেন?”

“আমি একটু দরজাটা বন্ধ করি?”

আমাদের ড্রয়িং রুমের গড়ানো দরজাটা বন্ধ করা সহজ নয়। কাজটা শেষ করার পর সব সময় মনে হয় কাঁচের দরজাটা এক মাইল টেনে আনতে হল। আসলে সব কিছু পুরনো হয়ে গেছে। তাই টানতে অনেক শক্তি লাগে। দরজাটা খোলা বা বন্ধ করার দরকার হলে আমাকে আর সোনিয়াকে একযোগে কাজ করতে হয়। সোনিয়া দুই দিন পর পর ভেজা কাপড় দিয়ে ওটার ধূলা মোছে।

“দরজাটা, বুঝছ তো?” স্যার বলেন।

“বন্ধ করার দরকার নাই, স্যার,” আমি বলি। “কেউ এ দিকে আসবে না। কেউ উঁকিও দেবে না। ডান দিক থেকেও না। বাম দিক থেকেও না। আপনার গোপনীয়তা এখানে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।”

“আমি যে দরজা বন্ধ না করলে খোলা মনে কথা বলতে পারব না?”

“আপনিতো কথা বলতে আসেননি, স্যার। আপনি এসেছেন প্রেম করতে।”

স্যার চুপ হয়ে যান। আমি তাঁকে বুঝি। মানে আমি আমার এসব প্রেমিককে ভালোভাবে বুঝি। আর ওনাকে বুঝতে একটু বেশি সুবিধা হয়। ওনার চোখে অনেক কিছু ভেসে ওঠে। খুব কম পুরুষই তার চোখে ভেসে ওঠা কামনা লুকাতে পারে। তারপরও স্যারের ব্যাপারটা আলাদা। স্যারের চোখ থেকে কামনা উপচে উপচে পড়ে, জলপ্রপাতের মতো। তবে আমি ধারণা করি স্যারের গালের ত্বকের ভাষা দিন দিন ফিকে হয়ে আসছে। এক সময় তা সুস্পষ্ট ছিল। অবশ্য স্যারের গালে এখন অনুভূতি ফুটে না ওঠার জন্য স্যার নিজেই দায়ী। উনি প্রিটোরিয়া থেকে মাথার ঝুঁটি বাঁধার জন্য সাদা রাবারের ব্যান্ড আনলেও মুখের ত্বকের ভাঁজ পোড়ানোর জন্য হারবাল ক্রিম আনেন বার্সেলোনা থেকে। আমাকে ওই দুই শহরে তাঁর সাথে অবকাশ যাপনের নিমন্ত্রণ উনি অনেক আগেই দিয়ে রেখেছেন। বার্সেলোনাতে নাকি আমাকে যেতেই হবে। প্রেমের শহর। সোজাসাপটা প্রেম। যে প্রেমে মধু বেশি। ঝামেলা কম। হোটেল কক্ষের প্রেম সাগরের জলে ধুয়ে ফেলা। ভূমধ্যসাগরের উষ্ণ জল। সে জলের গলদা চিংড়ি আর চালের তৈরি পাইয়া নামক বিশেষ এক বিরানি খেতে নাকি অনেক স্বাদ। এক প্লেট খেলেই দেহে পুনরায় প্রেমের জোয়ার আসে। স্যার এক রাতে দশ প্লেট খেতে চান। দশ বার প্রেম করার জন্য।

“এমন সুযোগ আর কোথাও নাই, শিশিরকণা,” গত মাসে স্যার আমাকে বলেছিলেন।

“যাব, স্যার, যাব। আপনার সাথেই যাব। আর আমি কিন্তু এক রাতে দশ প্লেট পাইয়া খাব।”

আমার কথা শুনে স্যারের চোখ দুটি বড় হয়ে গিয়েছিল। যেন বরফের টুকরার উপর সূর্যের আলো পড়েছে। যদিও স্যার জানেন আমি পাগলকে সাথে নিয়ে বাসিলিকা দে লা ছেগ্রাদা ফেমিলিয়া আর ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ব্রোঞ্জ মনুমেন্ট, পিকাসো মিউজিয়াম, পার্ক গুয়েল ইত্যাদি দেখেছি। গোসল করেছি কোস্টা ব্রাভার শীতল জলে। স্যার বলেন, তাতে কী? প্রেমিকের সাথে ঘুরে যে আনন্দ তা কি মায়ের সাথে ঘুরে পাওয়া যায়? বুঝছ তো, কী বোঝাতে চেয়েছি? স্যার বলেছিলেন।

স্যার আবার দরজার কথা মনে করিয়ে দেন।

“দরজা বন্ধের দরকার নাই, স্যার।”

স্যার এমনভাবে ঢোঁক গিললেন যা দেখে বোঝা যায় স্যারের মুখে অনেক তরল জমা হয়েছিল। আমার মায়া বাড়ে। বেচারা। কী নেশাতেই না আছেন। কত অনিরাময়যোগ্য এই ব্যাধি। যত করেন তত

নেশা বেড়ে যায়। আমি নিজ চোখে হামিদকে দেখেছি। এখন স্যারকে দেখছি। করিম চাচাকে দেখেছি। বাহার চাচাকে দেখেছি। সোনিয়ার আব্বা আর নানা আর ভাইদের কথা শুনেছি। মৃত্যুর আগে আর কাকে কাকে দেখব, আল্লাহ ভাল বলতে পারেন। রাশেদকেও সন্দেহ করি। সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করি ওকে। ওকে যেন আমাকে এমন বুভূক্ষু দেখতে না হয়। রাশেদ আমার ভাই। আমি ওর ভাল চাই। আমি চাই না আমার ভাই আমার স্যারের নেশা নিয়ে দেহ ত্যাগ করুক। আমার স্যার যে এই নেশা নিয়ে মরবেন, তাতে স্যারেরও কোনও সন্দেহ নাই, আর আমারও কোনও সন্দেহ নাই। হামিদ জানতে পারেনি কখন ওর নিশ্বাসটা চলে গেছে। স্যারও জানবেন না কখন তাঁর নিশ্বাসটা চলে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীরা শুধু দেখবেন স্যারের নেশার নিশানা। সিডনি-প্রবাসি স্ত্রী ও মেয়ে তিনটে এসে দেখবে স্বামী এবং পিতার গৌরবোজ্জ্বল স্তম্ভ। লুঙ্গি আর পাজামা যার বিজয় পতাকা।

স্যার যুদ্ধে হার মানার মানুষ নন। আমার কথাগুলি খাঁটি না ন্যাকামো তা ধরতে না পেরে উনি হাসার চেষ্টা করেন। বইপত্র তাঁকে শিখিয়েছে, কাজের আগে হিরো হতে হবে।

“আমি তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি, শিশিরকণা, বুঝছ তো? চূড়ান্ত কথা। তুমি আমাকে অপমান কোরছ। করো। দেখো আমার মনের দুর্বলতা। তোমার সাথে আমি কথায় পারব না। যদি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও, শুধু একটা প্রার্থনা রেখো।”

“আমিতো আপনার প্রার্থনা রেখেছি, স্যার।”

“কোন্ প্রার্থনা? এ পর্যন্ত তুমি আমার একটা ফরিয়াদও মঞ্জুর করোনি, শিশিরকণা।”

“স্যার, ভুলে গেলেন। আমি কি আপনাকে দু’চোখ ভরে আমার চিবুক দেখার শর্তহীন স্বাধীনতা দিইনি?”

মনে হল স্যার ছোট একটা লাফ দিলেন। নিশ্চয়ই তাঁর স্মরণে এসেছে কত আকুল হয়ে তিনি সেই প্রার্থনা করেছিলেন।

“তোমাকে ধন্যবাদ, শিশিরকণা। গত একটা বছর তোমার চিবুকখানাই ছিল আমার বেঁচে থাকার এক মাত্র প্রেরণা। বিশ্বাস করো, শিশিরকণা।”

“বিশ্বাস করলাম, স্যার। এখন বলেন আর কী প্রার্থনা আছে আপনার?”

“আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না, শিশিরকণা।”

“আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিলাম, স্যার।”

এই বাক্যটি চয়নে আমি আমার কণ্ঠে দৃঢ়তার কোনও অভাব রাখিনি।

“কী বললে, শিশিরকণা? আমি যে মরে যাব।”

“মরে যান, স্যার। আপনার কবরে আমার জন্য জায়গা রাখতে পারেন।”

“আমরা এক কবরের বাসিন্দা হব, শিশিরকণা। সত্যি বলছ? সত্যি বলছ, তুমি? তুমিতো জানো এটাই আমার চূড়ান্ত স্বপ্ন।”

“জি, স্যার। হব। আমরা এক কবরের বাসিন্দা হব।”

“আমাকে তা হলে আর ফিরিয়ে দিয়ো না তুমি, শিশিরকণা। ফিরিয়ে দিয়ো না।”

“ফিরিয়ে দিলাম, স্যার।”

“এটা তোমার মনের কথা না।”

“এটা আমার মনে কথা, স্যার।”

“সত্যি বোলছ?”

“জি, স্যার।”

“এই জনমে যদি তোমাকে না পাই অন্য জনমেও পাব না।”

“কেন, স্যার।”

“তুমি জানো না, শিশিরকণা। পরকালে তোমাকে পাওয়ার পূর্বশর্ত হল তোমাকে এই জনমে পাওয়া। সেখানেতো অন্য ব্যবস্থা নাই, শিশিরকণা, বুঝছ তো?”

“তা হলে কোনও জনমেই পাবেন না, স্যার।”

“কী বললে, শিশিরকণা? আর এক বার বলো। কসম খেয়ে বলো। তুমি এমন নিষ্ঠুর হতে পারলে, শিশিরকণা। কী করে? কী করে?”

“কসম খেলাম, স্যার। আর নিষ্ঠুরও হলাম।”

স্যার আমার দিকে তাকান। শিশুর মতো মুখ করে। এক অসহায় মানুষের বিরস বিবর্ণ মুখ।

“তুমি আমাকে মেরে ফেললে, শিশিরকণা। তুমি নিজেও জানো না কত নিষ্ঠুরভাবে তুমি আমাকে হত্যা করলে।”

“আপনিতো দিব্যি বেঁচে আছেন, স্যার।”

“শুধু এই দেহটা বেঁচে আছে। প্রাণ চলে গেছে, শিশিরকণা। তোমার দেয়া আঘাতে। দেহটাও চলে যাবে। অতি সত্ত্বর চলে যাবে। হয় পক্ষাঘাতে নয় হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। বোঝোনি। কিছুই বোঝোনি।”

“আপনি আমাকে পাচ্ছেন না, স্যার।”

“তা হলে কেন তুমি আমাকে ডেকে এনেছো? কেন আমার আশাকে এমন করে জাগালে, শিশিরকণা?”

ডোপামিন, আহা, ডোপামিন, আমি মনে মনে বলি। “স্যার, আমি আপনাকে বাসায় ডেকেছি একটা কথা বলতে।”

“বলো, শিশিরকণা। যে কোনও কথা। শুধু একটা কথা বাদ দিয়ে। আর যে কোনও কথা বলতে পারো, শিশিরকণা। যে কোনও কাজ। কিছু বলার আগে বরং তুমি আমাকে তোমার পায়ের সেন্ডেল দুটি দিয়ে মারো, কয়েক ঘন্টা মারো আমাকে। তারপর বলো। বুঝছ তো?”

আমি আমার দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ শুনি। স্যারও শুনেন। আর আমার দিকে গলা টানটান করে তাকান।

“আপনি আর কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে হয়রানি করবেন না,” আমি বলি।

“কী বোলছ তুমি, শিশিরকণা? কীভাবে আমি তোমাকে হয়রানি কোরব? তোমার প্রেমে আমি মরে যাচ্ছি। তুমি কি কিছুই বোঝ না? এই দুর্বলতা নিয়ে আমিতো একটা পিঁপড়াও মারতে পারব না, একটা মশাও তাড়াতে পারব না। তা হলে কী করে আমি তোমাকে হয়রানি কোরব? তোমার মতো মেয়েকে আমি হয়রানি করব? দিয়োনিসাস, ফ্রেয়ার, প্রিয়াপাস, শিব, গেব, বুঝছো তো? না, বোঝনি। যাদের নাম বললাম তাদের কারও সাহস নাই তোমাকে হয়রানি করার। আর আমি? যে টনসিলের ব্যথায় কাবু, মাইগ্রেন উঠলে যে চেঁচিয়ে কাঁদে, যে সর্দিজ্বর সহ্য করতে পারে না, সে তোমাকে হয়রানি করবে? তা কী করে সম্ভব, শিশিরকণা? কী অপবাদ দিলে তুমি আমায়?”

এই যে তিনি এক কথায় পৃথিবীর পাঁচ কোনার পাঁচ দেবতার নাম নিলেন। তাঁর এ সব কথা কামনার অঙ্কুরে স্পন্দন সৃষ্টি করে, সে কথা অস্বীকার করি না। আর অঙ্কুরের আর্দ্রতার সাথে হৃদয়ের আর্দ্রতার সম্পর্ক নাই, এ কথা বলার মতো কপট আমি নই। তবু আমি সচেতনভাবে শ্বাস গ্রহণ করি। আর বলি:

“স্যার, আপনি কখনও আমার অফিসে ঢুকবেন না।”

“তা হলে, বাসায়?”

“না।”

“কোথাও না?”

“না, কোথাও না।”

“প্রতিদিন না হোক। মাঝে মাঝে? বুঝছো তো? কাশবনে বা ফুলবনে?”

“কখনও না। কোথাও না। কক্ষেও না। গুহায়ও না।”

“তা হলে আমি কী ভাবে বাঁচব, শিশিরকণা?”

“আপনার আরও অনেক প্রেমিকা আছে। তাদের নিয়ে বাঁচবেন। আর কেউ না থাকলে আমার চিবুকের কথা ভাবতে পারেন। সহায়ক হিসাবে তেল আছে। যন্ত্রপাতি আছে। এগুলোর কথা আমরা উভয়েই জানি।”

“আমার কোনও প্রেমিকা নাই, কেউ নাই, শিশিরকণা। জানো তো? আমার কেই নাই। আমাকে তুমি মেরে ফেলো না।”

“প্রেমিকাদের নিয়ে বাঁচেন, স্যার।”

“এ সব মিথ্যা কথা, শিশিরকণা। আমার কোনও প্রেমিকা নাই। লোকে আমার নামে মিথ্যা কথা ছড়ায়। তুমি তাতে যোগ দিয়ো না, শিশিরকণা। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে কষ্টে। তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু আমার একটা কথা রাখো। একটা প্রার্থনা।”

“কী?”

“তোমার ভাবির সাথে ডিভোর্সের সব বন্দবোস্ত হয়ে গেছে।”

“আমি কী করব?”

“তুমি আমাকে ফেলে দিলেও ডিভোর্স হয়ে যাবে। এই আমার শেষ কথা, শিশিরকণা।”

“তা হয়ে যাক।”

“আমাকে শুধু একটা কথা দাও, শিশিরকণা।”

“কী কথা?”

“তোমাকে পাওয়ার সাধানাটা আমাকে চালিয়ে যেতে দাও। এটাই আমার প্রার্থনা।”

স্যার আমার পায়ের কাছে চলে আসেন।

আমি অবশ্য ড্রয়িং রুমে ঢোকার পর থেকে এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এর মধ্যে স্যার চোখের জলও ছেড়েছেন। স্যার একটু এগিয়ে এসে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে নিচের দিকে তাকান। তারপর চোখ দু'টিকে জায়গামতো নিয়ে যান। এক ফোঁটা গরম অশ্রু আমার ডান পায়ের পাতার লম্বা হাড্ডিটার মাঝখানে পড়ে। যেখান দিয়ে একটা নীল শিরা চলে গেছে। স্যার আমার ত্বক আর শিরার সংবেদনশীলতাকে প্রভাবিত করেছেন। এখন রক্ত আহরণের কিংবা সেলাইনের জল ঢুকানোর জন্য এই শিরায় একটা মোটা সুঁই ঢোকাতে এমনকি সোনিয়াকেও বেগ পেতে হবে না। আমার দুই পায়ের উপর চেয়ারম্যান স্যারের চোখের পানি ঝরতে থাকে। পেটপেট করে।

“আপনার সব প্রেম আজ চোখের জলে বের করে দেন, স্যার,” আমি বলি।

“এই সুযোগ দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, শিশিরকণা। এখন তোমার দুই হাঁটুতে আমার কপালটা ঠেকাতে একবার অনুমতি দাও। শুধু একবার। শুধু একবার।” স্যারের অশ্রুবিন্দুগুলি ভারী হতে থাকে। এক একটা আমার বুড়ো আঙ্গুলে পড়ার পর মনে হয় ছিটকে গিয়ে কিছু অশ্রু আমার পাজামাতেও লাগছে। “একবার। একবার শুধু। শুধু একবার। শিশিরকণা। বুঝছো তো?”

“ঠিক আছে,” আমি বলি।

পাঁচ কি সাত সেকেন্ড পর স্যারের মসৃণ কপাল আমার হাঁটুর উপর ঠেকে। স্যারের মাথার ওজন বেশি নয়। এরপরও আমি মেঝেতে আমার পা দুটি চেপে ধরি, যাতে ওজনটা নিতে পারি। আমার দয়ালু মন। তার উপর আমি সংবেদনশীল নারী।

কাঁদতে কাঁদতে স্যার প্রতি সিরিজে তিন বার করে শ্বাস নেন। “জীবন আমার আবার ধন্য করে দিলে তুমি, শিশিরকণা। আজ আমি পরিপূর্ণতা পেলাম। আজ আমি সব পেলাম। বুঝছো তো? বুঝছো তো, শিশিরকণা?”

আমি চুপ থাকি।

স্যার বলেন, “আমি সব পেলাম, সব। আমাকে শুধু এভাবে থাকতে দাও, শিশিরকণা। তোমার হাঁটুতে আমার কপাল রেখে একশ বছর আমাকে এভাবে থাকতে দাও। জীবনে আর কিছু চাই না। আর কিছু না। শুধু বাকি জীবনটা তোমার হাঁটুর উপর কাটাতে চাই। বুঝছো তো? আর কিছু চাই না।”

আমার বুকের পেশী আপনাআপনি একটা কাজ করে। ওদের সক্রিয়তায় সজোরে একটা নিঃশ্বাস আমার ভেতরে ঢুকতে থাকে। সেই নিঃশ্বাসের চাপে আমার গলা থেকে কটি পর্যন্ত অঞ্চল তিনশ ষাট ডিগ্রি ঘেরে স্ফীত হতে থাকে। স্থিতিশীলতা ফিরে আসার পর আমি সচেতনতার সাথে কোমলভাবে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাসের বাতাস বের করি। আমি ভাবি, হয়তো লোকটার বহুগামিতা বন্ধ হয়েও যেতে পারে। হয়তো সে এখনও প্রেমের সন্ধান পায়নি। যা পেয়েছে তা শুধু মুস্কের চাপের মুক্তি। আর তাতো কোনও মুক্তিই নয়।

কারণ ফেটে না যাওয়া পর্যন্ত এ আধার ভরতেই থাকবে। মস্তিষ্ক ক্ষয় হয়ে যাবে, হৃৎযন্ত্র ফুটো হয়ে যাবে, যকৃৎ ফাঁফা হবে, ফুসফুস শক্ত হয়ে যাবে, এই আধারের পুষ্টি জোগানোর জন্য। তবু দেহের কোনও অঙ্গ বিদ্রোহ করবে না। তা হলে তা মুক্তি হল কী করে? সাগরে ডোবা মানুষকে পেছন থেকে আসা এক ঢেউ উপরে তোলে, সাথে সাথে সামনে থেকে পেছন আসা আর এক ঢেউ টেনে নিচে নামায়। এ মুক্তি মুক্তি নয়। তবে যদি সে প্রেম পায়, যদি সে প্রেমের ধরন বুঝতে পারে, তার নেশা কেটেও যেতে পারে। হামিদ, করিম, বাহার, রমিজসহ পৃথিবীর যাবতীয় পুরুষ যা খুঁজে পায়নি, এই স্কলার তা নিজের মধ্যে খুঁজে পাবে। শর্তহীন ভালবাসা। আমি তাঁকে দেব। আমার সেই স্বাধীনতা আছে। তা ছাড়া আমি যা শুনেছি, তাতো নিজ চোখে দেখিনি। ফলে ওই সব সত্য তা-ই বা কেন আমি ধরে নিচ্ছি। আহা। বেচারা কেমন করে পোশা কুকুরের মতো আমার হাঁটুর উপর মাথা পেতে রেখেছে। আমি আমার ভেতর নারীর হৃদয় অনুভব করি। অঙ্কুরের আর্দ্রতায় হৃদয় সিক্ত হলে তা যুদ্ধ। হৃদয়ের আর্দ্রতায় অঙ্কুর সিক্ত হলে তা শান্তি। প্রেম। আমি বুকের গভীরে মায়ার ছোঁয়া অনুভব করি। আমি তার মাথার চুলে হাত ঢুকাই। রেশমি সাদা চুল। জ্ঞানী মানুষের কোমল মোলায়েম চুল। যেন সুখের পরশ। আমি নরম করে হাতটা উপর নীচ করি। তালুর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মোলায়মে রেশমি চুলের ছোঁয়া উপভোগ করি। তারপর চুলগুলি মুঠোজাত করি। মনে হয়, সম্ভব। এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে হয়তো খুনের অপরাধবোধ থেকে মুক্তিও দিয়ে দিতে পারেন। তানিয়া তা পারবে না। তানিয়াকে নয়। বরং এঁকেই নিজের কথা বলি।

আমি স্যারের মাথার চুল শক্ত করে ধরি। আর অনুভব করি আমি আমার জীবনের অবলম্বন আঁকড়ে ধরলাম। স্যারের কান্না বাড়ে। বুঝছো তো? বুঝছো তো? শিশু যেমন অপরাধ করে মায়ের পরশের অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্যের শেষ প্রান্তে এসে মায়ের পরশ পায় আর এক নিমেষে কেঁপে ওঠে কান্নার ধাক্কায়, তেমন করে স্যারের সারা দেহ ডুকরে ওঠে।

আমি যে একটা ইবলিশ তা নিজের কাছে স্বীকার করি। নইলে সেই অনুভূতিটাকে কেন এতক্ষণ চাপা রেখে দিয়েছি? কৃতজ্ঞতার অনুভূতি। আমি নিঃশ্বাস ফেলি। আমার ভেতরে কৃতজ্ঞতার ঢেউ উথলে ওঠে। ওঠে প্রেমের জোয়ার। জহিরের সাথে যখন পালিয়ে গিয়েছিলাম, তখন চাকরিটাতো এই চেয়ারম্যান স্যারের কারণেই থাকল। তখন উনি চেয়ারম্যান ছিলেন না। কিন্তু আমার চাকরি যাতে থাকে তার জন্য এমন কোনও ক্ষমতাবান ব্যক্তি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না, যাঁর কাছে তিনি যাননি। অন্তত সে জন্য হলেও ওনাকে আমার কিছু দেয়া দরকার। প্রেম যদি তা নাও হয়, উনি যেটার জন্য পাগল, যার নেশায় তিনি এমন পাগলামি করছেন, সেটাই দিয়ে দিই। তবে মনে হচ্ছে, ওনার সাথে প্রেমও সম্ভব। সন্দেহ করা আমার রোগ হয়ে গেছে, আমি নিজেকে ভর্ৎসনা করি। প্রেম সম্ভব। প্রেম সম্ভব! আমি নিজেকে বলি। এই জ্ঞানী বৃদ্ধের সাথে। নাকের অদৃশ্য রশির জায়গায় আমার শাড়ির আঁচল দিয়ে আমি তাকে বাঁধব। এখান থেকে শুরু হোক। শুরু হোক আমার জীবনের আর একটা পরিবর্তন। সব সময় তা খারাপ হবে কেন? আর হলেই বা কি? কী আর এমন হবে। পরীক্ষাটা করে দেখা যাক। আমি ঝুঁকতে থাকি। দুই বাহু ধরে স্যারকে আমার বুকে তুলে নেয়ার জন্য।

উনিশ

শপাত! শপাত! শপাত!

আমি লাফ দিয়ে উঠি। এ কী দেখি? কী শুনি? সত্যিই কি চেয়ারম্যান স্যারের পিঠে জুতার বাড়ি? আর আমিই বা কেন চিত হয়ে পড়ে গেলাম না? আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। আমি পড়িনি কারণ আমি আর এক যুগ আগের শিশিরকণা নই। শপাত! শপাত! চেয়ারম্যান স্যারের পিঠে আবার জুতার বাড়ি। আর আমার

নাকে জুতার ধূলা। চিত হয়ে না পড়লেও আমার পিঠ সোজা হয়ে গেছে, আর বাড়িগুলি যেন আমার পিঠে পড়েছে। টেকসই চামড়ার জুতার বাড়ি।

পঞ্চম বাড়ির পর চেয়ারম্যান স্যার পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে যান। আমি না চাইলেও আমার মাথা পেছনে চলে যায়। না হলে আমাদের মাথায় ঠোকাঠুকি হত। আমার বাহু দু'টি, যারা স্যারকে টেনে তোলার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, তারা আমার পাশে শক্ত হয়ে খাড়া হয়ে থাকে।

আমার মন তখনও নরম। চেয়ারম্যান স্যারের অবস্থা খারাপ। তাঁর চোখের লাল কাতর দৃষ্টি চাচ্ছে আমি তাঁকে বাঁচাই। আমি চেয়ারম্যান স্যার আর আক্রমণকারিনীর মাঝে গিয়ে দাঁড়াই। মন চাচ্ছিল তার চুল টেনে ধরি যে স্যারকে মেরেছে। আমার সামনে আমার মানুষকে আক্রমণ করে, পৃথিবীতে এমন সাহস আমি কোনও মেয়েকেই দিতে রাজি নই। কিন্তু আক্রমণকারিনীর মুখোমুখি হয়ে আমি থমকে যাই। তার চোখ দুটি হিংস্র, কিন্তু তার চেয়েও বেশি করুণ। এ দুটি ছলছল করে অশ্রু ঝরানো চোখ নয়; এ দুটি হল অশ্রুতে টলমল করা দিনের পর দিন নির্ঘুম থাকা চোখ। আমি চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হই। কারণ এর মধ্যে আমার হৃৎপিণ্ড এক ঝলক বিষের হিমে জমে গেছে। না হলে আক্রমণকারিনীকে আমি আমার ঘরের মেঝেতে ফেলে জবাই না করলেও তার বুকের উপর বসে তার গাল দুটিকে এলোপাতাড়ি চড়াতাম। আমি তাকে উলঙ্গ করে আমার এই আটতলার জানালা থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতাম। অত বড় রিস্ক না নিলেও সিঁড়ি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিচে নামিয়ে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দশজনের সামনে তার পাছায় জোরে জোরে লাথি মারতাম। আমি এ সব কিছুই করছি না। হৃৎপিণ্ডের শীতলতায় আমার পুরো বুক হিম হয়ে আমাকে স্তব্ধ করে রেখেছে।

আমি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি স্যারের মুখ বাঁকা হয়ে আছে। আর গালের রং এমন ফ্যাকাশে। যেন ওনার গাল থেকে *ওখাস পেরেনেস* হার্বাল ক্রিম এর সব জাদু চলে গেছে। গালের চামড়ার এই দশা কোনও তরুণীর কাছে সাপের চামড়া বলে মনে হবে। আমার বুক চিপে ওঠে। বাস্তব বুদ্ধিতে। ষাট কি বাষট্টি বছর যদিও এমন কোনও বয়স না। তারপরও। হার্ট অ্যাটাক করতে পারে। অথবা ব্রেইন স্ট্রোক। কিছু হলে ঝামেলায় পড়ব আমি আর আমার মা। তারপর আমার ভাই এসে আমাকে আচ্ছামতো গালি দেবে। সেই গালি যা শুনলে বাংলাদেশের শত ভাগ মেয়ের শরীরের সব চুল খাড়া হয়ে যাবে। শুধু এই শিশিরকণার ছাড়া। তাই বলে যে আমি তাকে ভয় পাই না, তা নয়। বরং ভাইয়ের তৈরি সিনেমাকে আমি যত ভয় পাই, জগতে আর কিছুকে তত ভয় পাই না।

স্যারকে যে পেটাল তার নাম তানিয়া, যার কথা এর মধ্যে আমি স্মরণ করেছি, যাকে আমার গোপনীয়তার অংশিদার করব বলে ভেবেছিলাম। তানিয়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক। তানিয়াকে ফোন করে স্যারের খবর দিয়ে আমি কি ভুল করেছিলাম? না ঠিক করেছিলাম? তানিয়া যখন বৈঠকখানায় প্রবেশ করেছে তখন আমি স্যারের রেশমি চুলের পরশে বুঁদ হয়ে ছিলাম। এতটাই যে জুতার বাড়ি স্যারের পিঠে পড়ার আগে আমি তানিয়ার আগমন খেয়ালই করতে পারিনি।

আমি বাস্তবতায় নেমে এসেছি। আমি বিব্রত। তানিয়া ফুঁসছে।

"বলেছিলি না, তালাক দিবি? দিয়েছিলি?" তানিয়া খেঁকিয়ে ওঠে।

"আমি একটু বসি, শিশিরকণা," স্যার বলেন।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিই। স্যার টলতে টলতে কয়েক কদম এগিয়ে একটা ছোট সোফার দুই হাতলে দুই হাত ঠেকিয়ে নিজেকে ছেড়ে দেন। তারপর যা দেখা যায়: স্যার এক অবোধ নিষ্পাপ শিশুর মতো ভয়ে গুটিশুটি হয়ে মাথা নিচু করে বসে আছেন।

"একটু পানি খাব," স্যার বলেন।

আমি পানি আনার জন্য উদ্যত। তানিয়া আমার দুই হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে আমাকে দাঁড় করায়। আমি নড়ার সাহস পাই না।

"পানি না, পানি না, আমি ওরে–" তানিয়ার গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজ বের হয়। আসলে ওটা একটা এক নিনাদী স্বরের কান্না। "শিশির আপা গেলাশ আনেন। আর কোন বাথরুমে যাব সেটা বলেন।"

আমি একটু শ্বাস ফেলি। আমার বুকের হিম একটু একটু ছেড়ে যাচ্ছে। আমি তানিয়াকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। তারপরও আমি নিরপেক্ষ হওয়ার কথা ভাবি। "থাক, তানিয়া," আমি বলি।

"কেন? কেন? কেন থাকবে, শিশির আপা?"

"তুই একটু ঠাণ্ডা হ, বোন," আমি বলি।

তানিয়া আমাকে পাত্তা দেয় না। সে জুতা নিয়ে স্যারের দিকে তেড়ে যায়।

"বলেছিলি তালাক দিবি। দিয়েছিলি? দিলি তো না-ই। আবার আমাকে নিয়ে গেলি মুক্তি ক্লিনিকে।"

মুক্তি ক্লিনিক। শব্দ দুটি শোনার পর আমার বুকের পেশিগুলি আবার আমাকে খিঁচে ধরে। আমার সুস্থ-সবল দুই বৃক্কে অদৃশ্য পাথর গড়াগড়ি খায়। আমার সহনশীল উদর নিজে নিজে কেঁদে ওঠে। তার ঝাঁকুনিতে আমি কেঁপে উঠি। হামিদের সাথে আমার জীবনে যা কিছু হয়েছে তার কোনও কিছুকেই আমি শ্লিলতাহানী বলে মনে করি না। কিন্তু মুক্তি ক্লিনিক আমাকে যা করেছে তাকে আমি শ্লিলতাহানী মনে করি। আমার সামনে কেউ মুক্তি ক্লিনিকের কথা এ ভাবে উচ্চারণ করবে, আমি তা ভাবতে পারিনি। আমি বুঝতে পারি মুক্তি ক্লিনিকে গিয়ে তানিয়া মুক্ত হয়েছে। আমি জানি না মুক্তি ক্লিনিক সম্পর্কে আমার যে অনুভব তানিয়ারও সে অনুভব কি না। তবু তানিয়ার জন্য আমার মায়া হয়।

তানিয়া বসে থাকা স্যারকে দুই ঘা দেয়, দুই বাহুর উপর। তানিয়া যে ছাত্ররাজনীতি করত তা আমার মনে আসে। তানিয়া পিস্তল, বন্দুক, হকি-স্টিক চালানোয় দক্ষ। হাতাহাতি আর চুলাচুলি ওর জন্য দুধভাত। এখন দেখি জুতা চালানোতেও ওর প্রতিভা কোনও অংশে কম নয়। ছাত্রনেতাদের আমরা বিশ্বাস করি না। ওরা মানুষকে যেমন আদর করে, আবার পছন্দ না হলে তেমনি মারে। আমার আশঙ্কা হয়। আমি লাফ দিয়ে গিয়ে আবার ওদের মাঝে দাঁড়াই। তানিয়া আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। তারপর স্যারের চুল ধরে হেঁচকা টান দেয়।

"ঝুঁটি কই তোর, ঝুঁটি?"

আমার চোখ পড়ে সাদা ব্যান্ডটার উপর, যা স্যারের আগের বসার সোফায় শুয়ে আছে। আমার লজ্জা লাগে। আমিই স্যারের ঝুঁটিটা খুলে দিয়েছিলাম, চুলগুলো ভাল করে ধরব বলে।

তানিয়া স্যারের চুলে হেঁচকা টান দিতে থাকে। "কত মেয়েকে তুই মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে গেছিস? আমি পাঁচ জনের কথা জানি। এখন আমি ওদের এক এক করে ফোন করব। সবাই এখানে আসবে। শিশির আপা জগ আনেন, নইলে বালতি। এই শুয়োরের বাচ্চা পানি খাবে তো? আমি ওরে ছয় মাগির পানি খাওয়াব। দেখি কত পানি তুই খেতে পারিস? শিশির আপা আপনি দিবেন? দেন না এক মগ? তা হলে সাত জনের হয়।"

তানিয়া প্রকারান্তরে আমাকে তা-ই সম্বোধন করল যা আমার ভাই আমার উপর গালি আকারে বর্ষণ করে আসছে, গত দশ বছর ধরে। আমার হাতটা সয়ংক্রিয়ভাবে আমার বুকে একটা চাপ দেয়। কিসের জন্য কে জানে? তানিয়ার দস্যিপনার ইতিহাস না থাকলেও ওর এই আক্রোশকে আমি ভয় পেতাম। বুঝতে পারি না কী করে ওর এই আক্রোশ আমি থামাব। আমি তানিয়াকে চেপে ধরি। তানিয়া ওর ডান কাঁধ দিয়ে আমাকে ধাক্কা দেয়। আমি ওকে আরও জোরে চেপে ধরি। তানিয়া এবার সরাসরি আমাকে গালিটা দেয়। ভাইয়ের গালি শুনলে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। কিন্তু তানিয়ার উপর আমি রাগ করতে পারি না। ধ্বংস হতে কিংবা মুক্তি পেতে, যে কারণেই একটা মেয়ে মুক্তি ক্লিনিকে যাক না কেন, আমি কোনও দিন তার উপর চূড়ান্ত রাগ করতে পারব না। তা ছাড়া তানিয়ার অবস্থা খারাপ। ওর সারা শরীর কাঁপছিল আর এখন ওর চোখ অশ্রু ছেড়ে দিয়েছে। যেন তা শ্রাবণ মাসের বিরতিহীন বৃষ্টি, যখন বন্যার ভয় কেটে যায়। আমি তানিয়ার হাত থেকে ওর ফোনটা ছাড়াতে চাই। আর তানিয়া বোঝে এটা দুই সতীনের ধস্তাধস্তি নয়।

“মাপ করেন, শিশির আপা,” তানিয়া বলে। “জানি না আমি কেন আপনাকে গালি দিলাম। আমার মাথা ঠিক নাই। এই বদমাশ আমাকে পাগল করে ছেড়ে দিয়েছে। এ পর্যন্ত চার বার আমাকে মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে গেছে।”

চার বার! বলে কী? তানিয়া যে এমন ফলবতী বৃক্ষ তা ওর কাটখোট্টা শরীর দেখে বোঝার উপায় নাই। ওর বুক প্রায় অদৃশ্য। লিভারে মেদ জমলে যে কোনও বেটার বুকও এর চেয়ে বড় হয়। তানিয়ার নিখাদ নারী স্বাস্থ্যের এমন অব্যবস্থাপনা আমার করুণা জাগায়। মনে পড়ে রনির কথা।

রনি আপা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। মায়া খালার মেয়ে রনি। বিয়ের সাড়ে তিন বছরের মাথার ঘটনা। স্বামী-শ্বশুর–শাশুড়ি-ননদের কটূক্তি। রনি আপার বাচ্চা কেন হয় না? পৃথিবীতে সবার বাচ্চা হয়। রনি আপার বাচ্চা হয় না কেন? আল্লাহর গজব। অলক্ষ্মী। রনি আপার পূর্বপুরুষরা মানুষের হক মেরেছে। ডাকাতি করেছে। খুন করেছে। জীবন্ত মেয়ে-শিশুকে কবর দিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর গজবে রনি আপা দুনিয়াতে নিষ্ফলা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। কে বলেছে রনি আপাকে ওই অবস্থায় শ্বশুর বাড়ি ঢুকতে? রনি আপা সেই বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই বাড়িটার উপর একের পর এক আল্লাহর গজব পড়েছে। ব্যবসা মার খেয়েছে। মেঘনায় লঞ্চ ডুবেছে। এক মিশরীয় দালাল পঁচিশ কোটি টাকার চিংড়ি মেরে দিয়েছে। একটা চা বাগান পুড়ে গেছে। আরও অনেক ক্ষতি হয়েছে, যা রনি আপা জানে না বা তাকে জানানো হয়নি। রনি আপা এক দিন ওর শাশুড়িকে বলে:

“আম্মা, তিন মাস ধরে আমার... বন্ধ,” শাড়ির কুচির দিকে তাকিয়ে রনি আপা বলে আর এক সেকেন্ড পরে ওয়াক ওয়াক করতে করতে দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘরের বেসিনের উপর মাথা ঠেলে ধরে।

সাথে সাথে রনি আপার শ্বশুরবাড়ি বদলে যায়। রনি আপার স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ সবাই লাইন ধরে এসে একে একে রনি আপাকে তাদের বুকে চেপে ধরে। রনি আপার বমি বের না হলেও ওর শাশুড়ি নিজের হাতে সেই বেসিন ধোয়। রনি আপার ননদও হাত লাগায়। তারা সবাই রনি আপার কাছে ক্ষমা চায়। তারা কত নীচ, কত হীন। সত্য কথা হল রনি আপা সে বাড়িতে প্রবেশ করার পর তাদের জীবন বদলে গেছে। রনি আপার পূর্বপুরুষরা নবি-রাসুল ছিল। তাদের দোয়ায় রনি আপার শশুর বাড়ির ব্যবসার অনেক উন্নতি হয়েছে। লঞ্চের বহর বেড়ে চারটার জায়গায় ষোলোটা হয়েছে। মিশরীয় ব্যবসায়ী চিংড়ির অর্ডার চারগুণ বাড়িয়েছে। সবচেয়ে বেশি মুনাফা এসেছে চায়ের ব্যবসা থেকে। রনি আপার শাশুড়ি চোখের জল ফেলে। ননদ খুশিতে নাচে। শ্বশুর বনানী থেকে দুই মন প্রিমিয়ামের মিষ্টি কিনে নিয়ে আসে। শাশুড়ি সন্তানের অনাগত সন্তানের জন্য সোয়েটার আর কানটুপি বানানোর জন্য বহু বছর আলমারিতে তুলে রাখা উল আর

কাঁটা বের করে আনে। আমাদের দুলাভাই রনি আপাকে শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে এক ঘন্টায় এক জনমের প্রেম দেয়।

সে রাতে রনি আপা গোপনে ষোলো তলা বাড়িটার ছাদে যায়। এক সময় সে পর্বতারোহন করেছে। ষোলো তলা বাড়ির ছাদের রেলিং বেয়ে উপরে উঠা ওর জন্য কঠিন কোনও বিষয় ছিল না। রনি আপা ছাদ থেকে লাফ দেয়। রনি আপা লং জাম্প দিয়েছিল। তাই সে রাস্তার অন্যপাশে চলে যায়। মাটিতে পড়ার আগে রনি আপা দলাপাকানো তারের গোছায় আছাড় খায় আর কোমরের কাছে দুই ভাগ হয়ে যায়।

কীভাবে আমি এত কথা জানি? কারণ রনি আপা সব লিখে গেছে। স্বামীর প্রেম পাওয়ার পর সেই প্রেমের আমেজ নীরবে অনুভব করার জন্য রনি আপা দুই ঘন্টা একান্তে থাকতে চায়। দুলাভাই রনি আপাকে দরজার বাইরে থেকে পাহারা দিয়েছে যাতে সেই দুই ঘন্টা রনি আপা একান্তে থাকতে পারে। ওই সময় রনি আপা তার সুইসাইড নোট লেখে। রনি আপা তার মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করে। রনি আপা লিখে যায় তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। পুলিশ যদি তার লাশ নিয়ে শ্বশুর বাড়ির মানুষদের হয়রানি করে তবে রনি আপার আত্মা কষ্ট পাবে। সুইসাইড নোট ছিল তেইশ পৃষ্ঠা। মায়া খালার কাছে তা এখনও আছে। নিজের ব্যর্থতার শাস্তি রনি আপা মেনে নিয়েছে। উপরন্তু স্বামীকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছে। এই জন্য যে রনি আপা বেঁচে থাকতে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেনি। তেইশ পৃষ্ঠার অর্ধেক জুড়ে ছিল ওর শ্বশুর বাড়ির সবাই কত ভাল সেসব কথা। যা অনুর্বর ছিল তা উর্বর হলে রনি আপা যে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মেয়ে হত, সে কথাও রনি আপা লিখে গেছে।

একটা সন্তানের অভাবে রনি আপা আত্মহত্যা করল। একটা সন্তানের ধ্বংসে আমার অনিবর্তনীয় শ্লিলতাহানী ঘটল। একটা সন্তান ধ্বংস হলে তানিয়া মুক্তি পায়। যেন সন্তান আমাদের ব্যবসা। আমরা সন্তানের অনুমতি নিই না। যেমন পানের দোকানদার পানের অনুমতি না নিয়ে পান বেচে আর খদ্দের তা তার মুখে চিবিয়ে আবর্জনা বানায়।

নিজের অজান্তে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি আর ফুঁসতে থাকা তানিয়াকে দেখি। ভাবি এক একটা সন্তান পেটে এলে তানিয় কেমন করে আঁতকে ওঠে। তানিয়া অনুর্বর হলে ওর কত সুবিধা হত। অথচ তানিয় কত উর্বর। দুনিয়াতে এটা নাকি অনাচারের শাস্তি, আমাকে একটা মেয়ে বলেছে। তার তিন সন্তানের মধ্যে শেষটা কীভাবে এল সে নিজেই জানে না। ওর বিশ্বাস অনেক সময় বাতাসের বাড়িতেও নাকি একটা মেয়ে গর্ভ ধারণ করে ফেলতে পারে। মেয়েটা আমাকে প্রভাবিত করে। হামিদের সাথে বিয়ের পর আমিও বিশ্বাস করতে থাকি নখ, নিষ্ঠীবন, নিঃশ্বাস এ-সবও নারীকে গর্ভবতী করতে পারে। অথচ যার একটা সন্তান দরকার তার ক্ষেত্রে কোনও কিছুই কাজে লাগে না। রনি আপা একটা পেলেই বর্তে যেত। তানিয়া একটা রাখতে চাইলে ওর দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন প্রেমে হাবুডুবু খেলে তানিয়া চার চার বার মুক্তি ক্লিনিকে যায়? তানিয়ার ফোনটা আমার কাছে। মনে হল দিই ওর ফোন ওকে ফিরিয়ে। ও ডেকে আনুক আমাদের স্যারের অন্য প্রেমিকাদের। লাল বড় বালতিটা এনে রাখি। আমিও আট গেলাশ পানি খেয়ে ওদের দলে যুক্ত হই। আল্লাহ আমাকে শক্তিশালী কলিজা দিয়েছে, দিয়েছে শক্তিশালী স্নায়ুতন্ত্র। তাদের কাজে লাগাই। পনেরো মিনিটের মধ্যে এক জগের জোগান দেই। তানিয়ার মনে অনেক কষ্ট।

কিন্তু না। জমিজিরাত টাকাপয়সার হিসাব আমার মাথায়। আমি ঝামেলা চাই না। নিজের বাড়িতে এই হট্টগোল। আখেরে আমাকেই সামলাতে হবে।

“তানিয়া, আমি কিছু মনে করিনি,” আমি বলি। “আম্মার কথা চিন্তা কর। তুই তো সব জানিস।”

“তা হলে এটা করতে দেন।” এই বলে তানিয়া ওর জুতাটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে ওটা দিয়ে স্যারের ডান গালে মারে। তানিয়া এখন আরও দ্রুত কাঁপছে কিন্তু স্যারকে সে জোরে জোরে মারে। প্রতিটা আঘাতের সাথে স্যারের মুখ বিকৃত হয় আর দাঁত দেখা যায়।

“তানিয়া, বয়স্ক মানুষ! যদি কিছু হয়ে যায়?”

“কিচ্ছু হবে না।” তানিয়া তার জুতা দিয়ে স্যারের মাথায় মারে।

“থাম্ তানিয়া!” আমি বলি।

“কেন থামব?”

“তোর এত মার উনি নিতে পারছেন না!”

“ওওওও! তাআআআআই! কে শুইছে অর নিচে? আপনে না আমি? আপনে অর শক্তির খবর রাখেন? না কি এর মধ্যে আপনেও শুইছেন?”

আমার গায়ে কাঁটা দেয়। সে কাঁটা রোমাঞ্চের কাঁটাও হতে পারে। যে রোমাঞ্চ আমি ভেবেছিলাম আমি পেতে যাচ্ছিলাম। সে বুঝি আর হল না। আমার রক্তে আর একটা বিরক্তি-উৎপাদক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। আমার আর অনুশোচনাও হচ্ছে না। আমার দরকার ঝামেলা মুক্ত হওয়া। তানিয়ার শরীর আরও বেশি কাঁপে। তানিয়া হয় তো এবার নিজেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। আমি দোটানায় পড়ি। স্যারকে জুতা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ মারলে যদি তানিয়া শান্ত হয় আমার তাতে কোনও আপত্তি নাই। সমস্যা হল স্যারের অবস্থা। যদি কিছু এখানে হয়ে যায়। মনে মনে আল্লাহকে বলি, কিছু যেন না হয়। আর অপেক্ষা করি তানিয়ার ঝাল মেটার জন্য।

তানিয়া স্যারকে আরও জোরে জোরে মারে। আমি স্যারের দিকে তাকানোর সাহস পাই না। জুতার প্রতি বাড়ির সাথে ঠাশ্ ঠাশ্ শব্দ হয় আর আমার বুক কাঁপে। আমি কঠোর হওয়ার কথা ভাবি। নইলে মনে হয় এই মেয়ে স্যারকে মেরে ফেলবে। আমি কোমরে শাড়ির আঁচল বাঁধি। আঁচল গুঁজতে গিয়ে নখ লেগে মনে হয় পেটের চামড়া কেটে গেছে। সে দিকে খেয়াল করার সুযোগ নাই। আমার নিঃশ্বাস অগভীর হয়। তারপরও আমি শক্ত হই। ঠাশ্, ঠাশ্, ঠাশ্। জুতার বাড়ির বৃষ্টি অবিরাম ঝরে চলে।

এরপর মনে হয় তানিয়া ক্লান্ত হয়ে গেছে। সে জুতাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জানালার কাচে গিয়ে ওটা বাড়ি খায় তারপর মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে। আমি বেকুবের মতো তানিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি কিছু বোঝার আগে তানিয়া স্যারের গলার দিকে ঝাঁপ দেয়। আমি ভাবি তানিয়া চূড়ান্তভাবে পাগল হয়ে গেছে। ভাবতে গিয়ে আমার গর্দান শক্ত হয়ে যায়। আমি হাঁপাই আর খাবি খাই।

তানিয়া স্যারের গলা আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে। “আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, জান্। তুমি অন্য মেয়েদের কাছে গেলে কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়। কেন তুমি আমার কষ্ট বোঝো না?”

তানিয়ার পিঠের ভঙ্গি বলে তানিয়ার বুকের ভেতর আটলান্টিকের ঢেউ বাড়ি দিচ্ছে। এমন কান্না জীবনে দেখিনি। কী পরিমান অশ্রু ঝরছে তা দেখার জন্য আমি দুই কদম এগিয়ে যাই। দেখি তানিয়ার গাল বেয়ে অনেক অশ্রু ঝরছে, যা একবারও থামেনি। কোথা থেকে এত পানি আসছে শুধু আল্লাহ বলতে পারবে। তানিয়ার অশ্রু স্যারের লাল সোয়েটারের বুক কালো করে ফেলেছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে স্যারের মুখ দেখি। সে মুখ থেকে ত্রাসের চিহ্ন চলে গেছে। স্যারের গালে উত্তর-প্রদেশীয় আর্য আভার উদয় হচ্ছে।

“তোমাকে ডিভোর্স দিতে হবে না, জান্‌,” তানিয় কাঁদতে কাঁদতে বলে। “আর কক্‌খনও আমি তোমাকে তাকে ডিভোর্স দিতে বলব না। তোমাকে আমি আর জ্বালাব না। আর যত বার দরকার হয় তত বার আমি মুক্তি ক্লিনিকে যাব। তবু তুমি শুধু আমার থাকো, জান্‌। তুমি অন্য কোনও মেয়ের কাছে আর যেয়ো না। প্লিজ, কথা দাও। শিশির আপার পেছনে তুমি কেন ঘোরো?। ঘুরতে ঘুরতে মরে গেলেও তুমি শিশির আপাকে পাবে না। শিশির আপা পুরুষ মানুষ খায়। তুমি তাকে চেনো না। সে মুখ দেখায়, বুক দেখায়, পাছা দেখায়, রান দেখায়, আর রানের কাছে গেলে পাছায় মারে লাত্থি। আর আমি? নিজেকে খুলে দিয়েছি তোমার জন্য। যখনই তুমি চেয়েছ আমি চিত শুয়ে গেছি। যাইনি? তুমিই বলো। আমি কি বলিনি, কত খাবে খাও? বলিনি, বলো? তবু তুমি অন্য মেয়েদের কাছে যাও। কেমন লাগে আমার? তুমি আর কখনও কোনও মেয়ের কাছে যাবে না। আমাকে শুধু এই কথা দাও, জান্‌। প্লিজ, জান্‌। তুমি শুধু আমাকে এই কথা দাও।”

আমার দীর্ঘশ্বাস ঝরে। স্যার তা খেয়াল করেন। কিন্তু তানিয়ার কানে তা যায় না।

“আমার ভুল হয়ে গেছে, তানিয়া,” স্যার বলেন। “আমাকে তুমি মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর কোনও নারী কখনও ছিল না। ভবিষ্যতেও থাকবে না। আমি শিশিরকণার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। শৈশবে মায়ের আদর পাইনি, বুঝছো তো? বাবা আমার চোখের সামনে মাকে গুলি করে মেরে ফেলল। দাঁতের ব্যাথায় চেঁচানোর জন্য। আমি মাতৃহীন ছিলাম, তানিয়া, মাতৃহীন, বুঝছো তো? তবে আমি তোমাকে এখন কথা দিচ্ছি। মায়ের আদর নেয়ার জন্যও আর কারও কাছে যাব না। আমাকে বিশ্বাস করো, তানিয়া। আমার প্রিয়তমা, তুমি যে ভাবে চাও, সে ভাবে আমি চলব। আর কখনও কারও কাছে যাব না। বুঝছো তো?”

“সত্যি বলছ? সত্যি বলছ?”

“প্রতিজ্ঞা করছি, প্রিয়তমা। তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রতিজ্ঞা করছি।”

“কসম খাও।”

“খোদার কসম, তানিয়া।”

“আবার কসম খাও।”

“তুমিই বলো কার নামে কসম খাব?”

“বড় পিরের নামে কসম খাও। আর খাজা মইনুদ্দিন চিশতির নামে।”

“বড় পিরের কসম। কসম বাবা খাজা মইনুদ্দিন চিশতির। রানী আমার, আমাকে শেষ বারের মতো ক্ষমা করে দাও। আর বিশ্বাস করো।”

“কীভাবে তোমাকে আমি বিশ্বাস করব?” তানিয়া আবার ফুঁপিয়ে উঠে।

একটা বিধ্বংসী ঝড়ের পর রোদ উঠল, চারিদিকে লোকজন ঘরের বার হল। সব কিছু শান্ত। সবার মনে আনন্দ। দুর্যোগ কেটে গেছে। এমন সময় যদি হঠাৎ আর একটা ঝড় এসে সব কিছু লন্ডভণ্ড করে দিতে থাকে, তখন কেমন লাগে? তানিয়ার কান্নায় আমার তেমনটাই লাগছিল।

“আমাকে বিশ্বাস করো, তানিয়া। বুঝছো তো? বুঝছো তো?” স্যার তানিয়ার পিঠে মৃদু চাপড় দেন, আর জোরে জোরে আহাজারি করেন। “বুঝছো তো? বুঝছো তো?”

“আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।”

“বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করো। দেখো আমি আর কখনও বিগড়ে যাই কি না। অন্তত ততক্ষণ আমাকে বিশ্বাস করো।”

উঁউঁউঁ। উঁউঁউঁ। উঁউঁউ। তানিয় একটানা কেঁদে যায়।

“বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করো। রানী আমার। বুঝছো তো, আমার প্রিয়তমা?”

“আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না!” তানিয়া চেঁচিয়ে ওঠে।

আমার বুক কাঁপে। এই রামছাগল মেয়ে না আবার জুতা হাতে নেয়। হাতের কাছে এখনও একটা জুতা আছে।

“বিশ্বাস করো। বিশ্বাস করো,” স্যার অনুনয় করেন।

আবার দীর্ঘ কান্না। এবং এক সময় তা মৃদু হতে থাকে। তারপর তানিয়া শান্তভাবে বলে, “আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। আর কখনও করতে পারবও না। তারপরও আমি তোমাকে মিছামিছি বিশ্বাস করতে চাই। আমি নিজেকে ফাঁকি দেব। আমি যাতে তা করতে পারি তার জন্য তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমাকে তুমি চুমু দাও।”

বলিহারি। তানিয়াকে আমার ভাই কী ডাকত, তা জানার ইচ্ছা হয়। এর মধ্যে স্যার আর তানিয়ার আলিঙ্গন শুরু হয়ে গেছে। তানিয়ার পক্ষ থেকে। তেইশ বছর আগে করিম চাচার স্ত্রী যেমন আমার আর আব্বার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে করিম চাচাকে মেরেছেন, আজ তানিয়া তেমন করে আমার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে স্যারের বড় মুখের মধ্যে ওর ছোট মুখটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তানিয়ার ঠোঁটের আন্দোলনের কারণে স্যারের ঠোঁটের প্রকৃত গতিবিধি কিছু বোঝা যাচ্ছে না। যত বার তানিয়া স্যারের বুকে নিজের বুক চেপে ধরে, তত বার স্যারের পিঠ শক্ত হয়ে যায়। আমার মনে হল দুই জনকেই গুলি করে মারি। আব্বার রেখে যাওয়া পিস্তল দুইটা নিয়ে বড় জ্বালায় আছি। ওগুলোর লাইসেন্স নবায়ন করতে প্রতি বছর আমাকে একবার রংপুর যেতে হয়। অন্তত একটার আজ একটু সদ্ব্যবহার করি। ওদেরকে গুলি করার জন্য আমার হাত নিশপিশ করে।

কিন্তু কিছু করা হয়নি। তানিয়া আর স্যার একে অন্যের হাত ধরে আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। স্যারের আঙ্গুলগুলোর দিকে আমার চোখ পড়ে ছিল। স্যারই তানিয়ার হাতটাকে নিজের হাতের মুঠোয় ধরে ছিল। মনে হল স্যার কোনো নারীর হাত নয়, বরং একটা পান্নস সাপের মাথা ধরে আছে।

আমি জানতাম এ অবস্থা বেশিক্ষণ থাকবে না। মার হজম করতে করতে স্যারের মুষ্কজোড়া চুপসে যাওয়াই স্বাভাবিক। এবং হয়েছেও তা-ই। কিন্তু তাদের জাগরণ শুরু হতেও সময় লাগেনি। মারের জ্বালাতো কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। যে বাড়িগুলি সবচেয়ে বেশি ঘা দিয়েছে, সেগুলোর ব্যথা সারতে হয়তো আরও দশ মিনিট লাগবে। তখন স্যারের বিলাতি বেগুনযুগল আবার রসে ভরতে থাকবে। সেই রস স্যারের রক্তে আবার ঝড় তুলবে। হয়তো এর মধ্যে সে ঝড়ের পূর্বের পাগল হাওয়ার নাচন শুরু হয়ে গেছে। সেই চাপ এক সময় স্যারের হাত উষ্ণ করবে, কোমল করবে, আর তখন স্যারের মুঠোয় থাকা তানিয়ার হাতে জ্বর আসবে, তানিয়া ঘামতে থাকবে। এক সময় এমনকি ওরা জোরে জোরে পা চালাবে। স্যারের চোখ রাস্তার দুইপাশে একখানা উপযুক্ত স্থাপনা খুঁজে বেড়াবে। স্যার তাঁর গাড়ির স্পিড বাড়াবেন, বার বার ভেঁপু বাজাবেন, যাতে তাড়াতাড়ি কাছাকাছি কোনো হোটেলে পৌঁছা যায়। স্যার রিক্সা আর বাসগুলিকে গালি দিবেন। কেন তারা তাঁর পথে বাধা হয়ে আছে? মাশাল্লাহ! স্যার যে সাবধান মানুষ। পাঁচ-ছয় তলা সিঁড়ি বেয়ে উঠলেও

গোড়ালি মচকানোর সম্ভাবনা নাই। আমার বরং তানিয়াকে নিয়ে চিন্তা। কিন্তু তখন রক্তের ঝড় স্যারের দেহে শক্তি তৈরি করবে, আর সেই শক্তি দিয়ে স্যার তানিয়াকে তুলার মতো উড়িয়ে নিবেন। তানিয়া ভাববে আহা আমার মনের মানুষ আমাকে কত ভালবাসে। তারপর দশ মিনিটের মধ্যে যা ঘটবে তা মাস তিনেক পর তানিয়াকে আবার মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে যাবে। তানিয়াতো বলেই দিয়েছে, দরকার হলে ওই গণিকা হাজার বার মুক্তি ক্লিনিকে যাবে। আহা রে মেয়ে। কত অবুঝ তুই?

ওরা চলে যায়। আমি ড্রয়িং রুমে এসে ওদের নাটকের জায়গায়টায় চোখ রাখি। এক সময় পাগল এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমার মাথাটা খুব ভারী লাগছিল। পাগলের আলিঙ্গন এমন সময় পেলাম যখন আমি এর জন্য চরম বুভূক্ষু ছিলাম। পাগল এখন আর কাউকে আলিঙ্গন করে না, কখনও করবেও না। পাগল সবার মধ্যে জীবাণু দেখে। শুধু আমার মধ্যে দেখে না।

আমি মাথাটা পাগলের ঘাড়ে রেখে নিজেকে পাগলের বুকে সঁপে দিই। পাগল আমাকে তার বুকের মধ্যে পিষে ফেলে। ওসিডি হলে মানুষের সব কিছু বেড়ে যায়। শক্তিও যে বাড়ে, পাগল তার প্রমাণ। নিজেকে এমন নিরাপদ আর কিছুতে লাগে না যেমনটা লাগে পাগলের এই আলিঙ্গনে। শুধু পাগলের আলিঙ্গনে সুখে থাকব এই ভাবে যদি জীবনটাকে আমি সাজাতাম, তবে আমি সুখী হতাম। আর এভাবে সুখী হওয়াও যায়। চূড়ান্ত সুখী হওয়া যায়। এই জ্ঞানটা আমার এখন হয়েছে, কিন্তু তখন ছিল না। পাগলের এই বোধ আজও তৈরি হয়নি।

পাগলের প্রেমে আমার চোখে পানি চলে আসে। আমি ভাবি জীবনটাকে নতুন করে যাপন করব। সেখানে সুখী হওয়ার জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ছাড়া শুধু আর একটা চাহিদা থাকবে। পাগলের আলিঙ্গন। যেই ভাবি, সেই কাজ। এক লহমায় আমার পেশীগুলির যেখানে যত গিট তৈরি হয়ে ছিল সব খুলে যায়। দেহে চরম সুখের অনুভূতি জাগে। যেখানে তানিয়া বা চেয়ারম্যান স্যারের রক্তের ঝড়ের কোনও স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। “মা, মা,” আমি বলি। “তোমাকে ছাড়া আর কিছু চাই না।”

“না, না।” পাগল আমাকে ঝাঁকি দেয়। পাগল আমাকে বুঝতে পারে না। আমি যে পাগল ছাড়া আর কিছু চাই না এবং আমার এই চাওয়া যে খাঁটি আর পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে আমি যে এইমাত্র নির্লোভ হলাম, পাগল তা বুঝতে পারল না। কখনও হয়তো তা বিশ্বাসও করবে না, আমি ভাবি। না করুক। আমি তো করি। আমি পাগলকে আঁকড়ে ধরি। আসলেই জীবনে আমার আর কোনও চাওয়া ছিল না।

আমি পাগলের কিছুই পাইনি, শুধু গায়ের রং ছাড়া। আমার চোখ, নাক, কান, চিবুক সব আব্বার। আমাকে দেখে যে আমার চেয়ারম্যান স্যারের মতো পুরুষদের রক্তে জাভা সাগরের সাইক্লোন ওঠে তার কারণ নাকি আমার মুখ। পাগল আমার চেয়ে দশগুণ সুন্দরী। চুয়ান্ন বছর বয়স। তারপরও পাগলকে এখনও অনায়াসে বিয়ে দেয়া যায়। পুরুষরা যা দেখে দাঁড়িয়ে যায় তার সবই পাগলের এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। তানিয়া আমার পাঁচ বছরের ছোট। কিন্তু ওর শরীরের যা অবস্থা, তা মোটেই পাগলের সাথে তুলনীয় নয়। আব্বা আমার ছিল। আমার জন্য কবরে গেল। এখন এই পাগল ছাড়া আমার কেউ নাই। এক সময় ভাইটাও ছিল। কিন্তু সে এখন আমার আতঙ্ক। আমি পাগলকে কিছুতেই হারাতে চাই না। পাগলকে আমি ভাল করব। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি। কঠিন প্রতিজ্ঞা।

“তুইতো কিছুই পেলি না, কণামণি।” পাগল কাঁদে।

“আর কিছু পেতে চাই না, মা,” আমি বলি। “শুধু তোমাকে চাই।”

পৃথিবীর বা অন্য জগতের কোনও কিছুর বিনিময়ে আমি পাগলের সেই আলিঙ্গন থেকে বের হয়ে আসতে চাইনি।

কুড়ি

এরপর আমার আসল পরীক্ষা শুরু হয়। পাগল এক বালতি পানি আর একটা নতুন তোয়ালা এনে দরজার সামনে বসে যায়। পাগল পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে ফ্লোর মোছে। এর পাঁচ মিনিট পর আর দরজার সামনে যাওয়ার কোনও উপায় থাকে না। প্রথম ঝগড়াটা হয় আমার চপ্পল-জোড়া নিয়ে। আমার চপ্পল পাগলের মোছা ফ্লোর ময়লা করে। সেই চপ্পল যেই চপ্পল সোনিয়া আর চেয়ারম্যান স্যারের বহন করা জীবাণু ধরে রেখেছে। পাগল বকাবকি করার সময় আমাকে কোনও মায়া করে না। অক্টোবর থেকে মার্চ, বছরের এই ছয় মাস, আমি চপ্পল ছাড়া খালি ফ্লোরের উপর হাঁটতে পারি না। আমি আসলে বছরের কোনও সময়ই খালি ফ্লোরে খালি পায়ে হাঁটতে পারি না। পাগলকে ছয় মাসের ছাড় দিয়েছি অনেক কষ্টে। পাগলের ভয়ে আমি আলমারি থেকে নতুন এক জোড়া চপ্পল বের করি। প্লাস্টিকের পেকেটে মোড়ানো সাদা চপ্পল। আমি মোড়ক উন্মোচন করে তাদের তলা দেখি। শুধু পরিষ্কারই নয়, মনে হলো চপ্পল দু'টি জীবাণুমুক্তও করা আছে। আমি নতুন চপ্পল পায়ে দিয়ে পাগলের কাণ্ড দেখতে যাই। নতুন চপ্পল পরেছি বলে পাগলের মেজাজ মোটেও ঠাণ্ডা হয় না। আর আমিও অবাক হই। আমি দেখি নতুন চপ্পলও ভেজা ফ্লোরে ময়লা দাগ ফেলে। এত দিন জানতাম এই অনাচার শুধু পুরান চপ্পল করে।

বাধ্য হয়ে আমি পা থেকে চপ্পল দু'টি ছুঁড়ে ফেলে দিই। এবার আমার পায়ের তালুর ঘষায় মেঝের উপর আরও বেশি দাগ পড়ে। তা দেখে আমি আঁতকে উঠি। এক মুহূর্তের জন্য গলা শুকিয়ে যায়, আমি গলার পেশি আগুপিছু করে আর্দ্রতা খুঁজি, কারণ ঢোক গিলতে পারছিলাম না। পাগল সেটাই খেয়াল করে, এবং আরও বেশি ক্ষেপে যায়। পাগল আমাকে বান্দি বলে গালি দেয়। আমি পাশ ফিরে দেখি সোনিয়ার মুখ শুকিয়ে গেছে, তারপরও সোনিয়া পাগলের সাথে তর্ক করে। বলে, “নানি, আপনেতো পাগল।”

পাগল তোয়ালাটা বালতিতে রেখে উঠে এসে সোনিয়াকে কষে একটা চড় মারে।

সোনিয়ার কালো গালে পাগলের আঙ্গুলের ছাপ কাঁঠাল পাতার মতো মনে হয়। সোনিয়ার মুখ ভার হয়। “থাকমু না। আমি থাকমু না। এইহানে সব পাগল,” সোনিয়া গাল ডলতে ডলতে বলে।

আমি চোখ রাঙিয়ে সোনিয়াকে চুপ করাই। কিন্তু আমি পাগলের অনাচার থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারি না। পাগল এর মধ্যে পুরো ফ্লোর ভিজিয়ে ফেলেছে। বালতির পানি বদলেছে দুই বার। বাথরুমে যায় আবার নতুন পানি নিয়ে আসে। আবার ফ্লোর মোছে। মুছতে মুছতে ড্রয়িং রুমের দিকে যায়।

“মা, সরো। আমি আর সোনিয়া মুছব,” আমি বলি।

পাগল সরে না। আমি জানি সে সরবে না। আমাদের ঘর মোছায় সে তৃপ্তি পায় না। অথচ আমরাই কেবল ঘর পরিষ্কার করতে পারি। পাগল তা ভেজানো ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। আফরোজ ম্যাডামের প্রভাব আমাদের উপর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আফরোজ ম্যাডামের ঘটনার পরও পাগলকে আমি অনেক দিন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। তারপর কী করে যেন তা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ থাকে পাগলের চিকিৎসা। দীর্ঘদিন। এর জন্য পাগল নিজেই দায়ী। পাগল বড় ডাক্তার ছিল বলে পরিচিত কোনও ডাক্তার পাগলের চিকিৎসা করতে চাইত না। তারা হাসাহাসি করত। কী যে বলেন ম্যাডাম? আমি করব আপনার চিকিৎসা? বেয়াদবি হবে, ম্যাডাম, মাফ করবেন। ম্যাডাম, পৃথিবীর কোন রোগ নাই, আপনি যা ভাল করতে পারেন না? কোন ওষুধ

নাই, যেটার নাম আপনি জানেন না? আমি হামিদকে যে রাতে খুন করি, তার আগের দিনও পাগল হাসপাতালে গিয়েছে। সেখানে সে মাসে তিন লাখ টাকা বেতন পেত। সপ্তায় চল্লিশ ঘন্টা কাজ করত। হাসপাতালের টাকা উঠত না। তবু পাগলের নামের জন্য তারা পাগলকে এত বেশি বেতনে চাকরিতে রাখত। হামিদের খুনের পরের দিন থেকে পাগল আর চাকরিতে যায়নি।

ডাক্তাররা পাগলকে এটা সেটা বলে বিদায় করে। তবু আমি চেষ্টা করেছি। অনেক সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছি। পাগল প্রায়ই তাদের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে যেত। নারী ডাক্তারের কাছেতো যাওয়াই যেত না। পাগল সবাইকে আফরোজ ম্যাডাম বলে সন্দেহ করত। এক বার এক সাইকেথ্যারাপিস্টের চুল টেনে পাগল তাকে চেয়ার থেকে ফেলে দিয়েছিল। এরপর আমি পাগলকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া বন্ধ করি।

সপ্তাহখানেক আগে পাগলের হাত-পা ধরে তাকে আবার ওষুধ খাওয়াতে রাজি করিয়েছি। করাতে পেরেছি কারণ এবারকার ডাক্তার পাগলের বন্ধু। জরিনা খালা। উনি বহু বছর জার্মানিতে ছিলেন। পাগল যে এত সহজে ওষুধ খেতে রাজি হবে, তা আমি ভাবতে পারিনি। জরিনা খালা দিনে তিনটা করে ক্যাপসুল খেতে বলেছেন। নিজে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছেন। পাগল গত আট দিন ধরে নিজে মনে করে নিয়ম করে ওষুধ খাচ্ছিল। অনেক ভাল বোধ করছিল। রাতে ভাল ঘুমাচ্ছিল। আমি অনেক আশাবাদি হয়ে উঠেছিলাম। এর মধ্যে এ রকম ঘর মোছা! এটা পাগল অনেক দিন ধরে করেনি। অন্তত গত আট দিনতো নয়ই। আমি জরিনা খালাকে ফোন করি। জরিনা খালা বলেন, করতে দে। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা মোটেও স্বাভাবিক মনে হয় না। “খালা, একটু আসেন না!” আমি বলি।

উনি রাজি হন।

“কী করছ, মা?” আমি দরজার দিকে দৌড়াই।

পাগল আমার দিকে এক বার তাকায়। তার কালো চোখে অপরাধবোধের কুয়াশা। বোধ হয় আমাকে গালি দেয়ার জন্য। ঘর মুছতে গিয়ে পাগলের ম্যাক্সির পাড় থেকে কোমর পর্যন্ত ভিজে গেছে। পাগল দরজার কাছ থেকে শুরু করে সারা ড্রয়িং রুম একবার মুছে শেষ করে দ্বিতীয় বার একই কাজ আবার শুরু করেছে।

এক ঘন্টা পর জরিনা খালা হেলতে দুলতে আমাদের বাসায় ঢোকেন। আমার মনে হল জরিনা খালা পাঁচ মিনিটের পথ পাড়ি দিতে পাঁচ ঘন্টা লাগালেন। তখন পাগলের ম্যাক্সি ভিজে শরীরে ল্যাপ্টে আছে। জরিনা খালা তার কালো বোরকার মাথাটা খুলে হাতে নেন। জরিনা খালাকে দেখে পাগল আমার দিকে তাকায়। পাগলের চোখ দু’টি জ্বলে ওঠে। আমি কোনও মতে আগুনের শিখা সহ্য করি। জরিনা খালা তা পারেন না। ওনার মুখ সাদা হয়ে যায়। পাগল পাকঘরে গিয়ে সেখান থেকে দা নিয়ে আসে। এটা পাগলের পুরনো অভ্যাস। দা নিয়ে কোপাতে আসা। জরিনা খালা দা দেখে কাঁপতে থাকেন। আমি বলতে চাই, খালা আপনি ভয় পাবেন না, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কথা সরে না। জরিনা খালাকে অবশ্য পাগলের চিকিৎসা শুরুর প্রথম দিনই জানানো হয়েছিল, কোনও কিছু হলেই পাগল দা নিয়ে বের হয়ে আসে। তার মাথায় খুন চেপে যায়। “কণামণি না থামালে আমি এর মধ্যে অনেক খুনখারাবি করে ফেলতাম,” পাগল নিজেই জরিনা খালাকে বলেছিল। সে জন্য কি না, জানি না, জরিনা খালারা অবস্থা কাহিল। ওনার হাত থেকে ব্যাগটা আর বোরকার ঘোমটাটা পড়ে যায়।

তারপর বোধ হয় জরিনা খালার একটু শরম হয়। ওনার মনে হয়, উনি পাগলের ডাক্তার। ওনার অন্তত সাহস দেখানোর দরকার। উনি ব্যাগটা তুলে একটু হাসির চেষ্টা করেন। “মরিয়ম, কী হয়েছে তোর?” উনি পাগলের দিকে তাকিয়ে বলেন। কিন্তু আমি দেখি জরিনা খালার কাঁধ দুটি কাঁপছে।

“কিছু হয়নি, কাছে আয়,” পাগল বলে।

জরিনা খালা নড়েন না। পাগলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। আমার বুক ধুকধুক করে। যদি সত্যি সত্যি জরিনা খালাকে কোপ দেয়। আজকের মতো এত খারাপ অবস্থা আগে কখনও পাগলের মধ্যে দেখিনি।

“তোকে কে ডেকে এনেছে?” পাগল প্রশ্ন করে।

“শিশির আমাকে ফোন করে আসতে বলল,” জরিনা খালা বলেন।

“আয়। কাছে আয়,” পাগল বলে।

আমি দেখি জরিনা খালার হাঁটু দু’টি কাঁপছে।

আশঙ্কা আমার উপর চেপে বসে। আমি পাগলকে ঝাপটে ধরি। পাগল আমাকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে জরিনা খালার দিকে তেড়ে যায়। জরিনা খালার তখন অবস্থা এমন যেন উনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। আমি আবার পাগলরে হাত টেনে ধরি। এবার আর পাগল আমাকে ফেলতে পারে না। আমি পাগলের ডান হাত পাকড়াও করি, যে হাত দিয়ে পাগল দা কব্জা করে রেখেছে। জরিনা খালা বুঝলেন আমি পাগলকে আটকে ফেলেছি। তিনি কিছুটা স্বাভাবিক হন। এক মুহূর্তের জন্য বুঝি ওনার কাঁপুনি বন্ধ হয়েছে। তারপর সে কি দৌড় জরিনা খালার। দৌড়ে তিনি বারান্দায় চলে যান। লিফটের বাটন চাপেন। অস্থিরতায় ওনার পা দু’টি জগিং করতে থাকে। তবে তিনি পাঁচ সেকেন্ডের বেশি লিফটের সামনে দাঁড়ালেন না। এর মধ্যে পাগল আমার হাত থেকে আবার ফসকে যায়। আর দা নিয়ে জরিনা খালার দিকে ছোটে। জরিনা খালা আর্তচিৎকার করে সিঁড়ির দিকে দৌড় দেন। মনে হল নীচ পর্যন্ত যেতে যেতে খালার চিৎকারে সব ফ্ল্যাট থেকেই লোক বের হয়ে এসেছে। আমি দোয়া পড়তে থাকি। ম্যানেজার মাজহার পর্যন্ত পৌঁছলে জরিনা খালার সমস্যা ঘুচবে। মাজহার সব জানেন। উনি খালার বহির্গমনের জন্য নিরপাদ আর কোলাহলমুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

জরিনা খালার নাগাল না পেয়ে পাগল আরও চেতে যায়। তার গালের এমন লাল, এমন উন্মত্ত চোখমুখ, আগে কখনও দেখিনি। এমন জোরে সে আমার দিকে তেড়ে আসে, আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আর ঘরের ভেতরের দিকে পালাতে থাকি। পাগল আমাকে বাড়ির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত তাড়া করে। আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না পাগল আমাকে এ ভাবে তাড়া করবে। পাগল এবার আমাকে আরও খারাপ একটা গালি দেয়। এটা সেই গালি যা আমার ভাই আমাকে দেয়। পাগল বলে আমার ভাই সঠিক। আমি সত্যিই আমার ভাই যা বলে তা-ই। আজ পাগল আমার জন্যেই পাগল। রমনা পার্কের ভেতরে ঝোপের আড়ালে এক পা তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি গর্ভ ধারণ করেছি। এক ভূমিহীন গৃহহীন পানদোকানদারের ছেলের কাছে। সে আমাকে জঙ্গল ছাড়া আর কোথায় নিয়ে যেতে পারত? সেই জন্য সে গর্ভ মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে সাফ করা হয়েছে। যদি আমি খাটের উপর শুয়ে শুয়ে গর্ভ ধারণ করতাম, তবে আমাদের জীবনে এতগুলি বিপদ নেমে আসত না। হামিদের কী খাটের অভাব ছিল? বাংলাদেশে, সিঙ্গাপুরে, ডুবাইতে, ব্যাংককে, নিউইয়র্কে, টরন্টোতে হামিদের খাট ছিল। আমি খাট ছেড়ে জঙ্গল বেছে নিয়েছি। আমাকে বিপদমুক্ত করার জন্য সবাই মিলে জঙ্গলচারিকে জঙ্গলের নিচে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে জন্য আমি খাটের মালিককে মেরে ফেললাম। এমন কাজ কে করতে পারে? পাগল বলে, এখন থেকে সে আমার ভাইয়ের দলে। সে আমার কল্লা কাটবে।

আমার মাথা গরম হয়ে যায়। মনে হয় পাগলই জহিরকে হত্যা করিয়েছে। যদিও আমি জানি তা সত্য নয়। তারপরও আমার সব রাগ গিয়ে পাগলের উপর পড়ে। পাগল আগে কখনও আমাকে এভাবে অপমান

করেনি। এ কথাতো সত্যি যে আমার জন্য আমার ভাইটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমার আব্বা কবরে গেছে, পাঁচ হাজার কোটি টাকার সম্পদ রেখে হামিদ ভূত হয়ে গেছে। আমার জন্য পাগলের আজ এই দশা। ঠাণ্ডা মাথায় এক বার ভাবি। ভাবি, দেই সুযোগ, পাগলকে। আমাকে কেটে ফেলতে। তারপর তার ঝাল মিটুক। আমি মরেই যাই। পাগল শান্তি পাক। আর আমিও পাগলের পাগলামি থেকে মুক্তি পাই। আমি একটা খুন করেছি। আজ নিজে খুন হয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করি। মরতেতো হবেই। যত নিজেকে এ কথা বলি তত নিজের খুন হওয়াকে তামাশা মনে হয়। জীবনের সবচেয়ে ঘোর দুর্দশার দিনেও আমার কখনও এক মুহূর্তের জন্যও আত্মহত্যা করার কথা মাথায় আসেনি। আসলে আমি আত্মহত্যাকারিদের দলে নই। তাই বুঝি প্রাণ এত সহজে আমার থেকে পালাতে চায় না। বরং পাগলের দায়ের কোপ থেকে আমি নিজেই পালাই।

পাগল আমাকে কোপাবে না, আমার এমনটাই ভাবার কথা ছিল। কিন্তু পাগলের উন্মত্ততায় আমি তা ভাবতে পারিনি। যদি না কোপায়, তা হলে সে আমাকে এমন ভাবে তাড়া করছে কেন? আসলে আমি কিছুতেই পাগলকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হল এত বছর ধরে তাকে পাগল ডাকার গজবটা আজ আমার উপর পড়ল। আর এ জন্যই সে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে। চার হাজার বর্গফুটের বাসা। পাগলের ত্রাসে পালাতে গিয়ে আমার কাছে মনে হয় ওটা মুরগরি খোঁয়াড়। আমি এমাথা থেকে ওমাথা দৌড়াই। সোনিয়া নিশ্চয়ই কোনও বাথরুমে ঢুকে আছে। ড্রয়িং রুমের কোনায় পাগল আমাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল। আমার বুক ব্রেইনডেড মানুষের মতো উঠানামা করে। নিঃশ্বাস যেন কণ্ঠনালীর মাঝে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে, আর নিচে নামে না। আমার শক্তি কমে আসে। ভাবি কী হবে পাগল যদি দা'টা আমার দিকে ছুঁড়ে মারে? সেটা যাতে সে না করে, তার জন্য আমি কয়েকটা পৃথিবী বিধাতার কাছে বন্ধক রাখি। আমি খুঁজতে থাকি কোনও একটা ঘর। যেখানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেব। পেয়েও যাই আমার সামনে একটা। সেটা আমার ঘর। আমি সেটাতে ঢুকি। কিন্তু দরজা বন্ধ করার সুযোগ পাই না। পাগলও আমার পিছে পিছে রুমে ঢোকে। আমি ভাবলাম শেষ। আর পারব না। আত্মসমর্পণের চিন্তা মাথায় আসে। জীবনের সব পীড়ন এক সাথে চোখের সামনে ভেসে আসে। ভাবি শিশিরকণাতো মৃত্যুর আগেই মরে গেছে। কোনও আধ্যাত্মিক মৃত্যু নয়। রাস্তার পাশে পড়ে মরে থাকার মতো। তারপরও শেষ চেষ্টা হিসাবে আমি একটা বালিশ তুলে নিই। পাগলের মুখোমুখি হই। যেই গালি দিয়ে পাগল আমাকে তাড়া করছে সেই গালি আমি পাগলকে দিই। বালিশটাকে বর্মের মতো বুকের সামনে ধরে আমি পাগলকে বলি, "...আর আসবি না। শুধু একটা সুযোগ পাই। আমিই তোকে জবাই করব।" পাগল আমার পেছনে চলে যায়। পিছন থেকে আমাকে আঘাত হানার জন্য। কারণ আমার পেছনে বালিশের কোনও বর্ম নাই। আমি উল্টা দিকে ঘুরি পেছনে চলতে চলতে দরজার কাছে সরে আসি। দরজার বার হয়ে আবার আমি দৌড়াতে থাকি। এবার ড্রয়িং রুমের দিকে। ড্রয়িং রুমের বাইরে পাগল পা পিছলে পড়ে যায়। আমি পেছন ফিরে দেখি পাগল মাটিতে লুটানো। দা'টা ছিটকে পড়ে আছে। পাগলের ভাগ্য ভাল। অন্ধ অস্ত্রটা তার তলপেটে ঢুকে যায়নি। কিন্তু আমার রগ চটে গেছে।

আমি পাগলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি। তার চুল মুঠি করে ধরে তাকে টেনে মাটিতে বসাই। তারপর এক হাতে চুল ধরে আর এক হাতের তালুতে যত শক্তি ছিল তত শক্তি দিয়ে তার গালে আঘাত করি। তার গালের উপর আমার আঙ্গুলের সংখ্যা গুনি। চারটা আঙ্গুল ছাপ ফেলেছে। বৃদ্ধাঙ্গুল তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমার রাগ একটুও কমেনি। আমি হাত বদল করি। চুলগুলো ডান হাতে নিই। আর বাম হাত দিয়ে এবার পাগলের ডান গালে মারি। খেয়াল রাখি যাতে পাঁচ আঙ্গুলেরই দাগ পড়ে। তারপর পাগলের চোখে চোখ রেখে পাগলকে আমার যন্ত্রণার আগুনে বিদ্ধ করি। গলা ফাটিয়ে পাগলকে জিজ্ঞেস করি, "...আমাকে দোষ দিস কেন? আমি তোকে দুনিয়াতে এনেছি? না তুই আমাকে দুনিয়াতে এনেছিস? বাচ্চা তোদের কাছে বোয়াল মাছের ডিম। পানিতে ছেড়ে দিবি আর বড় হয়ে যাবে। তুই যদি পাগল তাইলে তুই বিয়াইলি কেন? এই দায়

তোর না আমার?” যেমন আমি চেঁচাই তেমন আমি পাগলের চুলে হেঁচকা টান মারি। আমি নিয়ন্ত্রণহারা। চুলের মুঠি ধরে আমি পাগলকে মেঝেতে ফেলে চেপে ধরি।

“এখন আমি তোকে জবাই করব।”

আমার রাগ না পড়ে বাড়তে থাকে। মনে হয় আমিও পাগল হয়ে গেছি। আর এ দিকে পাগল কোনও প্রতিবাদ করে না। আমি আমার ধ্বংসের জন্য পাগলকে দায়ী করি। আমার আব্বাকে দায়ী করি। আব্বা থাকলে এখন আব্বাকেও জবাই করতাম। আব্বা আর এই মহিলা দু'জনেই আমার মূল ঘাতক। এরা আমাকে না মারলেও আমার জীবন মেরে ফেলেছে। আর সত্য হোক মিথ্যা হোক, পাগলতো সগর্বে ঘোষণা দিয়েছে, জহিরের তিরোধানের কাজ তারা সম্মিলিতভাবে করেছে। পৃথিবীর যাবতীয় ভয় দেখিয়ে আমাকে মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে গেছে। আমি যেতে চাইনি। তখন এই মাগী, আর আমার বাপ নামের কলংক, ভাই নামের পশু, ডবকা পাছার হামিদ, মুরগি ছানা আমিন, শুকনা খালের কইতরি, সবাই আমাকে চেপে ধরে। সবাই আমার কাছে কাবিন চায়। ওই প্রথম আমার তেজে পানি পড়ে। তারা বলে, কাবিন নাই, ভাল কথা, সাক্ষী আছে? কাবিন নাই। সাক্ষী নাই। আমার গর্ভে জারজ। তারা বলে, এটা কিছুতেই রাখা যাবে না। যখন পাড়াপ্রতিবেশী ছি ছি করবে, তখন এই আবেগ থাকবে না। জীবন হবে জাহান্নাম। তখন গলা টিপে মারা ভাল, না এখন খালাস করা ভাল, যেই রকম খালাস দিনে দশ হাজার হয় সারা দেশে, যেই খালাসে কোনও ঝুঁকি নাই, পরে আফসোসের সম্ভাবনা নাই। তারা বার বার বলে, কাবিন নাই, সাক্ষী নাই। রাশেদ পিস্তল নিয়ে বের হয়ে আসে। জহিরকে সে খুঁজে বের করবেই। যে জারজ তার বোনের পেটে জারজ রেখে পালিয়ে যায়, তাকে খুন না করে রাশেদ বাড়ি ফিরবে না। “অন্তত একটা কাবিন রেখে পালাত,” মুরগি ছানা আমিন বলে। “আরতো কিছুর দরকার ছিল না। একটা কাবিন, একটা কলমা।” “অথবা এক জন সাক্ষী, যে আমাদের কাছে এসে বলত, কবুল বলা হয়েছে,” শুকনা খালের কইতরি যোগ করে। অথচ কাবিন নাই, সাক্ষী নাই। কলমা না পড়ে। ছি ছি ছি। শেষ পর্যন্ত নাস্তিকের কাছে ধরা। ওরা বলতে থাকে। ওরা তখন সবাই ফেরেশতা। আমার চূড়ান্ত বিশ্বাস তখন হয়ে গেছে, জহির পালিয়েছে, আমাকে গাভিন করে। আর ওরা আমার এই অসহায় বিশ্বাসের এই সুযোগটা নিল। আমি মুক্তি ক্লিনিকে যেতে রাজি হলাম ওদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে। কাবিন কই? সাক্ষী কই? এখন পাগল আমার কব্জায়। আমার কানে প্রশ্ন দুইটা বাজে। কাবিন কই? সাক্ষী কই? আমি পাগলকে দুইটা চড় মারি। সে তখন আমাকে মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে গিয়েছিল। মুক্তি ক্লিনিক থেকে ফেরার পর, আমি যাতে সেরে উঠি, সেই জন্য সে আমাকে পৃথিবীর আনাচে কানাচে নিয়ে গেছে। এখন আমার অপরাধবোধ হয়। কিন্তু তখন পিরামিড দেখে, আক্রোপলিস দেখে, কলোসিয়াম দেখে, কোস্টা ব্রাভা দেখে, নায়াগ্রা দেখে, গ্রান্ড ক্যানিয়ন দেখে, আমি আমার আসল জীবনের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তখন নকল জীবনের স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি হামিদের ডবকা পাছার। এখন যখন পাগল আমার কব্জায়, আমার মনে আসে, এরা আমার অর্ধেককে রাস্তায় গুলি করে মেরেছে। আর অর্ধেককে মুক্তি ক্লিনিকে অঙ্কুরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এরা সবাই কি তা করেনি? কোনও না কোনও ভাবে? সত্য কোনটা? মিথ্যা কোনটা? ভাবতে ভাবতে আমার রাগ আরও চড়ে যায়। আমি পাগলের বুকের উপর উঠে বসি। পাগল শুয়ে থাকে। নড়ে না। চড়ে না। আমাকে দেখে। অপরাধীর দৃষ্টিতে। শিশুর দৃষ্টিতে। না আছে তাতে ভয়। না আছে তাতে বেঁচে থাকার আকুতি। আমি দা'টা তুলে আনি। পাগলকে কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিই। তারপর যা হবে তার কথা পরে ভাবব। আগে এই আপদকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিই। এক ঢিলে দুই পাখি। আপদ বিদায়। প্রতিশোধ উসুল।

“দোয়া পড়্‌,” আমি বলি। “কলমা মুখে আন্‌।”

পাগল আমার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করে না।

“খালাম্মা! আপনি এইডা কী করতাছেন?”

সোনিয়া আমার পেছনে। সোনিয়ার কারণেই আমার সচেতনতা ফিরে আসে। আমার মনে আসে আমিতো পাগলকে মাফ করে দিয়েছিলাম। সোনিয়া পেছনে এসে না দাঁড়ালে আর ওই কথা না বললে কী হত শুধু আল্লাহ জানেন। তবে পাগলকে আমি পুরোপুরি ছেড়ে দিতেও নারাজ। আমি দায়ের পিঠ দিয়ে পাগলের গলায় পোঁচ দিই। “আর পাগলামি করবি?” আমি চেঁচিয়ে বলি। “আর পাগলামি করবি?”

পাগল কিছু বলে না। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। আমি আর এগুতে পারি না। আমি পাগলের উপর থেকে উঠে যাই। আমার হাতপা ম্যালেরিয়া রোগির মতো কাঁপে।

পাগল উঠে গিয়ে তার ঘরে চলে যায়। তারপর বাকি দিনটা আমার পাগলের মতো কাটে।

অনেক বারই পাগলকে পাগল ভেবে নিজে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু হতে পারিনি। ছাদে উঠার আগে পাগলকে যে দশায় দেখেছি তা মনে আসে আর আমার চোখ ভিজে যায়। গাল ভিজিয়ে চোখের জল পড়ে। দশ বছর ধরে এভাবে তাকে দেখে এসেছি। তবে আজকের অবস্থা ভিন্ন। আজ সে একবারও বাথরুমে যায়নি। তার গায়ে এখনও সেই কালো ম্যাক্সি। এটা অভাবনীয়। কোনও দিন ঘর মুছতে মুছতে সে তিন বার ম্যাক্সি বদলায়। আর মোছার পর তিন ঘন্টা বাথরুমে কাটায়। আজ যেন তার ওসিডি ভাল হয়ে গেছে।

আমি মীমাংসিত বিষয়গুলি ভাবি। যে খুন মাথায় চেপেছিল তার জন্য অনুতাপ হয়। পাগলের বিষণ্নতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আগে কখনও এমন করে ভাবিনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম আমার বিষণ্নতার যত্ন নেয়ার দায়িত্ব তার। তার বিষণ্নতার যত্ন নেয়ার দায়িত্ব আমার নয়। আমি ভুল ছিলাম। আমার কান্না থামে না। অনুশোচনায় বুক ভেঙ্গে যেতে চায়। আর অশ্রুর গতিও বাড়ে। সোনিয়া আমাকে দেখে।

“খালাম্মা, নানির জন্য কাঁইদতাছুন?”

“হুঁ।”

অনেক্ষণ কাঁদলাম। নিজে নিজে। ঘন্টা দুয়েক আমরা ছাদে আছি। এই সময় ওরা থেমে থেমে আতশবাজি জ্বালিয়েছে, গান শুনিয়েছে অবিরাম, আর অনেক হৈ-হল্লা করেছে। শেষের দিকে মিনিট দশেক অবিরাম আতশবাজির স্ফূরণে আকাশ আলোকিত হয়। সোনিয়াকে বলি, অনেকে হয়েছে, চল। ঘরে যাই। প্রতিজ্ঞা করি ঘরে গিয়ে পাগলের পায়ের উপর পড়ব। যতক্ষণ না সে আমাকে ক্ষমা করছে ততক্ষণ তার পা ছাড়ব না। তারপর নিজ হাতে তাকে গোসল করাব। নিজ হাতে খাওয়াব। গত দশ বছর আমাকে সে দিয়েছে। এখন থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাকে দেব।

আমার দেয়ার আকুতি বাড়ে। আমি জোরে জোরে পা ফেলি। আমার প্রতি পদেক্ষপ দ্রুততর, দীর্ঘতর হয়।

একুশ

আমরা সিঁড়ি বেয়ে বারন্দাতে নামি। ড্যাব করে একটা আওয়াজ হয়। একটা ফুলের টব উল্টে গেছে। প্লাস্টিকের হালকা টব। মাটি আছে ওটার ভেতরে। সোনিয়া বসে গাছটার গোড়া ধরে ওটাকে টেনে তোলে। বারান্দার ছাদের বাইরের দিকের দুই কোনায় দুটি বাল্ব আছে। তাদের ঢাকনাগুলি বেশ পুরনো আর ওদের

উপর অনেক ধুলাও জমেছে। আবছা আলো। এখানে আমি গোটা বিশেক গোলাপের চারা লাগিয়েছিলাম। তারপর ওরা অযত্নে বেড়ে উঠেছে। আমি বা পাগল তার কোনও খোঁজ রাখিনি। সোনিয়া রেখেছে। কৃষিতে সোনিয়ার সহজাত হাত। সেই হাত গোলাপের গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সোনিয়া পড়ে যাওয়া গোলাপ গাছটাকে মায়ার চোখে দেখে। যে গাছের তিন ডালের একটা ভেঙ্গে গেছে। ভাঙ্গা ডালে একটা ফুল, শানের উপর লুটিয়ে আছে।

এ ভাবে পড়ে যাওয়া। আমি জানি পতনের কষ্ট। জীবনে আমি এ ফুলটির মতই ফুটেছিলাম। আবার এর মতই আমার পতন হয়। তবে সে পতন কোনও শান বাঁধানো মেঝের উপর নয়। একেবারে গিরিখাতের তলায়। অত্যুচ্চ পর্বতের শ্যাওলা-পিচ্ছিল-পাথর গা বেয়ে মাইলের পর মাইল নিচের দিকে এক গড়ানিতে এক নিমেষে পড়ে যাওয়া। সে এমন এক জায়গা যেখানে পৃথিবীর কোনও মানুষের পা কখনও পড়েনি আর পড়বেও না। যেখানে হাত বাড়াতে চাইলে পর্বতের পিঠের ভেজা কালো পাথরের পিচ্ছিল ছোঁয়া। যেখানে সূর্যের আলো কোনও দিন পৌঁছেনি আর পৌঁছবেও না। পতনের পর মাথা তুলে উপরের দিকে যত তাকিয়েছি তত শুধু আমাকে ঘিরে থাকা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের অন্ধকার অনুভব করেছি। আর কোনও কিছু দেখিনি। এমন সুড়ঙ্গের তলানিতে পড়ে গেলে কত কিছুর ভয়। পচে মরার ভয়। সাপখোপের ভয়। ভয়ের কষ্ট। নিশ্বাস নিতে না পারার কষ্ট।

আমার দম বন্ধ হয়ে মরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমি মরিনি। বরং মেরেছি। আর তা ভুল ছিল। কারণ, চোখের বদলে চোখ, ধর্মের এই আইন এখন আর অনুমোদন করে না কেউ। মানুষ মানেই কপটতা। ধর্মকে রাজনীতির কালো হাতিয়ার হিসাবে সব সময় সে মানুষের পেছনে তাক করে রাখবে, আবার ধর্মের আইন, চোখের বদলে চোখ, অমান্য করে সে সভ্যতর আইন প্রণয়ন করবে। এটা যে ধর্মের ঈশ্বরের সাথে ঠাট্টা করা তা সে স্বীকার করবে না। তবে ধর্মগুলো নিয়ে মানুষে বেসামাল অবস্থা আমি বুঝি। ধর্মের আইনে হত্যা করেও আমার সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। আমার বাইরের জগৎ থেকে আমাকে ঘিরে থাকা হিমালয় কিংবা আল্পস কিংবা কিলিমানজারোর গুহার দেয়ালগুলি উধাও হয়ে গেল বটে। আবার সাথে সাথে আরও বেশি দুর্ভেদ্য আরও বেশি অলঙ্ঘ্য আরও বেশি অবর্ণনীয় এক গুহা চেপে বসে আমার মনের ভেতরে, যা আমি কোনও দিন সরাতে পারব না। আর তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমার আব্বা মরে যায়ে, ভাই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। শুধু পাগল যায় না। সে আমাকে বুকের মধ্যে আগলে রাখে। আমরণ আমার সঙ্গে থাকার প্রতিজ্ঞা করে।

আমার আরও একটা পতনের কথা মনে আসে। এক কড়ই গাছের পতন। আমার কানের লতি গরম হয়। মগজ টগবগ করে। আমি নিজেকে থামাতে পারি না। ফুলটাকে টেনে তুলে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরি। আঙ্গুল আর হাতের তালুতে কাঁটার খোঁচা খাই। আমি ফুলটাকে পিষে ফেলতে উদ্যত। কিছু রস এর মধ্যে বের হয়ে গেছে। হাতের তালু স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। মনে হয় গোলাপের নির্যাস নয়, জাঁতা দিয়ে পিষে আমার নিজের প্রাণ বের করে নিচ্ছি। নিজের প্রাণ বের করে নেয়া! শিশিরকণা সব কিছু করেছে। এ কাজটা করেনি। মনে প্রশ্ন। আধা সচেতনতায়। ফুলটাকে ধ্বংস করা কি ঠিক হচ্ছে? উত্তর আসে, ঠিক হচ্ছে না।

আমার কাঁপন বন্ধ হয়। দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়। বুকে ঠাণ্ডা ঘামের অনুভব পাই। কানে কিসের বাতাস লাগে। বেশ আরামদায়ক। আমি আমার সালোয়ারের কোমলতা অনুভব করি। জামার হাতায় কিছু মুক্তার কাজ রয়েছে। ত্বকে মুক্তার ঘষা খাই। সেই সাথে যেই সুতা দিয়ে মুক্তাকে জামার হাতায় আর গলায় লাগানো হয়েছে সেই সুতার ছোঁয়া। নাকে গোলাপের গন্ধ। শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এমনভাবে অনুভব করি মনে হয় আমার বোধি লাভ হতে চলেছে। বুদ্ধের দেহের শান্তি আমার দেহে প্রবেশ করছে। কামনাবিহীন শান্তি। যা স্থায়ী। যা এক ঘষাতে জ্বলেও উঠে না, আবার এক ফুরুতে নিভেও যায় না। আমি জীবনে অনেক

বেঠিক কাজ করেছি। এখন থেকে সব সঠিক কাজ করব। আমি আর কিছু ধ্বংস করব না। সব কিছু নির্মাণ করব। অন্ধকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দেব। ক্ষুধার্তকে আহার দেব। তৃষ্ণার্তকে জল। আমি মমতায় হাত খুলি। চোখের সামনে দেখি এবড়োথেবড়ো পাপড়িগুলি খুলে যাচ্ছে। এমন দৃশ্য দেখেও সুখ। এর অংশিদারী হতে পারা আরও বেশি সুখের। আমি ফুলটাকে গাছের গোড়ায় রেখে দিই। রাতের বাতাসে তার ক্ষত নিরাময়ের জন্য। মনে হয় আমার জীবন আর এক বার বদলে গেল। শুরু হোক এবার আমার জীবনের ইতিবাচক সাধনা। শুরু হোক পাগলের নিরাময়। আমার হাতে। ভবিষ্যতে আর কোনও অন্ধকার থাকবে না। আমি শিশিরকণা সবাইকে দেখিয়ে দেব, আমি কী দিয়ে তৈরী। জীবন নিয়ে আর কোনও পরীক্ষা-নীরিক্ষা নয়। গোলাপি কমনীয়তায় কামনার সিঞ্চন নয়। শুরু হোক উচ্চতর কিছু।

“আমার কুনো দোষ নাই,” সোনিয়া বলে। “আইন্নের দিগে চাইবার গিয়া ভাইঙ্গালাইছি।”

আমি সোনিয়াকে কাছে টেনে ওর মাথাটা আমার বুকে চেপে ধরি।

জীবনে প্রথম এমনটা করতে পারলাম। আত্মশ্লাঘার বিষাক্ত চাদরখানা গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া। আমার চোখে আনন্দাশ্রু।

আমি সোনিয়ার হাত চেপে ধরি। ওকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাই। মনে প্রবল আনন্দ। একটু থমকে দাঁড়াই। আবার পা চালাই। যেই গতিতে যেতে চাই সেই গতিতে যেতে পারি না। বিহ্বলতায় দোল খাই। একটু মাথাও ঘোরে। আর দুই কদম এগিয়ে গিয়ে থেমে যাই। চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিই। বোঝার চেষ্টা করি। কী ব্যাপার?

সমস্যা পায়ের নিচে। কিন্তু কী তা? আর কোথা থেকেই বা এল?

বাইশ

আমি সাবধানে পা ফেলি। না। এটা আমার মনের ভুল নয়। বারান্দায় আমার চপ্পল বার বার আটকে যাচ্ছে। মনে হল আমি পানির উপর হাঁটছি। ভেবেছিলাম বাতাসের উপর হাঁটব। আর হাঁটছি পানির উপর। একটু আগে আমার বুকে সুখের যে জোয়ার উঠেছিল, এখন তাতে ভাটার টান লেগেছে। আমার পায়ের দু-একটা আঙ্গুল ভিজে গেছে। পার্বিতেও পানির ছোঁয়া।

দরজা খুলে আমরা ঘরে ঢুকি। সোনিয়া ডান দিকের কনসোলটার সাথে বাড়ি খেয়ে কুপোকাত। শব্দ হয়: পেচাআআআত...ফট্।

আমি বিরক্ত হই। আতশবাজি দেখার খুশিতে যেন সোনিয়া লাফ দিতে গিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেছে।

সোনিয়া উঠে দাঁড়ায়।

“ব্যথা পেয়েছিস?”

“না খালাম্মা। কুনো বেতা পাই নাই।”

সোনিয়ার লাল কামিজ আর সাদা সালোয়ার ভিজে গেছে।

বুঝতে পেরেছি, আমি নিজেকে বলি। দরজা ভেজানো থাকায় দরজার নিচে লাগানো রাবারটা দরজা আর ফ্লোরের মাঝের ফাঁকটা বন্ধ করে রেখেছিল। তারপরও বারান্দায় কিছু পানি চলে এসেছে। এখন দরজা

খোলা। তাই পানি ঠেলাঠেলি করে বারন্দার দিকে ছুটে আসছে। আমি এক ঠেলায় দরজা বন্ধ করি। দুই পায়ে দুই আছাড় দিয়ে সেন্ডেল খুলি। আমার পায়ের পাতা পানিতে ডুবে যায়।

কী ভাবতে ভাবতে নিচে এলাম? এখন কী দেখি? আমি কীভাবে এর ব্যাখ্যা করি? গ্রিক পুরাণের বহুমস্তকবিশিষ্ট সর্প হাইড্রা। কোথা থেকে এল এই অপরাজেয় বিকট প্রাণির ধারণা? আমি ভাবতে পারি না যে ওরা আমার সমস্যাগুলি না দেখে হাইড্রার কল্পনা করতে পেরেছিল। আর তা-ই যদি হয়, এখন আমি কী করতে পারি? আমি হাইড্রার একটা মাথা কাটব, হাইড্রার আর একটা মাথা গজাবে। আমি কীভাবে হাইড্রার দফারফা করব? আমি কি হারকিউলিস? আমি কী দেবতা জিউস আর মানবী অ্যালসিমিনার মিলনের ফল। আমি হলাম আমলা শামসুর রহমান খান আর ডাক্তার মরিয়ম কবির খানের ঘরে জন্ম নেয়া এক মানবী। অথচ জীবন আমাকে একটার পর একটা হাইড্রার মুখোমুখি করছে। আমি অবশ্যই নিজেকে ঠুনকো কোনও নারী ভেবে বড় হইনি। কিন্তু তারপরও আমি কী করে নিজেকে অর্ধদেব হারকিউলিসের সমকক্ষ ভাবি? ডান্ডার মধ্যে হারকিউলিসের শক্তি লুকানো। আমার ডান্ডা কই? ভাবতে গিয়ে রাগে আমার বুক ভেঙ্গে যেতে চায়।

আমি কাঁদি না। কেঁদে কী হবে? আমি সচেতন থাকার চেষ্টা করি। ডান্ডা নাইতো কী হয়েছে, মগজতো আছে। দেখা যাক। হাইড্রার মাথা কাটতে কাটতে আমার কাস্তে হাইড্রার ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে কি না। আমি সিদ্ধান্ত নিই আমি কাস্তে চালিয়ে যাব।

আমি এর শেষ দেখতে চাই। আমার দিনের বেলার কথা মনে আসে। কোন্ কষ্টে সে দিন যাপন করে? তার এই কষ্ট পৃথিবীর কেউ বুঝবে না। ক্যান্সার, আলজাইমার'স, আর্থরাইটিস, সিরোসিস কোন অসুখের চেয়ে এই অসুখকে খাটো করে দেখব? হ্যাঁ, এটা অন্য অসুখের সাথে তুলনা করা যেত, যদি এই অসুখের কষ্ট খালি চোখে দেখা যেত। এটাতো খালি চোখেও দেখা যায় না, চোখ বন্ধ করেও দেখা যায় না। এই অসুখের কষ্ট আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ দেখে না। তাই এই অসুখ বেশি নিষ্ঠুর, বেশি অমানবিক। আমি নিজেও এই সত্য সব সময় মনে রাখতে পারিনি। তবে আমি চেষ্টা করেছি তাকে ভাল করতে। সে ভাল হয়নি। সে অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল। আমি তা ধরতে পারিনি।

পা টেনে টেনে আমি ড্রয়িং রুমে ঢুকি। আমি লাইট জ্বালাই। ড্রয়িং রুমের পানিতে কই মাছ ছেড়ে দেয়া যায়। ডাইনিং হলে একটা লাইট জ্বালানো ছিল। আমি বাকি তিনটাও জ্বালিয়ে দিই। ঘর আলোয় ভরে যায়। চারি দিকে পানি। পানি আর পানি। জানি না, কতক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারব। যদিও আমি প্রাণপনে চাই, আমার সচেতনতাটুকু যেন চলে না যায়।

হামিদের খুনের সেই দুর্যোগের রাতে রান্নাঘর থেকে প্রথমবারের মতো সে বটি বের করে এনেছিল। আমাকে জবাই করার জন্য। তবে আজকের মতো সে রাতে সে এত উন্মত্ত ছিল না। আজকে সে দা হাত থেকে ফেলেনি। মেঝেতে পড়ে না গেলে সে আমাকে কোপাত। সে রাতে আমি জবাই হওয়ার জন্য ফ্লোরে শুয়ে তার দিকে গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাকে আহ্বান করেছিলাম আমার গলায় পোঁচ দেয়ার জন্য। আমি আকাশবাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করেছিলাম। তখন সে বটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিল। আলিঙ্গনের মধ্যে খুনিকে লুকিয়ে ফেলতে। বাকি রাতটা আমরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে পার করে দিয়েছিলাম। মুরগি ছানা আমিন আর সিলিকনের স্তনবিশিষ্ট তরী চৌধুরী ভাবল হৃদ্‌রোগের হাতে পরাজিত তাদের পুত্রের শোকে আমারা মা মেয়ে কাঁপছি। সে রাতে পাগল আমাকে যা দিয়েছিল, তা কোনও মা কী কোনও মেয়েকে কখনও দিয়েছে? মনে হয় না।

অথচ আজ আমি কী করলাম? দা দিয়ে আমি তার গলায় পোঁচ দিলাম। জানি কাটেনি। কিন্তু অপমানতো হয়েছে। সে উঠে চলে গেছে। আমি আর তার দেখা পাইনি। কত ভিন্ন দুটি দৃশ্য। সে রাতে সে

আমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল। আজ আমি যা করলাম তারপর আর আলিঙ্গনের কোনও সুযোগ রইল না। তাকে একা একা থমকে যেতে হল। কীভাবে সে থামল, সে কথা ভাবতে গিয়ে আমার গলা শক্ত হয়ে যায়। জানি গলাটা একটু শিথিল করলেই আমি ডুকরে ডুকরে কাঁদব। তবু যতটা পারা যায়, গলাটা শক্ত করে রাখি। কারণ আমাকে সবটুকু ভাবতে হবে। এত অল্প ভেবে কাত হলে আমার চলবে না। সে আমাকে অনেক দিয়েছে, তা সত্যি। কিন্তু মা হলে আরও বেশি দিতে হয়। এটা মায়ের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব থেকে আমি তাকে অব্যাহতি এত সহজে দিতে পারছি না। তা ছাড়া এখন আমার বিপদ। সবার আগে আমাকে দেখতে হবে, সে কোথায়? আমি পা টেনে টেনে তার সন্ধানে বের হই।

আমার গর্ভকে প্রাণহীন করার পর আমি বুঝতে পারি সন্তান মায়ের বুকের কত গভীরে নাড়া দেয়। তাই বলে আমি আহাম্মক হয়ে বড় হয়েছি, তা বলা যাবে না। আমি সব বোধ সময়মতো অর্জন করেছিলাম। নারীর বোধ। মায়ের বোধ। মানুষের বোধ। আমার ডিম্বাশয় দুটি ডিম্ব উৎপাদন শুরুর আগেই আমার মনে এই সত্য উৎপাদিত হয় যে, অসুখী সংসারে সন্তানের জন্ম দেয়া মানব জীবনে সবচেয়ে স্বার্থপর কাজ। বাসর নামক মশকারির রাতেই হামিদ আমাকে ঘায়েল করতে চেয়েছিল। তবে আমি তা ঠেকিয়েছি। কিন্তু আমার এখন সে সব ভাবার সময় নয়। পাগলের জন্য আমার মন অনেক খারাপ। কিন্তু তার চেয়েও বেশি জ্বলছে আমার মনে দ্রোহের আগুন। হামিদের উন্মত্ততা আমাকে কাত করতে পারেনি। কষ্ট পেয়েছি অনেক। কিন্তু গর্ভ ধারণ করব কি করব না, আমার এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের কোনও সুযোগ আমি হামিদকে কখনওই দিইনি। নারীর জীবনের এই সংগ্রাম একান্ত এবং অনেকটা অপরাজেয়, যদি না ডিম্বাশয় ডিম্বহীন হয়। এই সংগ্রামে পরাজিত হলে আমি হামিদকে দায়ী করতাম না। যে সংগ্রাম আমার নিজের, তাতে পরাজিত হওয়ার মানুষ আমি নই। হামিদের সন্তান জন্মদান থেকে বিরত থেকে আমি অবশ্যই মানবতার কাজ করেছি। মানুষ হিসাবে ওটা আমার পরীক্ষা ছিল। আমি পাশ করেছি। পাগল ফেল মেরেছে।

আমি বার বার পাগলকে বলেছি, তার মা হওয়া উচিত হয়নি। এমন অপমান করার জন্য অনেক সময় নিজে লজ্জিত হয়েছি। কিন্তু এখন এই বন্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি মনে করি, আমার কথাই ঠিক। পাগলের কখনওই মা হওয়া উচিত হয়নি। সে আমার যত যত্নই করুক না কেন, আমাকে সে সুখী করতে পারেনি। আর কোনও কিছুর জন্য না হলেও, সে যে পাগল হয়ে গেছে মা থাকা অবস্থায়, শুধু এ কারণেই তার সন্তান জন্মদান কোনওভাবেই ঠিক হয়নি। আমার আব্বার উচিত ছিল না কোনও সন্তানের জনক হওয়া। শুধু শিশুকে আদর করতে জানে এই যোগ্যতায় এই পুরুষগুলি বাপ হয়ে যায়। এরা বোঝে না পিতামাতা হওয়া শুধু শিশুকে আদর করা আর ঘি-মাখন খাইয়ে মোটাতাজা করা নয়। যে মানুষ সমাজের কুসংস্কারগুলোর গোলাম, তার কখনওই মাতাপিতা হওয়া উচিত নয়। এটা আমার নিজস্ব মতামত নয়। আমার সিদ্ধান্ত আরও কঠোর। আমার কথা হল এমন মানুষের সন্তান জন্ম দেয়ার কোনও অধিকারই নাই। মনুষ্য শিশু। কত জন জানে কত শত অত্যচারের মধ্য দিয়ে সে বড় হয়। শিশুর এক মাত্র আশ্রয়স্থল পিতামাতার কোল। সে কোলে চড়তে তার যদি কোনও অস্বস্তি হয়, তবে তার দায়ভার কার? অবশ্যই পিতামাতার। এ কর্তব্য সমাজ বোঝে না। রাষ্ট্র বোঝে না। আর আমরা মেয়েরা। আমরা ভাবি কোনও রকম পেট থেকে একটা বের করতে পারলেই হল। এ বার পাগলা তুই যাবি কই? কিন্তু পাগলা ঠিকই পালিয়ে যায়। আর এ দিকে একটা বের করতে গিয়ে অনেক সময় আমরা দুইটা, তিনটা, এমনকি ছয় কি সাতটা পর্যন্ত বের করি। চকমকির পাথরে জ্বলে ওঠা আলোর আমরা অন্যায় অপব্যবহার করি। আমাদের বোন-ভাবিরা আমাদের শিখিয়ে দেয়: ধরে রাখতে চাও? তা হলে গাভিন হও, আর দ্রুত বিয়াও। আমরা যারা এই কুবুদ্ধি দিই, তাদের রাস্তায় উলঙ্গ করে পেটানো উচিত। যেন রক্ত থেকে এই কুবুদ্ধি চিরতরে বিদায় নেয়। করিম চাচার স্ত্রী এই কুবুদ্ধির শিকার ছিলেন। চাচির হঠকারিতাকে করিম চাচা নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। এ জন্য আমি করিম চাচাকে সম্মান জানাই। চাচি পরে যখন সুখী হয়েছিলেন, কোল ভরে সন্তান পেয়েছিলেন, তখন অবশ্য আমাকে বলেছিলেন, তাঁর ওইভাবে গর্ভ

ধারণ করতে চাওয়াটা ভুল ছিল। চাচি স্বীকার করেছেন করিম চাচাই তাঁকে সেই ভুল থেকে রক্ষা করেছিল। চাচি যে কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন হাজার হাজার মেয়ে সে কাজে সফল হয়। তারপর ভাতারের সাথে রাতদিন চুলাচুলি করে। দুই বছরের, তিন বছরের শিশুদের সামনে। আর পিতামাতার তৈরি বিষে ওই শিশুগুলির মস্তিষ্ক নিষ্পেষিত হতে থাকে। আমি বরং বাহার চাচা কিংবা সোনিয়ার আব্বা যা করে তাকে অপেক্ষাকৃত ভাল মনে করি। এদের ঘরে শিশু এসেই বুঝতে পারে এরা প্রকৃতির প্রাণি। জগতের আর জীবজন্তু যে ভাবে বেড়ে উঠে, তারা সে ভাবে বেড়ে ওঠে। তারা পাতা খায়, বিষ্ঠা খায়, মাটি খায়, পোঁদে সতীর্থের আঙ্গুলের গুতা খায়, যোনিতে শিশুকামীর ধ্বজের ঠেলা খায়, আর এগুলিকে তারা স্বাভাবিক মনে করে, আর তাতে করে এরা অন্তত মস্তিষ্কবিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়। এরা হয় প্রকৃতির সন্তান। এরা দ্রুত স্বাবলম্বী হয়ে যায়, অন্তত মানসিকভাবে। তবে পৃথিবীতে মানবশিশুর আদর্শ জায়গা কী, তার সিদ্ধান্ত আমি দেব না। এটা সমষ্টির সিদ্ধান্ত।

আমার পায়ের নিচে পানির গভীরতা বাড়ে। আর তার সাথে তাল মিলিয়ে আমার ক্রোধও বাড়ে। আমার সচেতনতা চলে যাচ্ছে। আতশবাজি দেখার আনন্দ এখন সারারাত পানি সেঁচে পরিশোধ করতে হবে।

সোনিয়া বালতি আর একটা তোয়ালে নিয়ে এসেছে। এবং কাজও শুরু করে দিয়েছে। এভাবেই সোনিয়া সব সমস্যার গোড়ায় হাত দেয়। তবে তোয়ালায় কাজ হবে না। মোটা কাঁথায় কাজ হলেও হতে পারে। কিন্তু তা আলগাবে গে? গত দুই বছরে আমি সোনিয়াকে প্রথম পাঁচ ক্লাশের বই পড়িয়েছি। ওকে আমি যা পড়াই সোনিয়া তার চেয়ে বেশি শেখে। সুযোগ পেলে ও যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাই। আমি ওকে সাহায্য করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু এত পানি তোয়ালে দিয়ে শুষে আনা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। তারপরও সে চেষ্টা করছে। তার চেষ্টায় বালতি ভরে যাচ্ছে, মেঝেতে ধেয়ে আসা পানিতে।

আমিও একটা বালতি নিয়ে কাজে নেমে যেতে চাই। কিন্তু তার আগে দেখতে চাই, সে কী করছে? আমি ঘুরে অন্য দিকে পা বাড়াই। যত সামনের দিকে এগোই তত মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। ঘরে বুঝি ফ্লাডলাইট জ্বলছে। আর তার নিচে সমুদ্রে রোদের আলো খেলা করছে। আমি দ্রুত পা চালাই। বার বার পা আটকে যায়। এই বাড়িতে অনেক আসবাবপত্র। পাগল মনে মনে একটা খালি বাড়ি চায়। কিন্তু আসবাবপত্রগুলো সে ছাড়তে চায় না। মনে তার বাসনা। তার মেয়ের আবার বিয়ে হবে। জামাইয়ের জন্য আসবাবপত্র দরকার। মেয়ের শ্বশুর বাড়ির অন্তত পঞ্চাশ জন মানুষ যাতে বসতে পারে। সপ্তাহে একবার পাগল তাদের দাওয়াত দিবে। আমি মনে মনে বলি আমি পাগলের আশার নিকুচি করি। আমি এই জোয়ার থেকে নিষ্কৃতি চাই। আর কিছু চাই না।

কী জন্য দরজার কাছে ফিরে এলাম ভুলে গেছি। বোধ হয় দরজা বন্ধ করা হয়েছে কি না, তা দেখতে। আমার মাথা ঠিক আছে কি? দরজাতো অনেক খেয়াল করেই বন্ধ করেছিলাম। উল্টো দিকে ঘুরতে গিয়ে আমার বাম কনুইয়ে ধাক্কা খাই। বাড়ি খাই সেই হাড্ডির মাথায়, যেখানে বাড়ি লাগলে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। বিদ্যুৎ ঝলকের ইস্পাতের লাঠি আমার চান্দিতে আঘাত হানে। বশশ্। বিকট শব্দটা আমার হৃৎপিণ্ড গুঁড়িয়ে দেয়। মনে হল বিল্ডিংটাই ভেঙ্গে পড়েছে। তারপর পটপটভটভট শব্দগুলি হৃদয়ের দরজা দিয়ে ভাঙ্গা কাচ হয়ে ঢোকে। দৃশ্যপটে চোখ ঘুরিয়ে যা দেখি তা আমার সারা অঙ্গে শত শিশুকামীর শত ধ্বজের ঘষা দিয়ে যায়।

কনসোলটা বন্যায় লুটানো। কনসোলটার একটা পা নাই। বোধ হয় সোনিয়ার ধাক্কাতে ওটা খুলে গিয়েছিল। তখন খেয়াল করিনি।

আমার আনন্দ লাগে। আমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য বাসায় বন্যার সৃষ্টি করা। আর এখন? পাগলের প্রিয় কনসোল বন্যায় ভাসছে। আমাদের ইউরোপ ট্যুরের পর ঢাকায় এসে পাগল যত্ন করে ঘরে হাতিলের মিস্ত্রি এনে দু'টি কনসোল বানিয়েছিল। যদি মেয়ের আবার বিয়ে হয়। অতিথিরা ঘরে ঢুকেই যেন পৃথিবীর পুরনো সভ্যতাগুলির সাথে পরিচিত হতে পারে। আর এখন? পতিত এই আসবাবকে আর তোলা যাবে না। অর্ধেক সভ্যতা এখন বন্যায় ডুবে গেছে। আমি পানির ঝাপটায় ভিজে গেছি। আমার চোখের সামনে পেঁচাটা উল্টে পড়ে আছে। পৌরাণিক পেঁচার বুদ্ধিদ্বীপ্ত হলুদ চোখজোড়া আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। উরুগুয়ের পার্ল হোয়াইট মার্বেলের তৈরি দামি পেঁচা। এথেন্স শহরের প্লাকা বাজার থেকে আমরা দুজনে কিনেছিলাম।

শিল্পীর কারুকাজ। পেঁচাটাকে সব সময় জীবন্ত মনে হয়েছে। সাততলা থেকে নিচে কংকরের রাস্তায় ছুঁড়ে মারলেও ওর গায়ে আঁচড় লাগবে না, এত মজবুত পাথরে তৈরি সে। মায়া খালার মেয়ে রনি আপার মতো রক্তমাংসের দেহ নয় তার। বিচক্ষণতার দেবি কুমারী আথেনার প্রতিনিধিত্ব করা পেঁচা। এত শক্ত তবু মনে হয় পেঁচাটা পাগলের তৈরি বন্যায় অসহায়ভাবে চিত হয়ে শুয়ে আছে। উল্টে পড়ে আছে গ্রিক আর মিশরীয় সভ্যতার সব চিহ্ন। সক্রেটিস, প্লাটো, হোমার, সফোক্লিস, আক্রোপলিস, সম্রাট আদ্রিয়ানের গ্রন্থাগার, আলেক্সান্ডার, দ্বিতীয় রামসিস, আমেনহোতেপ, তুতানখামুন, নেফারতিতি, ক্লিওপাত্রা, এন্তনি, সিজার। বানের জলে ডুবে আছে পুরো মিশরীয়, গ্রিক আর রোমান সভ্যতা। আমাকে কষ্ট দেয়া? বান্দি দেখ্, তোর সাধের কনসোল কুপোকাত। সকালেই দারোয়ান ডেকে আমি এসব খালি করব। সব সোয়ারিঘাটে নিয়ে ফেলব। এই ঘর খালি করব। পাগলকে এবার দড়ি দিয়ে বাঁধব। এবার আমার আধিপত্য চালাব। এখান থেকে শেষ হল পাগলের আধিপত্য।

মন চায় বাম দিকের কনসোলটাকেও গুঁড়িয়ে দিই। না হয় ডান কনুইয়ে আরেকটা বিদ্যুচ্ছটার আঘাতই পেলাম। কিন্তু তা করা হয় না। কনসোলটা খাড়া থাকে। ওটা ধারণ করে আছে প্রাচীন ভারতীয় আর দক্ষিণ আমেরিকার সভ্যতাগুলি। টিকে গেছে টিকাল মন্দির। ভূমধ্যসাগরের পাড়ে পাড়ে ঘটে যাওয়া ধ্বংসজজ্ঞ দেখে যেন জাগুয়ারের পিঠে সওয়ার ইনকা রাজা আতাহুয়ালপা মিটিমিটি হাসে। ধ্বংস যে মানবমস্তিষ্কের গূঢ়তম নেশা, সে কথাই এই রাজার হাসি বলে দেয়। এই রাজাগুলির আনন্দ ধ্বংস সাধনে। গত শতাব্দীতে এরা দশ কোটি মানুষ মেরে ফেলেছে। কিন্তু কেউ অপরাধবোধ নিয়ে মরেছে, এমনটা জানা যায়নি। প্রকৃতিও এদের ধ্বংসের জন্য গড়েছে। এদের সভ্যতম অংশটুকুও একটু একটু আঘাত করা ছাড়া নিজেকে আনন্দ দিতে পারে না। আমার এখন ওই রাজাদের দশা। দুই চারটা সভ্যতা গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারলে আমার সুখ হয়। মন চায় কোমরে ইস্পাতের অস্ত্র পরে মানবজাতির কোমর অবশ করে দিই।

তেইশ

আমি নিজেকে নিন্দা জানাই। আমি অযথা সময় নষ্ট করছি। আমিতো দেখলামই না, কী হয়েছে? বন্যার পানি গভীর হোক। আমার ঠ্যাঙ কি কম লম্বা? আমি তাদের বহারের চেষ্টা করি। যত পাগলের ঘরের দিকে যাই তত পানির গভীরতা বাড়ে। পাগলের ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মেঝেতে ঢুকে নাস্তানাবুদ হই। এই ঘরে নৌকা চালানো যাবে। এটা এমনিতেই সব সময় অগোছালো থাকে। আর এখন মনে হচ্ছে অশান্ত মহানন্দার বুকে ভেসে যাচ্ছে একটি খাট, দুটি আলমারি, একটা আরামকেদারা, আর নানান রঙের শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, শালোয়ার, কামিজ, ওড়না, চাদর, রুমাল।

কিন্তু বিছানায় পাগল নাই। ছাদে যাওয়ার আগে তাকে যেভাবে মটকা মেরে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল সে অন্তত বাহাত্তর ঘন্টা সেভাবে থাকবে। যেই আমরা ছাদে গেলাম সেই বুঝি সে উঠে গেল। বুঝা যাচ্ছে সে বাথরুমে আছে। সে যে বিছানা থেকে উঠেছে এটা একটা ভাল বিষয়। আমি আতঙ্কে ছিলাম কী করে তাকে বিছানা থেকে তুলব। আমি তার মটকা মেরে পড়ে থাকাকে ভয় পাই। এখন সে নিজেই উঠে গেছে। নিজেকে আমার হালকা লাগত, এই বন্যাটা না হলে।

বন্যা অতিক্রম করে আমি বাথরুমের দিকে যাই। বাথরুমের দরজা বন্ধ। দরজার কাঠ নীচ থেকে প্রায় কোমর পরিমাণ ভেজা, পাউরুটি যেমন করে চা গেলে তেমন করে দরজার কাঠ পানি গিলেছে। আমি দরজায় কয়েকটা ঘুসি দিই।

“মা! মা! মা!”

কোনও সাড়া পাই না।

বাথরুমের ভেতরে টেপ থেকে শোঁশোঁ করে পানি পড়ছে। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নাই। আমি নক করি। ঠক! ঠক! ঠক!

“মা, পানি বন্ধ করো! ঘর ভেসে যাচ্ছে!” আমি গলা ফাটাই।

এমনিতেই পনেরো বিশ মিনিট নক না করলে সে দরজা খোলে না। আজ যে কয়েক ঘন্টায়ও তা খুলবে না, তাতো বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও বাথরুমের পানি এভাবে বাইরে চলে আসেনি। এ ব্যাপারে সে শুরুতে অসংযত ছিল। পরে অবস্থার উন্নতি ঘটে। আর গত এক সপ্তায় মনে হয়েছিল সে একদম ভালো হয়ে গেছে। আমি মনে মনে জরিনা খালার প্রতি কত যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। আল্লাহকে ডেকেছি। সিন্নি মানত করেছি। ব্যাংক থেকে দশ টাকার নোটের দশ হাজার টাকা তুলেছি শুধু ভিখারীদের জন্য। ওদেরকে ব্যাগ খালি করে দুই হাতে ভিক্ষা দিয়েছি। আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি আমার মার অসুখ ভাল হয়ে যাচ্ছে এই কল্পন করতে করতে।

এখন আমার কাছে সব কিছু বিভ্রান্তিকর। জরিনা খালার চিকিৎসায় কি আসলেই তার কোনও উন্নতি হয়েছে? পানি যত বাড়ছে আমার মাথাও তত গরম হচ্ছে। এমন বিপদে কেউ কাউকে ফেলে? সে কি জানে না আমি বাইরের লোকের সাহায্য চাইতে লজ্জা পাই। সে যেমন লজ্জা পায়, আমিও তেমন লজ্জা পাই। তা হলে সে কেন এই অনাচার ঘটাচ্ছে? কেন আমার উপর এই অবিচার করছে?

আমি এর একটা স্থায়ী বিহিত করার কথা ভাবি। তার উপর আমার যে নির্ভরতা তার দড়ি আমার কেটে দিতে হবে। সোনিয়াই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তাকে পাগলা গারদে পাঠানোর কথা ভাবি। জরিনা খালাকে ফোন করার মুখ নাই। খালা নিজেই হয়তো জ্বরে পড়েছে এর মধ্যে। জরিনা খালার সাহায্য আমি নেব না। আমি একা একাই ডাক্তার খুঁজে বের করব। পুনর্বাসন কেন্দ্র খুঁজে বের করব। দেখব কোথায় তাকে রেখে এলে ভালো হয়। কোন জায়গায় এমন পাগলের ভাল যত্ন করা হয় তা আমাকে জানতে হবে।

পায়ের নিচে পানির গভীরতা বেড়েই চলেছে। এভাবে চলতে থাকলে এ পানি সেঁচার জন্য দমকল বাহিনী ডাকতে হবে। দমকল বাহিনীর এক কর্তাকে এক সময় চিনতাম। সে আব্বার প্রবেশনার ছিল। সেও বোধ হয় অবসরে গেছে। এখন আমি কী করি? কার কাছে যাই? চেয়ারম্যান স্যারকে ডাকলে দৌড়ে আসবেন। দরকার হলে তানিয়ার বুক থেকে উঠে চলে আসবেন। বারবার হাই তোলা সরু তানিয়ার সরুতর

ছেদায় আর কত গলুই মারা যায়। কাজেই আমি ইশরার করলেই স্যার চলে আসবেন। সব সাহায্য করবেন। কিন্তু সকাল হতে না হতেই আবার অভিজাত যোনি ভিক্ষা চাইবেন।

আমি আর পারি না। এবার মরে যাক। এবার সব লজ্জার অবসান হোক। এমন পাগলের বেঁচে থাকা সাজে না। এই ঘরে বাস করি আমি আর সে আর সোনিয়া। আমরা দুজনেই পাগল। সোনিয়াও পাগল। পাগলের সাথে পাগলের বসবাস অসম্ভব। সে-ও তা বোঝে। সে-ও হয়ত আমার মৃত্যু চায়। আমার ধৈর্য শেষ। আমারওতো ওসিডি আছে। আমারও কষ্ট আছে। পানি উপচে বের হচ্ছে দরজার নীচ দিয়ে। আমার হাঁটুর উপর। আমার মাথা জ্বলে ওঠে। রাগে কাঁধ দুটি উপরের দিকে উঠে আসে। মাথার তালু জ্বলে। "মরে যা তুই!" এবার আমি দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করি। "কল বন্ধ কর্, মা...!"

না আমি মা ডাকিনি। সে শব্দে তাকে ডেকেছি। যে শব্দে সে আমাকে আজ ডেকেছে। যে শব্দ বাড়িতে আমদানি করার জন্য সে এক দিন ভাইকে দা দিয়ে তাড়া করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

আমার মাথার তার ছিঁড়ে গেছে। তার ছিঁড়ে গেলে আমার আর নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আমার চিৎকারে সারা বাড়ি কাঁপে। আমি আরও জোরে তাকে গালি দিই। আমার মাথা আরও গরম হয়। আমি গালির বন্যা ছুটাই। কেঁপে কেঁপে ক্রোধ ঝাড়ি।

আমি হাঁপাই। নিজের বুকের উঠানামায় নিজে চমকে উঠি। সে আমার কথা শুনছে না। কল বন্ধ করছে না। যে সংযম আমাকে জরিনা খালার সামনে দেখাতে হয়েছিল, তার এখন কোনও দরকার নাই। আমি জোর করে একটা নিঃশ্বাস টেনে পেটে ঢুকাই। আর তাতে যে শক্তি সঞ্চয় হয় তা মুখ দিয়ে ছেড়ে দিই। "মর্, তুই মর্! গলায় ফাঁস দে! রনির মতো বিশ তলা থেকে লাফ দে! নইলে বের হয়ে আয়! আমি তোকে গুলি করি! আগে তোর বুকে গুলি করব! তারপর নিজের মাথায়! বের হয়ে আয়্ তুই!"

আমি খিস্তি দিতে থাকি। খিস্তি দিতে দিতে আমার গালে খিল লেগে যাচ্ছে। সে আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না। বাথরুম থেকে পানি বের হয়েই যাচ্ছে। ভেতরে পাঁচটা কলা আছে। কয়টা খুলে দিয়েছে কে জানে? বের হয়ে আসার পর এবার সত্যি আমি তাকে জবাই করব। যদি জবাই না-ও করি। পাটের দড়ি দিয়ে বেঁধে আমি তাকে ন্যাংটা করে বেত দিয়ে পেটাব।

মেজাজ খিঁচে ধরে আমি আর এক দফা তাকে মিনতি করি। "মা, মাগো, দরজা খোলো। আর কষ্ট দিয়ো না। দেখো, ঘরে এক হাঁটু পানি। মা আমাকে মাফ করে দাও। কল বন্ধ করো। বের হয়ে আসো, মা। মা, তোমার কোনও চিন্তা নাই। নিজ হাতে তোমাকে খাওয়াব। তুমিতো সারা দিন কিছু খাওনি। আজ আমি তোমাকে তোমার মনের মতো পরিষ্কার করব। ধোয়া জামা দিব পরতে। বিছানা বদলে দেব। মা রহম করো। বের হয়ে আসো, মা। মাগো, বের হয়ে আসো। এত পানি। বড় বিপদ, মা!"

আকুতি করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। আশা করি সে বের হয়ে আসবে।

সে বের হয়ে আসে না।

কেন সে বের হয়ে আসে না? আমি দরজায় লাত্থি মারি। পানি থেকে পা টেনে তোলা কষ্টের কাজ। তবু আমি দরজায় পা চালাই। কখনও এমন দুর্দশায় পড়িনি। লাত্থি জোরে লাগে না দেখে দরজায় আবার ঘুসি মারি। কয়েকটা ঘুসি মারার পর বুঝতে পারি আমি শেষ। আমি এখন একশটা খুন করতে পারি। কিন্তু খুন কাকে করব? তাকেতো আগে বের করতে হবে। আমি তার ধৈর্যের বাঁধ কেটে দিতে চাই। "বের হয়ে আয়, বাজারের বেশ্যা!" আমি বলি। "কত খারাপ কথা কানে গেলে তোর ইজ্জতে লাগবে?" কোন গালি শুনলে এই খাণ্ডারনির লাশ কবর থেকে জেগে উঠবে? আমি তাকে আসপাসিয়া, ইসাবেলা, ভেরোনিকা, লরা বেল, মাতা

হরি-সহ ইতিহাসের যত বিখ্যাত বারবনিতার নাম জানা আছে, একে একে সব নামে ডাকি। আর দুই হাতে দরজায় ঘুসি চালাতে থাকি। গালি দিতে দিতে আমার চোয়ালে ব্যথা হয়ে গেছে। "কেন তোর কানে কোনও কিছু ঢোকে না?" আমি গগনভেদী আর্তনাদ করি। আমি তাকে বুন্দি, তিলাওয়ালা, নাকাসু পের্লভকা-সহ জগতের নাম করা সব গণিকালয়ের বাসিন্দা বানাই।

তারপরও তার নড়নচড়ন নাই। এ দিকে বানের জোয়ার বুঝি এবার আমাকেই টেনে নিয়ে সাত তলা থেকে ফেলে দেবে। আমি দম নেয়ার জন্য থামি। আমার ভেতর যে এই হিংস্র পশু বাস করে, তা আমি জানি। তবে আমার মুখ যে এত খারাপ হতে পারে, তা আমি জানতাম কি না, কে জানে? কিন্তু সে যখন প্রতিবাদ করছে না, খুন্তি আর শাবল নিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছে না, তখন আমি একাকি আর কত এ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারি?

মাথার ভেতর একটা খটকা কিছু সময় ধরে দানা বাঁধছে। এখন তা অঙ্কুরিত হয়েছে। চারা গাছ হচ্ছে। আর দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এটা মানতে কষ্ট হচ্ছিল যে সে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে। আমি তাকে ভালবেসে পাগল ডেকে এসেছি। ওসিডি ছাড়া তার আর কোনও রোগ নাই। আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে সে দেড়শ বছর বাঁচবে। পানিতে এত ভিজে থাকে অথচ তার আঙ্গুলে কখনও ফাঙ্গাস পড়ে না। হার্টে কোনও সমস্যা নাই। যদিও মাঝে মাঝে এক সপ্তাহ বিছানা থেকেই উঠে না। এক ইঞ্চি সর না পড়লে সে দুধ পাতে নেয় না। তারপরও ডাক্তাররা বলে তার হার্ট নাকি এখনও আঠারো বছরের সুস্থ-সবল কুমারীর হার্ট। না। সে মরবে না। যদি না আমি মেরে ফেলি। এক জনকে মেরেছি। আর এক জনকে মারতে অসুবিধা কোথায়?

"কল বন্ধ কর্।" আমি চিৎকার করি। কিন্তু কেন যেন গলা বন্ধ হয়ে আসে। আর গালি দিতে পারি না। সে যেন আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। যেন দেখতে চায় আমি কত গালি দিতে পারি। সে জিতে যাচ্ছে। আমি হেরে যাচ্ছি। তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু? কিন্তু কী?

কিন্তু যদি সে বাথরুমে না থাকে? আবার তা-ই বা যদি না থাকে, তবে বাথরুমের দরজা বন্ধ কেন? আবার যদি বাথরুমেই থেকে থাকে তবে এত গালি, এত আকুতি, এত ধমক, কোনও কিছুই কেন তাকে স্পর্শ করছে না? তা হলে সে কি বাথরুমে নাই? মনে হয় সারা বাড়ি আর এক বার দেখা দরকার। যদি অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকে। আমি দীর্ঘ শ্বাস টেনে বুক ভরাট করি। পানিতে পা টেনে টেনে উল্টোদিকে হাঁটি। বাতাসে পানির গন্ধ। ডান পাশের খালি ঘরগুলির প্রথমতটাতে ঢুকি। এ ঘরে পুরনো কতগুলো সোফা আর একটা কালো আলমারি ছাড়া আর কিছু নাই। একটা পুরনো কালো ম্যক্সি আলমারির আড়ালে লুকানো।

এটা সে সব সময় করে। ভেজা কাপড় শুকাতে না পারলে সে তা এখানে সেখানে গুঁজে রাখে। যাতে কেউ টের না পায়। আমি আর সোনিয়া খুঁজে খুঁজে সেগুলি বের করি, মেশিনে ধুই, শুকিয়ে আবার জায়গামতো রাখি। দিনে পাঁচ গামলা কাপড় ধুতে হয়। দশবার সে গোসল করে। আরও বিশ বার একারণে সেকারণে হাত ধুতে, মুখে পানি দিতে, পা ধুতে বাথরুমে যায়। প্রত্যেকবার গিয়ে এক থেকে তিন ঘন্টা পর্যন্ত বাথরুমে থাকে। গরম পানি ছেড়ে দিয়ে ধোঁয়ায় সারা বাড়ি অন্ধকার করে ফেলে। এতে নাকি জীবাণু মরে। তার বাড়ি বাথরুম। এ ছাড়া তাকে আমরা আর কোথাও পাই না। আমার চোখে জল আসে। অনেক আগে থেকে সে কালো পোশাক পরা শুরু করেছে কারণ আমার চোখে যেন সে-সব কাপড়ের ভেজা দাগ ধরা না পড়ে। আমি পোশাকটা ধরে দেখি। এর গন্ধ আর স্পর্শ বলে এটা সদ্য ছাড়া পোশাক নয়। কমপক্ষে এক দিন আগে সে এটা এখানে রেখে গেছে। তা হলে সে এর মধ্যেও বাথরুমে সময় কাটিয়েছে। সঙ্গোপনে। জরিনা খালার চিকিৎসায় কোনও কাজ হয়নি। আগে কখনও সে আমকে ধোকা দিতে চাইত না। এবার ধোকা দিয়েছে। ইচ্ছে করে। কীসের জন্য?

আমি পাশের ঘরে যাই। এই ঘরটায় এক সময় আমার ভাই থাকত। এখানে একটা বিছানা পাতা আছে। আর আছে একটা বিশাল বইয়ের আলমারি। আমি ইচ্ছে করে রেখেছি। আমার মূর্খ ভাইয়ের ছেড়ে যাওয়া খালি ঘর যাতে জ্ঞান দ্বারা ভরা থাকে সে জন্য, অন্তত প্রতীকীভাবে। জ্ঞানের ঘরেও পাগল নাই। আমি বাসার এ মাথা থেকে ও মাথা যাই। পানি বেয়ে বেয়ে। দুপুরে তার ত্রাসে দৌড়েছি সারা বাড়িতে। এখন সারা বাড়িতে তাকে খুঁজছি একই উত্তেজনায়। সব আনাচ কানাচ দেখি। আরও যে চারটা বাথরুম আছে, সেগুলোতে ঢুকি। কোথাও সে নাই। আমি তার বাথরুমের দরজার সামনে ফিরে আসি। আমার বুক ধকধক করে। বাথরুম ছাড়া আর কোথাও সে নাই। বাথরুমে সে পাঁচ ঘন্টা থাকলেও আমার বা সোনিয়ার কোনও দুশ্চিন্তা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এই যে পানির স্রোত। কলের পানির অসহ্য শব্দ। তা আমার কানের পর্দায় সরাসরি আঘাত করে।

এ দিকে বানের জোয়ার বেড়েই চলেছে। সোনিয়া আমার পিছে পিছে ঘোরে। আমরা বাইরের দিকের দরজার কাছে যাই। সোনিয়াকে বলি। কাঁথা বালিশ যা আছে আন। সোনিয়া নড়ে না। আমি একটা ঘরের দিকে যাই। সোনিয়া আমার পিছে পিছে আসে। আমরা দু'জনে ধরে একটা তোশক নিয়ে প্রবেশদ্বারের কাছে রাখি। ভাঁজ করে ঠেলে ওটাকে দরজার নিচে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করি। আমি চাই না ঘরের পানি বাইরে যাক। নীচের তলার মানুষরা জানুক এই বাসায় কিছু ঘটছে। পাগল নিজেও কখনও নিজের সমস্যা অন্যে জানুক, তা চায় না। "যা, আর একটা তোষক আন," আমি সোনিয়াকে বলি। "কাঁথা বালিশ যা পাস, নিয়ে আয়।"

"আমার ডর করে," সোনিয়া বলে।

সোনিয়ার ডর করছে! "সোনিয়া, তুই ভয় পাচ্ছিস?" আমার মুখ থেকে কথাটা বের হয়ে যায়।

"হ," সোনিয়া বলে।

কিন্তু কেন? সোনিয়ার মুখ থেকে ডর কথাটা আগেও শুনেছি, তবে না-বোধক অর্থে। কত বার সোনিয়াকে তরকারি কুটার সময় বলেছি, সাবধান। সোনিয়া বলেছে, "কিছু অইত না, খালাম্মা।" সোনিয়া আমাকে তার হাতে অনেক কাটা দাগ দেখিয়েছে। সোনিয়া সব সময় বলে ও হাত-কাটা, পা-ভাঙ্গা এ সবকে ভয় পায় না। গ্রামে ও গাছের ডাল থেকে পড়েছে। পানিতে ডুবে গেছে। বন্যায় ভেসে চলে গেছে কয়েক মাইল। আবার উঠে গিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে। আগুনেও পুড়েছে। সে দাগও সে আমাকে দেখিয়েছে। সোনিয়ার কিছু হয়নি। সোনিয়া অনেক গর্ব নিয়ে ওর ছোট্ট শরীরে কাটার দাগ, পোড়ার দাগ, থেঁতলানোর দাগ ইত্যাদি চিহ্ন আমাকে দেখিয়েছে। নির্ভীক সোনিয়া ভয় পায়! আমার বুঝি হুঁশ ফিরতে শুরু করে।

মাথার মধ্যে বেড়ে ওঠা দ্বিধার বৃক্ষ মহিরুহে পরিণত হয়েছে। ভালবাসা বার বার আক্রোশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। আবার তাকে মা বলে ডাকি। এটা চূড়ান্ত। গালি আর আমার মুখ দিয়ে আসবে না। ঘর ভেসে যাক। বাড়ি ভেঙ্গে যাক। কেয়ামত নেমে আসুক। আমি তাকে আর একটাও খারাপ কথা বলব না। আমি সচেতনতা ফিরে পাই। কেন এই সচেতনতা নিয়ে এত বক্তৃতা, এত লেখালেখি, এত সেমিনার, এত কর্মশালা? কারণ এটা আসে আর চলে যায়, আসে আর চলে যায়। ধরে রাখতে পারলে তুমি রাজা। না ধরে রাখতে পারলে তুমি পাগল। আমি সেই সাধনায় লিপ্ত। সিসিফাস যা অর্জন করেছে। আমি তা অর্জন করতে চাই।

আমি আবার অনুনয় করা শুরু করি। "মা, মা আমার, আমার জীবনের ভালবাসা, আমার নারী জীবনের আসল প্রেম, আমাকে ক্ষমা করো। কল বন্ধ করো। আমরা ডুবে যাচ্ছি। মাগো, কেন তুমি বের হয়ে আসছো না? কেন তুমি আমাকে এত শাস্তি দিচ্ছো? আমি অপরাধী। কিন্তু আমিতো তোমার মেয়ে। আমি কি

কম অসুস্থ, মা? কেন তুমি আমাকে মাফ করতে পারছো না? কেন তুমি আমার কথা একটুও ভাবছো না। দেখো ঘর ভেসে যাচ্ছে। দরজা খোলো। মা, দরজা খোলো। মাগো, দরজা খোলো।"

চোখের পানি আর বাধ মানে না। হাত আমার একেবারে নরম নয়। তবু সেগুন কাঠের শক্ত দরজা ভাঙ্গার শক্তি আমার নাই। মা মা বলে গলা ফাটাই। যেমন ভেতরের কষ্টে আমার বুক ফাটে, তেমন দরজায় ঘুসি দিয়ে আমি আমার হাত ফাটাই। তা হলে কী সে তা-ই করেছে? যা আমি তাকে করতে বলেছিলাম। তা হলে কি দুয়ে দুয়ে চার মিলে গেল?

ধুক ধুক করতে করতে আমার বুক ভেঙ্গে যাওয়ার পর্যায়ে আছে। এর মধ্যে আবার শুরু হয়েছে মাথা ঘোরা। যা এখন বেড়েছে। আমি শুধু ঘুরছি। না পৃথিবী ঘুরছে? আমিইতো ঘুরছি। শাবানার মতো। সুনেত্রার মতো। রোজিনার মতো। নতুনের মতো। অঞ্জু ঘোষের মতো। চন্দন দ্বীপের রাজ কন্যা। বেদের মেয়ে জোসনা। তারও আগের নায়িকা শবনমের মতো ঘুরি। উর্দু ছবিতে সে যেমন ঘুরত। বৃত্তাকারে। পুতুলের মতো। আমার দেহটা যেন সে বৃত্তের ব্যাস। মাথার এমন ঘুর্ণন হতে পারে আমি বিশ্বাস করতাম না। তার হার্টের কোনও সমস্যা নাই। ঘরের কোথাও সে নাই। সে আছে বাথরুমে। আমি কাঁদতে কাঁদতে তাকে ডাকি। মা, মা, বলে ডাকি। ডাকতে ডাকতে আমি পানিতে লুটিয়ে পড়ি। আমার পিঠের ভূমিকম্পে বন্যার জলে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। পানির উচ্চতা নাভির উপরে ওঠে। আমি দরজায় মাথা কুটি। ভেজা দরজা। মা, মাগো! একটু দয়া করো। জানো না আমি তোমাকে কত ভালবাসি। কত ভালবাসি তোমাকে। কত ভালবাসি তোমাকে। কত ভালবাসি তোমাকে।

কতক্ষণ দরজার উপর কপালে বাড়ি দিয়েছি কে জানে। মাথা ঠুকতে ঠুকতে আমি মাথাটা ভেঙ্গেই ফেলতাম। সোনিয়া আমার ঘাড়ের উপরের জামার অংশ শক্ত করে টেনে ধরে। আমার শেষবারের মতো হুঁশ আসে।

আমি আবার বুক ভরে শ্বাস নিই। থিতু হই। সব বুঝে গেছি। আমি শিশিরকণা। পড়েছি। আবার উঠেও দাঁড়িয়েছি। আমি ভারসাম্য ফিরে পাই। আমি আবার আমাতে ফিরে আসি। কী করব, তা-ই ভাবি। পুলিশ ডাকব? ভাইকে খবর দেব? দারোয়ানকে ডেকে আনব? নীচ তলার ভাড়াটিয়াদের কাছে গিয়ে কাঁদব?

না। যতক্ষণ পারি, নিজের চেষ্টা নিজে চালিয়ে যাব। মনের চোখে দেখি সিসিফাস পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে মনের সুখে ভারী পাথরটা উপরের দিকে ঠেলে চলেছে। পিস্তল দিয়ে গুলি করে দরজার ছিটকিনি খোলার কথা ভাবি। কিন্তু গুলি যদি তার গায়ে লাগে। বাথরুমের কোথায় সে আছে, তা-তো আমি জানি না। এ বাড়ির এক মাত্র অস্ত্র দা। মায়ের অস্ত্র। মেয়ের অস্ত্র। যা আমরা প্রদর্শন করি।

"সোনিয়া! দা আন!" আমি চেঁচিয়ে উঠি।

চব্বিশ

"আপনার আম্মার কী অসুখ ছিল?"

আমি প্রশ্নকারী অফিসারটাকে প্রথম বারের মতো ভাল করে দেখি। মনে নাই কত বার আমি তার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। তবে এবার মনে হয় গুনতে হবে।

আমাদের সামনে খাটের উপর আমার মায়ের দেহ সোজা হয়ে শুয়ে আছে। আমি আর সোনিয়া তাকে খাটে এনে শুইয়েছি। আমি নিজে তার উপর লাল চাদরটা বিছিয়ে দিয়েছি।

মা যে এত নীরবে চলে যাবে, সে কথা ভাবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমি যাই করি না কেন, মা আমার জন্য বেঁচে থাকবে। আমার বিশ্বাস ছিল সন্তান হিসাবে তাকে অত্যাচার করার সব অধিকার আমার। মা হিসাবে সে সব অত্যাচার হজম করতে বাধ্য। সেও হয়তো তাই মনে করত। আমি তার জন্য কোনও যুক্তির জায়গা রাখিনি। তাই সে যা সহজে করা যায়, তা-ই করেছে। জানি না সে কোথাও কোনও কাগজের এক কোনায় কিছু লিখে রেখে গেছে কি না। তবে আমি তা পড়তে পারছি, কারণ তা আমার কানে বার বার বাজছে, “দেখ্, দেখে নেয়। মা ছাড়া পৃথিবী কেমন?”

মা ছাড়া পৃথিবী আমি মানতে পারছি না। বিশ্বাসও করতে পারছি না। বিশেষ করে এমনভাবে চলে যাওয়া। পুলিশের জেরার মধ্যেও আমার চোখ তার দিকে ছিল। যদি একটু নড়ে ওঠে। কয়েকবার মনে হয়েছে, নড়ে উঠেছে। কয়েকবার মনে হয়েছে, নাকের উপর চাদরের অংশটা একটু উঠানামা করেছে। একবার গিয়ে মাথার কাছে দাঁড়ালামও। তারপর বুঝলাম, আমি ভুল দেখেছি। জনাব পুলিশ কর্মকর্তা আমাকে এতটা সচেতন করে রেখেছে যে, আমার ভুল বুঝতে বেশি দেরি হয়নি। আগেও আমরা এমন ঝগড়া অনেক বার করেছি, যদিও দা দিয়ে কখনও তাকে আমি চেপে ধরিনি।

আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে আমি একটু মায়া দেখালে, সে নিজেকে এত তাড়াতাড়ি শেষ করে দিত না। আমার অপরাধের হিসাবে আর একটা খুন যোগ হল। সেটা আমার কাছে বড় বিষয় নয়। বড় বিষয় হল আমার দেয়া কষ্ট চিন্তা করতে করতে মা মরে গেল।

“দেখ্, দেখে নেয়। মা ছাড়া পৃথিবী কেমন?”

আমি যে অসুস্থ তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? না হলে আমি কি আর তার গলায় দার পিঠ দিয়ে পোঁচ দিতাম? মায়ের নিথর দেহ জড়িয়ে ধরে কষ্টে আর ভালবাসায় অনেক কেঁপেছি। কাঁপন ধরে রাখতে পারিনি। তারপর পুলিশ এল। তারপর অনেক কিছু হল। তারপর আমি অফিসারের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছি। একই প্রশ্ন। বার বার এল। এই যে আবার এল।

“আপনার আম্মার কী অসুখ ছিল?”

আমি অফিসারের চোখে চোখ রাখি। আমার মন শক্ত হয়। এখন আমার জীবনে প্রলয় চলছে। এর চেয়ে সর্ববিধ্বংসী প্রলয় আমার কাছে আর কিছু হতে পারে না। আমার মায়ের চলে যাওয়া। এখন আমাকে কাঁপানো সহজ। মায়ের মৃত্যু নিয়ে অনেক সময় ধরেই লড়ে চলেছি। হোক তা মাত্র দুই ঘন্টা। যা লড়ার লড়েছি। যা কাঁপার কেঁপেছি। হয়তো বাকি জীবন কেঁপেই যাব। কিন্তু যে ভাবে অফিসার স্যার কাঁপাতে চায়, সে ভাবে আমি কাঁপব না। আমি শিশিরকণা শুধু কাঁপার জন্য জন্মগ্রহণ করিনি। পৃথিবীর সব কিছু আমি মেনে নিয়েছি। বিনিময়ে আমি একটা জিনিস চাই। আমার বিজয়। সেই বিজয় আর কারও উপর নয়। আমার এই মন আর এই দেহের উপর আমার বিজয়। সিসিফাস, তুমি পাথর ঠেলো। আপাতত আমি এই অফিসারের ঠেলা সামলাই। আমার একটা নিঃশ্বাস পড়ে।

“আপনার আম্মার কী অসুখ ছিল?”

আমি অফিসারের মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক বার দেখে নিই। আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আর এক বার। শুধু আর এক বার মাত্র শান্ত থাকব। তারপর আমি তাকে দেখাব আমি কি শিশিরকণা? না দোজখের আগুন?

“আপনার আম্মার কী অসুখ ছিল?”

“ওসিডি।”

“কেমন অসুখ এটা।”

“অবসিসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার।”

অফিসারের মুখটা সামনের দিকে ত্রিশ ডিগ্রি ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু ওর চোখের মণি উপরের দিকে ওঠে যাতে আমার উপর থেকে ওর দৃষ্টি সরে না যায়। জানি না বিপদে-আপদে সুন্দরী মেয়েদের কামাবেদন বেড়ে যায় কি না। না হলে সে এমন করে আমার দিকে তাকাবে কেন? তার নাক থেকে ধোঁয়ার গন্ধ আসে। আমি ভাবি আমার কাজ সারা। সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে না পেরে দুনিয়াতে আমি কেয়ামত তৈরি করেছিলাম। এখন কী করব? তবে গন্ধটা ক্ষীণ। আর তা আমার সহ্যের সীমার বাইরে যাচ্ছে না। তা ছাড়া আমি তো আর সেই শিশিরকণা নাই। এখন আমার তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। ধরে নিলাম মায়ের মৃত্যু আমার ধোঁয়ার অসুখ সারিয়ে দিয়ে গেছে।

অফিসারটা মনে হচ্ছে ওসিডি কথাটা প্রথম শুনল। অবশ্য এই অসুখ সম্পর্কে না জানার জন্য ওকে দোষ দেয়া যায় না। মানুষ কোনও রোগ সম্পর্কে জানে তিন ভাবে: তার নিজের রোগটা হলে, বা বই পড়ে, বা টিভি সিনেমায় দেখে। আমি নিজেও এক সময় এ রোগের নাম জানতাম না। যদিও এর সাথে আমার আর আমার মায়ের আজীবন বসবাস। আমি অফিসারকে দোষ দিই কী করে?

“কী বললেন?” অফিসার প্রশ্ন করে।

“অবসিসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার।”

“কেমন অসুখ এটা?”

“কারও জন্য এটা কোনও অসুখই না। আর কেউ কেউ এ অসুখে এত কষ্টে থাকে যে, সে, যে তাকে জন্ম দিয়েছে, তাকে দা নিয়ে খুঁজতে থাকে কোপানোর জন্য।”

অফিসার মাথা নিচু করে। মনে হয় একটা কিছু চিন্তা করছে। তারপর মাথা তোলে।

“আপনাদের দুজনের কারও গলায় দায়ের পোঁচ নাই,” অফিসার বলে।

আমার একটু হাসতে ইচ্ছে করে।

অফিসার আমার হাসির রেখা অনুসরণ করে। “কী অসুখ এটা?”

“এটা মস্তিষ্কের একটা ডিসঅর্ডার।”

“কী বললেন?”

“এটা একটা মানসিক রোগ।”

“কেন এ রোগ হয়?”

“কারও ব্রেনের সামনের অংশ অস্বাভাবিকভাবে বেশি সক্রিয় থাকে। এ ধরনের মানুষ তাদের চিন্তা বন্ধ করতে পারে না। আর অতিরিক্ত চিন্তা হল ওসিডির কারণ।”

ছেলেটার ভুরুর অংশটা কুঁচকে গেছে। এই প্রথম তার চোখ দুটি আমাকে খুঁজছে না। তার চোখের মণি কর্মহীন। তার মগজ সচল, তা আমি বুঝতে পারি। সে খুঁজছে নিজেকে। নিজের ভেতর কিছু। তার মুখটাও একটু শুকিয়ে গেছে। বোধ হয় সে নিজের ভেতর ওসিডি খুঁজছে।

আমি জানি সব মানুষের ওসিডি আছে। এই ছেলেটারও আছে। এর ওসিডির মাত্রা কতটুকু, তাও আমি অচিরেই জেনে যাব। ওসিডিযুক্ত মানুষ বেশি বেশি চায় অথবা কিছুই চায় না। ওর ওসিডি যদি বেশি থাকে, তা হলে ওকে নিয়ে আমার চিন্তার কারণ আছে বই কি। দেখা যাক।

ছেলেটা মুখ তোলে। আমি আবার ধোঁয়ার গন্ধ পাই। এবার একটু বেশি। কিন্তু আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আসলেই আমার ধোঁয়ার অসুখ সেরে গেছে। আর ছেলেটাকে মনে হয় সে বড় একটা সমস্যা থেকে এই মাত্র মুক্তি পেল। ওর গালের স্বাভাবিক কড়া রঙ ফিরে এসেছে। একটু দ্যুতিসহ। মনে হল ও নিশ্চিত হয়ে গেছে ওর ওসিডি নাই। আমার নিঃশ্বাস অগভির হয় আর তা গলার নিচে হাড্ডিতে ভেতর থেকে আঘাত করে। এটা ভাল লক্ষণ নয়।

“কী ভাবে এ রোগ হয়?” অফিসার বলে।

“আমরা জানি না।”

“কে জানে?”

“কেউ জানে না?”

“তা হলে আপনি জানলেন কী ভাবে?”

“পড়াশুনা করে?”

“আপনি কি আমার চেয়ে বেশি পড়েছেন?”

“তা আমি কীভাবে জানব?”

“আমি মালথাস, হিরোডোটাস, আলবেরুনি, ইমাম গাজ্জালি পড়েছি।”

আমি আমার চোখের পাতায় টান অনুভব করি। অফিসারের চোখ বড় হয়। নিশ্চয়ই আমার চোখ বড় হওয়ার প্রতিক্রিয়া। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, “আমি ও সব পড়িনি।”

“আপনি কী পড়েছেন?”

“আমি ওসিডি সম্পর্কে জানার জন্য টুকটাক এটা সেটা পড়েছি।”

“শুধু আপনি পড়েছেন? আর কেউ পড়েনি?”

“অনেকেই পড়েছে।”

“এই যে আপনি বললেন, কেউ জানে না।”

আমার অজান্তেই নিঃশ্বাসটা আবার ঝরে পড়ে। এতক্ষণ শক্ত হয়ে থাকাতে এখন ব্যথায় বুকের পাঁজর টনটন করছে।

আমার মা যেমন ছিল তেমনি আছে। এর মধ্যে আর মনে হয়নি, সে নড়েছে।

আমি অফিসারের চোখের দিকে চাই। তারপর চোখ সরিয়ে নিই। আমি মনে মনে বলি, পুত্র আমার, আমি তোমাকে বুঝি। তুমি আমার সাথে প্রেম করতে চাও? তোমাকে দোষ দেব না। আমার জান্নাতবাসি জননীতো তোমার কেউ না। তার লাশের উপস্থিতি তোমার বাসনা দমনে কোনও ভূমিকা রাখছে না। তা ছাড়া পৃথিবীতে কত সন্তান সহবাসের আগুন নেভানোর জন্য পিতামাতার লাশ দাফন করা পর্যন্ত ধৈর্য রাখতে পেরেছে? তোমার প্রেমের জোয়ার উঠবে, এটাই জানা কথা। যখন আমার মতো ছিনাল তোমার সামনে। তারপরও বলব, বাবা ইন্সপেক্টর, তুমিও দুর্লভ। এ দেশে তোমার মতো ছেলেকে যদিও একটু বেমানান লাগে। পিঠ সোজা করে বসাতে তোমাকে আরও লম্বা লাগছে। বাসনা আমার স্যারকে আমার পায়ের উপর ফেলেছিল। বাসনা তোমার পিঠ ঠেলে ধরে আছে। তবে তোমার গায়ের রংটা বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ট্রেনিং করে তোমাদের গায়ের রং বদলে যায়। অবশ্য তোমরা যারা উঁচু পদে যেতে পারো তাদের ত্বকের মূল রং আবার ফিরে আসে। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকটাতে তোমাদের সবার গায়ের রং আমার কাছে একই মনে হয়। আমার দুধ-রঙের খালাত ভাই দুই বছর নৌবাহিনীর ট্রেনিং করে যখন বাড়ি আসে তখন ওকে চিনতে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল। ওর সাদা রং বদলে হয়েছে চামড়া খালানো পোড়া মিষ্টি আলুর পিঠে আলকাতরার প্রলেপ লাগিয়ে তৈরি করা একটা কিছু, প্রায় সীসার রঙের কাছাকাছি। ওকে দেখে মন খারাপ হয়েছিল। নৌবাহিনীর ছেলেগুলিকে কত কষ্ট দেয়া হয় সমুদ্রে। তোমাকে কোথায় পোড়ানো হয়েছে, কে জানে? শারদাতে নিশ্চয়ই। রাজশাহী কলেজে পড়ার সময় মায়া খালার ছেলে শেখর ভাইয়ের গায়ের রং ছিল সাদা। ওকে তখন আমরা ধলা গাই বলতাম। আমাদের রংপুরের বাড়িতে তখন ওর রঙের একটা গাভী ছিল। ওটা দিনে আঠারো সের দুধ দিত। আমাদের গ্রামের বাড়িতে পাঁচ প্রজন্ম ধরে কাঁসার পাতিলে দুধ মাপা হত। পাতিলটা ওখানে এখনও আছে। ওটাতে দুধ মাপা হয় সের হিসাবে। আটাশটা দাগ আছে ওটাতে। আটাশ সের দুধ ধরে। আমার বাবা-মার প্রেম আমার কাছে আদর্শ। বাবার সব কিছু মা আপন করে নিয়েছে। ওই কাঁসার পাতিলটা মা এ বাড়িতে নিয়ে এসেছে। একটা কক্ষকে জাদুঘর বানিয়ে মা আমার দাদার বাড়ির সব কিছু ওখানে রেখেছে। কত ভাল স্ত্রী পেয়েছিল আমার বাবা। মগজের একটুখানি ত্রুটি সব শেষ করে দিল। সে ত্রুটি নিয়েও মা বাবার জীবনটাকে মধুময় করে রেখেছিল। আঘাত দিলাম আমি। সে চলে গেল। কী করে তোমাকে ওসিডির সব কথা শিখাই। আমি যে এক সাথে এত কথা ভেবে নিলাম, খালাত ভাই থেকে শারদা থেকে দুধ মাপার পাতিল, এই ভাবনাটাও ওসিডির অংশ। আমি যেহেতু আমার ওসিডি সম্পর্কে সচেতন, তাই আমি চিন্তাটা আবার কেটেও দিতে পেরেছি। যারা সচেতন না, বা সচেতন থাকতে চায় না, বা সচেতন থাকার চেষ্টা করে না, তাদের চিন্তার এই নিরন্তর ধারা কেটে ফেলার জন্য ওদের পিঠে বেতের বাড়ি দিতে হয়, অথবা ওদের জন্য আকাশ থেকে বজ্রের শব্দ আসতে হয়, কিংবা টায়ার পাংচার হওয়ার শব্দ, বা ট্রান্সফর্মার ফেটে যাওয়ার শব্দ, কিংবা ভূমিকম্প। কিন্তু, বাবু, তুমি কি এখন কোনও কিছু শেখার মেজাজে আছো? না, নাই। এই যে তোমার চোখ বার বার আমার বুকের বাম সলতেতে আটকে যাচ্ছে, তা কি আমি খেয়াল করিনি? আমি ওড়নাটা টানতে পারছি না, কারণ তোমাকে ব্রিবত করতে আমার মায়া লাগছে। আমার আবার মায়া একটু বেশি। কাউকে লজ্জা দিতে পারি না। এটাও হয়তো ওসিডির অংশ। আচ্ছা, বাবু, দুটো সলতে উঁকি দিলে কী দশা হত তোমার? তুমিও বোধ হয় জানো, ওরা ঘুমাচ্ছে। ওদের মৃতই বলা চলে। আমার মায়ের শোকে। কিন্তু তাতে তো তোমার দেখার সাধ এতটুকু কমেনি। বরং আমিতো দেখছি, তা বেড়েই চলেছে। তুমি এখন বাসনার শিকলে বন্দি। আমি ব্যবস্থা নিলে এক ফুরুতেই তোমার বন্দি-দশা গুছে যাবে। তুমিতো তা-ই চাও, খোকা, তাই না? কিন্তু, বাবা, তুমিতো আমার মায়ের মতো মা পাওনি। পেলে তুমি তোমার মায়ের কথা মনে করতে। মনে তোমার সমবেদনা জন্ম নিত। আর তুমি আমার এই সব পরীক্ষা নিতে না। অথচ তুমি পরীক্ষা নিচ্ছ। নাও। আমি পরীক্ষা দিতে রাজি আছি। এখন আমি তোমার বিয়ের কনে। যত ইচ্ছা আমাকে দেখো। আমার পরীক্ষা নাও। আমাকে দাঁড়াতে বলো যাতে আমার পায়ের গোড়ালি দেখতে পারো। চুলগুলো টেনে ধরে তার ওজন মাপো। করো বাপু করো। তবে জেনে রাখো, পুত্র আমার, আমার ধৈর্য এর মধ্যে চলে গেছে।

দিনের পর দিন সিগারেটের ঘষা খাওয়া তোমার কালো ঠোঁট দুটি যেন কম্পিউটারের মনিটর। ওই দুটিতে তোমার মনের সব কথা খোদাই হয়ে যায়। আর তোমার চোখের কথা না হয় না-ই বললাম। তোমাতে আর আমার স্যারের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। স্যার যে এখনও তানিয়ার সাথে আছে তাতেও আমার কোনও সন্দেহ নাই। স্যার নিজে ইয়াবা সেবন করার কথা নয়। তবে তানিয়াকে নিশ্চয়ই তা গেলাচ্ছে। স্যার জানেন কী ভাবে ঝরে না গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘষতে হয়। তানিয়া তা জানে না। তাই তানিয়ার ইয়াবা দরকার। স্যারের তা দরকার নাই। স্যার সচেতন। তানিয়া অসচেতন। তবে দুজনেরই ওসিডি আছে। আমার মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে স্যার খুব খুশি হবেন। ভাববেন, আহা কী মজা, কী মজা? শিশিরকণার বাড়ি খালি। এত দিন দেয়নিতো কী হয়েছে? এবার দেবে। বড় ভুল হয়ে গেছে। মাথাটা ওর হাঁটুতে ঠেকিয়ে। এবার ব্যায়াম করে কোমরের পেশি লম্বা করে নিই। তারপর আর শিশিরকণার হাঁটুতে নয়, একেবারে পায়ের পতার উপর পড়ব। দেখি শিশিরকণা আমাকে কী ভাবে ফিরিয়ে দেয়? মেয়েদের আমার চেনা আছে। খালি বাড়ি স্যারের ওসিডি। কারণ স্যারের দরকার খালি বাড়ি। যদি ওনার বাপমা মরে গিয়েও বাড়িটা খালি করে দেয়, স্যারের তাতে কোনও অসুবিধা নাই। ওসিডি যেমন আমার মাকে বারবার পানিতে নিয়ে যেত, ওসিডি তেমন স্যারের মুষ্কে অবিরাম বাসনার রস তৈরি করে। ওসিডি তানিয়াকে বার বার মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এই যে অফিসার খোকা, ওসিডি তোমাকে দিয়ে তোমার ঠোঁটে বার বার পেট্রোলিয়াম জেলি মাখায়। বাবা অফিসার, তুমি আমার কাছে ধরা খেয়ে গেছো। সিগারেট খাওয়া মোটা ঠোঁট দুইটাকে উপস্থাপনযোগ্য করার জন্য তুমি তাদের উপর ঠেসে ঠেসে পেট্রোলিয়াম জেলি মেখেছো। পেট্রোলিয়াম জেলি আমার প্রিয় জিনিস। তবে তাতে আমার ওসিডি নাই। কিন্তু তোমার আছে। আমার ওসিডি আছে ওসিডি নিয়ে। পৃথিবীতে কার কার ওসিডি ছিল না, তা আমি বোঝার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এমন কারও সন্ধান পাইনি যার মধ্যে আমি ওসিডি দেখিনি। দেখা যাক আমার কথা শুনে বিজ্ঞানীরা নতুন কোনও তথ্য দেয় কি না। তারা নতুন তথ্য দিলে আমি আমার ভুল সংশোধনের সুযোগ পাব।

"আপনি বলেননি ওসিডি কেন হয়।"

ছেলেটাকে এতক্ষণ আমার কটাক্ষ দিয়ে থামিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। যেই আমার চোখ নরম হল, তেমনি সে আবার আমার উপর চড়ে বসল।

কী আর করা? আমি নড়েচড়ে বসি। গলা এক স্বর খাদে নামাই।

"বলিনি?"

"না।"

"বলতে হবে?"

"জি।"

"কেন?"

"এটা পুলিশের কাজ। আনন্যাচারাল ডেথ।"

"কোনটা ন্যাচারাল ডেথ?"

অফিসার হোঁচট খায়।

"আপনার পকেটে ভেসলিন আছে?"

ছেলেটা আবার হোঁচট খায়। এবার অনেকটা লাফ দেয়ার মতো করে। দুই সেকেন্ডে মাথাটা পাঁচ বার কাঁপিয়ে বলে, “জি?”

“আপনি ঠোঁটে কী লাগিয়েছেন?”

“ভেসলিন।”

“আপনার পকেটে ওটা আছে?”

“জি।”

“দেখা যাবে?”

“জি?”

“একটু দেখতে পারি?”

“কেন?”

“একটা কাজ আছে।”

“কী করবেন?”

“ভেসলিন দিয়ে কী কী করা যায়?”

ইন্সপেক্টরের চোখ দু’টি আমার চোখের দিকে তীরের মতো ছুটে আসার জন্য প্রস্তুত, একেবারে সে রকম একটা পজিশনই ওরা নিয়েছে ওর অক্ষিকোটরে, যার ছাদের উপর যত্ন করে আঁচড়ানো ঘন ভুরুজোড়া। ছেলেটার চোখে মায়া আছে। চোখের মায়া আমি ভালবাসি। ছেলেটার চোখের মায়া আমার বুকে হালকা একটা ঢেউ তৈরি করে।

“জি? জি?” ছেলেটা বলে।

“আপনি বলছিলেন আমি আপনার ভেসলিন দিয়ে কী করব।”

“জি।”

“ভেসলিনের কৌটাটা দেখা যাবে?”

ইন্সপেক্টর মুখ কাঁচুমাচু করে। ওর চোখের মায়া আরও বেশি ফুটে ওঠে। সুন্দরবনের ঝোপের আড়ালে দেখলে ওদুটিকে হরিনের চোখ বলে মনে হত।

“আপনার ভেসলিনের কৌটা দেখা যাবে কি যাবে না?”

“অনেক পুরনো।”

“কী অনেক পুরনো?”

“ভেসলিনটা।”

“যত পুরনো তত ভালো।”

অফিসার দাঁড়িয়ে যায়। রক্ত ওর গায়ের ত্বকের নিচে ধেয়ে আসে। ওরে আমার আঁধার মানিক।

“বের করেন,” আমি বলি।

অফিসার তার ডান হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকায়। পুলিশের ইউনিফর্ম বলে কিনা জানি না, ওর লম্বা হাতটা অনেক দূর ঢুকে যায়। মনে হয়ে পকেটটা ওর হাঁটুর কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। অফিসার পকেট থেকে একটা ছোট ভ্যাসলিনের কৌটা বের করে। আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর শরীরের উপরের অংশ প্রায় ষাট ডিগ্রি বাঁকিয়ে সে কৌটাটা আমার দিকে মেলে ধরে।

ছোট্ট একটা কৌটা। অনেক পুরনো। ল্যাবেলের অর্ধেক উঠে গেছে আর তার গোড়ায় তেলমাখা ধুলার একটা হালকা ধূসর আস্তরণ জমা হয়েছে।

“খোলেন,” আমি বলি।

সে কৌটাটা খোলে। ঢাকনার নিচে কৌটার মুখে লাগানো অ্যালুমিনিয়ামের কাগজটা যত্ন করে ভাঁজ করা। পুলিশের ট্রেনিং ভালই নিয়েছে। জেলিটুকু হলুদ হয়ে গেছে।

“এতটুকু ভেসলিনতো আপনার ঠোঁটেই পাওয়া যাবে।”

“জি, এটা ক্লাস নাইনে পড়ার সময় কিনেছিলাম। বাসায় বড় কৌটা আছে। এটা শুধু পকেটে রাখি। যদি কখনও ঠোঁট শুকিয়ে যায়, তখন এখান থেকে একটুখানি নিয়ে ঠোঁটে লাগাই।”

“রেখে দেন,” আমি বলি।

“জি?”

“ওটা আপনার পকেটে রেখে দেন। ঠোঁট শুকিয়ে গেলেইতো দরকার হবে।”

“জি?” অফিসারের মুখ শুকিয়ে যায়।

“অসুবিধা নাই,” আমি বলি। “দরকার হলে এক লিটারের একটা কৌটা দেয়া যাবে। ফ্রেশ জেলি। এখনও খোলা হয়নি। আমার কাছে আছে।”

“জি ম্যাডাম?”

“কতটা ভেসলিন লাগবে আপনার?” আমি গলাটা আর এক স্বর খাদে নামাই। একই গান তিন মিনিটেও গাওয়া যায়, আবার ত্রিশ মিনিট ধরে ওই গান দিয়ে একটা ভরাট মেহফিলকে বুঁদ করে রাখা যায়। গুলো মে রঙ্গ ভরে বাদ-এ-নবাহার চলে। মেহদি হাসান। কেসেটে গেয়েছেন পাঁচ মিনিটে। মঞ্চে গান পঁচিশ মিনিট ধরে।

“একটা শশা আর দুইটা আমড়ার গায়ে মাখানোর মতো ভেসলিন হলেইতো আপনার চলবে, তাই না?”

অফিসার আবার হোঁচট খায়। তারপর থিতু হয়। অফিসারের মুখের ভেতর থেকে তরল এসে তার নিচের ভেসলিনভেজা ঠোঁটটার উপর চুইয়ে পড়ে।

“গিলে ফেলেন।”

“জি?”

“মুখ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।”

বেচারা এবার সচেতন হয়। আর ঢোক গিলে। ওর ঠোঁটের পাড়ে জমা হওয়া প্লাবনও শুকিয়ে যায়।

আমার মায়া লাগে ছেলেটার জন্য। ও যদি আমার সন্তান হত আর কেউ যদি ওকে এরকম কষ্ট দিত, তাকে আমি দা দিয়ে কোপাতাম।

“বিয়ে করেছেন?”

“জি না, ম্যাডাম।”

“করবেন?”

“জি?”

“বিয়ে করবেন?”

“জি?”

“বিয়ে করবেন না?”

“কাকে?”

“আমাকে!”

“আপনাকে?”

“কী বলছেন আপনি?”

“আমাকেতো আপনার পছন্দ হয়েছে।”

“আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, ম্যাডাম।”

“আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি?”

“জি?”

“নিশ্চয়ই আমাকে আপনার বিয়ের কনে মনে হয়েছে। তাইতো ঘুরে ফিরে বারবার একই প্রশ্ন করে গেলেন।”

“দেখুন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না,” ছেলেটা বলে। “আমরা এ সব কথা বলছি তা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আপনি কি সিরিয়াস?”

“খুব সিরিয়াস।”

“আমি ধরে নিচ্ছি আপনি আমার সাথে তামাসা করছেন না।”

“মোটেই না।”

“তা হলে শুনুন,” ছেলেটা বলে। “বিষয়টা আপনাকে একটু খুলে বলি। আমি এখন বিয়ে করতে পারব না। আমার পাঁচটা বোন আছে। পিতার দুটো স্ত্রী। আমার তিনটা বোনের বিয়ের বয়স হয়েছে।”

“তা হলে?”

“যদি বছরখানেক সময় দেন?” ছেলেটা আমার দিকে জিজ্ঞাসু-চোখে চায়।

“আমার বয়স কত জানেন? আপনার মার থেকে বেশি হবে।”

“সমস্যা নাই,” ছেলেটা বলে।

“আপনি যখন তালগাছ হবেন তখনতো আমি শুকিয়ে যাব।”

“আমার কোনও সমস্যা নাই।”

“ও তাই নাকি? আপনি বেশ হঠকারী ছেলে। নগদের কথা বলেন। এখন কী করতে পারবেন?”

অফিসারের মুখ হা হয়ে যায়।

“বন্ধ করেন,” আমি বলি। “বসুন্ধরায় অনেক মাছি।”

অফিসারের মুখ আরও বেশি করে হা হয়।

“বিয়ে কী শুধু এক রকম?”

“জি?”

“এক রকম বিয়ে করতে পারলেইতো আপনি খুশি।”

“জি?”

“এখানে আমার মায়ের লাশ। বৈঠকখানায় আপনার বাহিনী। চলেন পাশের ঘরে যাই। সেখানে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন।”

“ম্যাডাম, আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন।”

এবার আমার হোঁচট খাওয়ার পালা। আমি ছেলেটাকে আরও ভাল করে দেখি। দেখি ও সত্য কথা বলেছে। বাসনা আছে। তবে তা নিবৃত্তি করার জন্য যে কোনও পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করার মতো ছেলে এ নয়। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার খুব ভাল লাগে। মানে এই পরিবেশটাকে ভাল লাগে। একটা ভাল মানুষের সামনে বসার ভাল লাগা।

“ঠিক আছে,” আমি বলি। “তা হলে আমাকে আমার মায়ের অসুখ নিয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ করেন।”

ওকে আর বললাম না, ওর কথার জবাব দিতে আমার কত কষ্ট হচ্ছিল। আমার মা’র জন্য। তবে সিদ্ধান্ত নিই। যদি আবার বিয়ে করি, ওর মতো একটা ছেলেকেই বিয়ে করব। ও যদি বিয়ে করার মতো অবস্থায় থাকে, আর ও যদি আমাকে বিয়ে করতে চায়, আমি ওকেই বিয়ে করব। ওর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে জীবন পার করে দেব। দিন দিন ওর মায়া ভরা চোখের জন্য আমার মায়া বাড়াব। আর কিছু আশা করব না। ছেলেটা আমাকে বিয়ে করতে পারবে না। পাঁচটা বোনকে ওর বিয়ে দিতে হবে। অন্তত তিনটাকে পার করতে হবে নিজের বিয়ের আগে। আমারতো ক্ষমতা আছে। আমিই বা কেন ছেলেটার বোন তিনটাকে বিয়ে দিয়ে দিই না। তারপর ও যদি আমাকে বিয়ে করতে চায়, আমি হ্যাঁ বলব, ও কবুল বলবে। দেখা যাক। ওর পিছনে লেগে থাকব।

কিন্তু কী ভাবে?। আমার মনে অনেক কষ্ট। আমার মা'টা এভাবে চলে গেল। যখন দা'টা মা'র গলার উপর চালালাম, তখনই মা খুন হয়ে গেছে।

পঁচিশ

আমি ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসা। আমার উল্টো দিকে বসা মায়া খালা। গত রাত থেকে এ পর্যন্ত পুলিশসহ মোট তেরো জন এ বাড়িতে ঢুকেছে। সবাই তাদের জুতা সেন্ডেলের কাদা রেখে গেছে। মেঝের দিকে তাকিয়ে মনে হয় কেউ কেউ ইনানি বিচের ধূসর বালিতে হেঁটে এসে সরাসরি এ বাড়িতে ঢুকেছে। বন্যা এখন নাই, শুধু কাদা আছে। মেঝে এখনও ভেজা। পুলিশকে এগিয়ে দিতে গিয়ে আমাদের দারোয়ান লোকমান আছাড় খেয়ে পা মচকায়। সে এভারকেয়ার হাসপাতালের জরুরি বিভাগে গিয়ে পায়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে এসেছে। লোকমান একটা ক্রাচ নিয়ে হাঁটছে। পা ফেলতে গিয়ে ব্যথায় ওর মুখ বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। পানি চুষে ওর সাদা ব্যান্ডেজ ধূসর হয়ে গেছে। তবুও লোকমান আমার পাশে আছে।

আমি আমার ভাই রাশেদকে দেখছিলাম। সে ড্রয়িং রুমের দরজা থেকে উল্টো দিকে হাঁটা ধরেছে, ওই মাথার বারান্দার দিকে। জানালা পর্যন্ত গিয়ে সে আবার আমাদের দিকে ফেরে। এবার সে দরজার দিকে রওয়ানা করে। তার এই আসা-যাওয়ার পথের ধারে আমাদের ছয় চেয়ারের ডাইনিং টেবিল। এক সময় দশ চেয়ারের টেবিল ছিল। আমার আব্বার সোজা হিসাব। আমি আমার স্বামী আমার দুই সন্তান। রাশেদরা চার জন। মা আব্বা। দশ জন। কোনওদিন কোটা পূরণ হয়নি। রাশেদ বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর ওই টেবিলটা এক সরকারি চাচা কিনে নিয়ে যান। তারপর আমি আর মা এই টেবিলটা কিনি।

আমার সামনে দিয়ে যেতে যেতে রাশেদ আড় চোখে এদিক-ওদিক তাকায়। সে গোপনে মায়া খালার দিকে বার বার তাকায়। মায়া খালা আমার দিকে ফিরে বসাতে উনি এই মুহূর্তে রাশেদের চাহনি দেখতে পাচ্ছেন না। আমার ভাই এত সতর্ক ভাবে আড়-চোখে চায় যে, ও ভাবছে আমি বুঝি ওর চোখের বিচরণ বুঝতে পারছি না। আমি চুয়াল্লিশ বার পর্যন্ত গুনেছিলাম ওর পায়চারির সংখ্যা। তারপর গোনা বাদ দিয়েছি। পায়চারির পথে ও সবার দিকে একটু আধটু যায়। শুধু শেখর ভাইয়ের দিকে ছাড়া। শেখর ভাই বসে আছে বাইরের দরজার উল্টো দিকে একটা আরামকেদারায়। শেখর ভাই, মায়া খালার বড় ছেলে, নৌবাহিনীর কমান্ডার। আজকের দিনে এটা আমার জন্য আল্লাহর অশেষ রহমত যে শেখর ভাই জার্মানি থেকে ফিরে এসেছে। পোস্টে জয়েন করার আগে কয়েকদিন সময় আছে হাতে। মায়ের সাথে থাকছে। ভাবী আসেনি। তাতে কি? শেখর ভাইতো এসেছে। শেখর ভাই রাশেদের সব কিছু দেখছে। কিন্তু রাশেদ একবারও শেখর ভাইয়ের চোখের দিকে তাকায়নি। তার দরকারও নাই। রাশেদের লক্ষ আমি। এবার আমাকে দেখতে গিয়ে আমার সাথে রাশেদের চোখাচুখি হয়ে যায়, আর আমিও সাবধানতা অবলম্বন করি, যাতে আমার চোখের পাতা না নড়ে। রাশেদ হোঁচট খায়। তারপর অন্য দিকে মুখ ঘুরায়, আর পদক্ষেপ দীর্ঘতর করে।

রাশেদ আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট। দেখে অবশ্য ওকে আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় মনে হয়। ওর দাড়িগুলো সুন্দর করে ছাঁটা। শত-করা চল্লিশভাগ দাড়ি পেকে গেছে। ওগুলিতে এখন মেহেদির ভোতা লাল রং। মাথাভর্তি চুল। সেটাও কুড়ি ভাগ সাদা, এবং একই ভাবে মেহেদি রঙে রঙিন। রাশেদ কালো পাজামা আর পাঞ্জাবি পরেছে। ওর বউ ওয়াজিফা বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কানে ফোন লাগিয়ে দরজার দিকে ফিরে আছে। ঘরে ঢুকেই সে ফোন কানে লাগিয়েছে। তার ফোন আর কানের মাঝে কালো হিজাবের বেড়া। চোখে কালো সানগ্লাস, মোটা ফ্রেমের। এর বাইরে তার শ্যামলা নাক আর ছোট কপাল আমি খেয়াল

করতে পারছি। অন্যদের তা পারার কথা নয়। ওয়াজিফার মুখের উপর বোরকার মাথা থেকে বের হয়ে আসা একটা কালো জালির পর্দা ঝুলছে।

ওয়াজিফা ফোনে কথা বলার ভান করছে। সে ফোন কানে নিয়েছে যাতে আমার বা আর কারও সাথে তার কথা বলতে না হয়। সে শেখর ভাইয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান করছে। শেখর ভাই তার দিকে তাকাচ্ছে না। ওয়াজিফার আর রাশেদের এই বাসায় যাতায়ত বহু দিন ধরে বন্ধ ছিল। তবে ওরা ওদের বাচ্চা দুটিকে নিয়মিত আমার কাছে পাঠাত। প্রতি শুক্রবার জামির আর আমিরা আমার সাথে থাকত। ঘরে ঢুকেই ওরা আমার কোলে ঝাঁপ দিত। আমার আঁচল ধরে থাকত কিংবা ওড়নার প্রান্ত। আজকেও ওরা পিতামাতাকে ছেড়ে ফুফুর দুই দিকে জড়ো হয়েছে। কিন্তু সাহস পাচ্ছে না আমার কোলে চড়ার। ছয় বছরের জামিরকে ওরা কালো পাজামা আর পাঞ্জাবি পরিয়ে এনেছে। চার বছরের আমিরাকে পরিয়েছে কালো ওড়না। যেন দাফন একটা উৎসবের ব্যাপার। অবশ্য সে রকম হলে আমার ভালই লাগত। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতো সে রকম নয়। জামির আর আমিরা ওদের বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। আর আমারও সাহস হচ্ছে না ওদেরকে কাছে টেনে নিতে।

দরজা ভাঙলাম। পুলিশ ডাকলাম। মাকে নিয়ে খাটে শোয়ালাম। নিচের ভাড়াটিয়া সবুর ভাই আর তাঁর স্ত্রী রুমা ভাবি আর তাঁদের কাজের ছেলে আনোয়ার আর আমাদের ম্যানেজার মাজহার আর আমাদের দারোয়ান লোকমান সবাইকে নিয়ে বন্যা সেঁচলাম। এত কিছু করলাম কিন্তু এমনভাবে বুক কাঁপেনি। যেমনটা এখন কাঁপছে। রাশেদের ভয়ে। ও শেষ পর্যন্ত কী করবে কে জানে? মার মৃতদেহ শুইয়ে রেখে ও যদি বাড়াবাড়ি করে আমি ওকে খুন করব। খুনির একটা সুবিধা আছে। এক খুনের যে শাস্তি, একশ খুনেরও সেই শাস্তি। এক সময় রাশেদকে খুব ভালোবাসতাম। এর পর রাশেদ নষ্ট হয়ে যায়। এমন নষ্ট যেন গ্রেগর সামসা থেকে রূপান্তরিত পতঙ্গ। কিন্তু রাশেদের মধ্যে ওই পতঙ্গের একটি মানবিক গুণও অবশিষ্ট আছে বলে এখন আর মনে হচ্ছে না। রাশেদকে খুন করতে আমার হাত কাঁপবে না।

শেখর ভাই রাশেদকে মায়ের মৃত্যুর খবর দিয়েছে। মায়া খালা রাশেদ ঘরে ঢোকার পরপরই শেখর ভাই ছাড়া আর বাকি সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। সবুর ভাই আর রুমা ভাবিকে মায়া খালা বলেছে, বউমা আর সবুর, তোমরা একটু কিছু মুখে দিয়ে আবার এসো। আনোয়ার তুইও যা। পারলে আমাদের জন্য একটু ভাত আর কয়েকটা ডিম ভাজি করে নিয়ে আসিস। মাজহার, বাজারে যাও। মায়া খালা মাজহারের হাতে একট লিস্ট আর টাকা দিয়েছেন। শুধু লোকমান রয়ে গিয়েছিল।

“লোকমান, নিচে যা,” মায়া খালা বলেন। “খতম শেষ হলে আমাকে ডাকবি।”

সংগ্রামী মায়া খালা। উনি সাথে থাকলে আর কিছুর দরকার হয় না।

আমার সাথে চোখোচোখি হওয়ার পর রাশেদ কিছুক্ষণ থমকে ছিল। সে আবার পায়চারি শুরু করেছে। আর মুখ খুলেছে।

আমি ওর মুখের বাণী ছোটার জন্যই অপেক্ষা করে ছিলাম, যেমন করে কোনও ক্রীতদাসি মনিবের মদ খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করার সময়টা দাঁতমুখ খিঁচে অপেক্ষা করে। প্রথমে রাশেদ বিড়বিড় করে। ওর বিড়বিড় আমি ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না। ওর ঠোঁট দুটি খোলে আর তারপর জিহ্বাটা নিচের দাঁতের মাড়িতে বাড়ি দেয়। আমি নিজেও তা পরীক্ষা করে দেখি। সত্যি এত লোকের মাঝেও ও বিড়বিড় করে আমাকে গালিটা দিয়ে যাচ্ছে। মাগী মাগী মাগী। আমি অপলকে দেখি কমপক্ষে বিশ বার ওর ঠোঁট খুলেছে আর ওর জিহ্বা নিচের মাড়ির দাঁতের ভেতরের দিকে ঠোক্কর দিয়েছে। ওর গালিতে আমার আজকে কোনও বোধের উদয়

হচ্ছে না। এক সময় এ শব্দটা আমার বুকে ছুরির মতো ঢুকত, আর রাশেদ মুখ খুললেই আমার গায়ে ফোসকা পড়ত।

আর তা কভু হবার নয়, রাশেদ, আমি মনে মনে বলি। ঘৃণার ভাই আমার, এবার তোর গালে খিল ধরবে, কিন্তু তোর গালি আর কখনও আমার গায়ে বিছুটি হয়ে লাগবে না। গতকাল আমি আর মা তোর গালির বিষ ধ্বংস করে দিয়েছি। তোকে কখনও সে খবর দেব না।

রাশেদ তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত নিচু স্বরে আমাকে গালি দিয়েছে কিন্তু আমি ছাড়া কাউকে তা বুঝতে দেয়নি। এখন সে গলা উঁচু করেছে। এখন আমরা সবাই ওর কথা শুনতে পাচ্ছি। রাশেদ এ বাড়ির ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী বর্ণনা করছে। ক্রমে ওর জবানিতে আট জন মানুষের নাম আসে যাদের আমি গিলে খেয়েছি বলে ও সবাইকে জানায়। রাশেদ বলে ওদের কেউ বিষ খেয়েছে, কেউ রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে চলতে চলতে গায়ে তিন ইঞ্চি ময়লার স্তর বাঁধিয়েছে, ওই অবস্থায় থাকতে থাকতে ওদের দেহের চারটা অঞ্চল থেকে চুল লম্বা হতে হতে মাটিতে নেমে এসেছে, তিন জনের লাশ রাশেদ নিজেই নাকি এ ঘর থেকে বের করেছে, দুই জনকে রাশেদ পাগলা গারদে ভর্তি করেছে, এক জনকে সে নিজ উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছে। তবে সেই লোক নিউইয়র্কে ভাল নেই। বিয়ার খেয়ে সে ডাউনটাউনের রাস্তায় রাস্তায় মাতলামি করে, কেউ ভিক্ষা না দিলে তাকে মদের বোতল দিয়ে তাড়া করে। নিউইয়র্ক নাকি পাগলদের স্বর্গরাজ্য। পুলিশ তাদের কিছু বলে না। তাই সেই লোক নিউ ইয়র্কে স্বাধীনভাবে পাগলামি করতে পারছে। রাশেদের কথা হল আমি পুরুষখেকো। ম্যানইটার, রাশেদ ইংরেজিতে বলে। সে সব সময় ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করেছে, এ কথা সে সদর্পে এক বার মায়া খালার সামনে এসে ঘোষণা করে, আর এক বার শেখর ভাইয়ের সামনে গিয়ে ঘোষণা করে। আমার জন্য খাটতে খাটতে রাশেদ শেষ হয়ে গেছে। ওর আজকের জীবনের এই করুণ পরিণতির জন্য আমি দায়ী। রাশেদ বলে, তারপরও আমি কখনও ওকে একটুখানি ধন্যবাদও দিইনি, কৃতজ্ঞতা জানানোতো বহু দূরের কথা। বরং আমি পাগলের হাতে দা তুলে দিয়েছি ওকে কোপানোর জন্য। সে কত কেঁদেছে গত ছয় মাস। মায়ের মুখটা দেখার জন্য ওর বুক ফেটে গেছে। সেই মুখ সে দেখল ঠিকই, কিন্তু তখন তাতে আর প্রাণ নাই।

“এই শোক আমি কোথায় রাখব?” রাশেদ শেখর ভাইয়ের সামনে গিয়ে তার কাছ থেকে জানতে চায়। তারপর দৌড়ে মায়া খালার কাছে আসে। ঘরের ছাদ ফেটে যাবে এমন জোরে চিৎকার করে বলে, “এই শোক আমি কোথায় রাখব, খালা?”

রাশেদের চোখ দিয়ে সজোরে অশ্রু বের হয়ে আসে।

রাশেদ যে আট জনের কথা বলছে আমি তাদের সবার কথা জানি। ওরা এ পর্যন্ত সকলে এক বা একাধিক বিয়ে করেছে। আমি অবশ্য এক জনকে খুন করেছি, কিন্তু রাশেদ তার কথা বলেনি। আর যাকে খুন করেছি, সে আমার অনুরাগীদের দলের কেউ নয়।

“সারা জীবন তুই একই কাজ করে গেলি,” রাশেদ হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসে। “মাকে শেষ করলি। আর কী কী খেলে তোর পেট ভরবে? বল্, মাগী, বল্। আর কী কী খেলে তোর পেট ভরবে? তোর তলপেটে কেন এত ক্ষুধা? দুনিয়াতে কি আর কোনও মহিলা নাই? তুই কেন তাদের মতো হতে পারলি না? কী আছে তোর তলপেটে যা আমাদের চির দুঃখের সাগরে ডুবিয়েছে? তুইতো দোকান বসাতে পারতিস। তুই দোকান বসালি না। উল্টো তুই আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিলি। ওই যে দেখ্, ওই যে।”

রাশেদ মায়ের লাশের ঘরের দিকে তাক করে ডান হাত ঝাঁকাতে থাকে।

ঠাশ্শ্শ্।

কখন শেখর ভাই উঠে এল কে জানে? রাশেদের গালে শেখর ভাই চড় মেরেছে। রাশেদের দাড়ির কারণে রাশেদের গালে চড়ের দাগ বসেছে কি না, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে ডান হাতের তালু দিয়ে সজোরে ডান গালের দাড়ি ঘষছে। গাল ঘষতে ঘষতে সে ওয়াজিফার দিকে চায়। ওয়াজিফা থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু এক কদম এদিকে আসার সাহস পাচ্ছে না। রাশেদ জামির আর আমিরার দিকে চায়। বিহ্বল বাচ্চা দুটির গাল শুকিয়ে গেছে। ওয়াজিফার উপর আমার রাগ হচ্ছে। কেন সে বাচ্চা দুটিকে ধরছে না? আমার সাহস হচ্ছে না ওদের হাত ধরার। কারণ আমি ধরলেই রাশেদ আমাকে গালি দিবে। মায়া খালা বাচ্চা দুটির অবস্থা খেয়াল করেন। উনি গিয়ে দুই বাচ্চার দুই হাত ধরে ওদেরকে ওনার দুই পাশে টেনে আনেন। ওরা দুই পাশ থেকে মায়া খালার দুই পা আঁকড়ে ধরেছে। রাশেদ নিজের গাল ডলা থামায়। তারপর উড়ে গিয়ে শেখর ভাইয়ের দুই বাহু চেপে ধরে।

"শুয়োরের বাচ্চা, তোরে আমার আব্বা পেলেপুষে বড় করেছে আমাকে মারার জন্য? আব্বা টাকা না দিলে কোথায় থাকতি তুই? আর তোর মা কোন বস্তিতে? বেঁচে থাকার জন্য তোর মাকে কী করতে হত ভেবে দেখেছিস, শুয়োরের বাচ্চা?"

শেখর ভাই আবার হাত তোলে। "শেখর!" মায়া খালা তীরের বেগে চিৎকার করে ওঠে। শেখর ভাই হাত নামিয়ে নে।

আমার কোনওটাই ভাল লাগে না। না শেখর ভাইয়ের মার। শত খারাপ হলেও রাশেদতো আমার ভাই। না রাশেদের গালিগালাজ।

রাশেদ কেন এত নীচ, এত হীন? কিন্তু এ সব কথা নিজেকে আর কত জিজ্ঞেস করব?

মায়া খালা আমার মায়ের খালাত বোন। খালু পুলিশে চাকরি করতেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম রাতে রাজারাবাগে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে নিহত হন। রনি তখন মায়া খালার পেটে। যুদ্ধের মধ্যে রনির জন্ম হয়। আমাদের রংপুরের বাড়িতে। আমার মা-ই সব ব্যবস্থা করে। আব্বা তখন যুদ্ধে। রনির জন্মের পর আমাদের পুরো পরিবার তেতুলিয়া হয়ে জলপাইগুড়ি চলে যায়, আমার নানার এক চাচাত ভাইয়ের বাড়িতে। এ সব আমি শুনেছি, দেখিনি।

রাশেদের আক্রমণে মায়া খালা বিচলিত হননি। যে মহিলা তেইশ বছর বয়স থেকে বিধবা, যিনি আর কখনও বিয়ে করেননি, যিনি দুই সন্তানকে একা একা বড় করেছেন, আবার দুই জনের এক জনকে হারিয়েওছেন, সেই সংগ্রামী মহিলাকে নাড়ানো কি এত সোজা? তবে শেখর ভাইয়ের মনটা খারাপ হয়ে গেছে। উনি মাথা নিচু করে আমার সামনের চেয়ারটাতে বসে পড়েছেন।

"আমি কি কখনও আমার জীবনে খালা আর খালুর অবদান অস্বীকার করেছি?" শেখর ভাই বলেন। "তাই বলে তুই তোর আপন বোনকে এভাবে অপমান করবি? ওতো আমারও বোন।"

রাশেদ ভান করে সে শেখর ভাইয়ের কথা শোনেনি। সে আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে:

"খেয়ে ফেললি, মাকে? খেয়ে ফেললি, মাগী? তুই যদি একটা দোকান দিতিস তা হলে আজ আমরা সবাই বেঁচে যেতাম।"

শেখর ভাই আর রাশেদকে মারবে না, রাশেদ তা বুঝে গেছে। এখন সে জোরে জোরে মাগী মাগী করছে আর নিজের থুতু দিয়ে নিজের দাড়ি ভেজাচ্ছে।

রাশেদকে এখন আমার মারতে ইচ্ছে করছে। নিজ হাতে। আমি চাইলেই রান্নাঘর থেকে দা এনে ওর মাথা ফাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাতে কি কিছু হবে? যা সমস্যা তাতো থেকেই যাবে। বরং ওকে আহত করলে আমার সমস্যা বাড়বে। আমি উল্টো কিছু করার কথা ভাবি। দেখি কাজ হয় কি না।

"তুই কী চাস আমি জানি, রাশেদ" আমি বলি। "তোর অস্ত্র ভোতা হয়ে গেছে। সেই অস্ত্র দিয়ে তুই কিছু করতে পারবি না। বরং তুই সরাসরি চা। নাটক বাদ দে।"

"কী নাটক? কীসের নাটক? আমি কি শুধু নাটক করি?" রাশেদ চেঁচায়।

"হ্যাঁ, তুই শুধু নাটকই করিস। তোর জীবনটাই নাটক," আমি গলা উঁচু করে বলি।

রাশেদ গালির ফোয়ারা ছোটায়। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করার জন্য আমাকে সে দোষী সাব্যস্ত করে।

"মনে আছে তোর? বলব সবাইকে তোর শেষ নাটকের কথা?" আমি ধমক দিয়ে বলি।

"যা বলার বল্। আমার কিছু যায় আসে না," রাশেদ উত্তর করে। "বেশ্যারা মিথ্যা ছাড়া আর কী বলতে পারে?"

রাশেদ তার সর্বশেষ নাটক মঞ্চস্থ করে ছয় মাস আগে। রাশেদ আর ওয়াজিফা এসেছিল এখানে। ওদের ছেলে জামির আর মেয়ে আমিরাও ছিল সাথে। ওরা মার জন্য গুলশান থেকে আম কিনে আনে। তখনও দিনাজপুরের আম বাজারে আসেনি। মায়ের প্রেমে পাগল রাশেদ মায়ের জন্য গুলশানের অথেন্টিক মার্কেট থেকে পাকিস্তান থেকে আমদানি করা ছয়টা লম্বা হলুদ আম নিয়ে আসে। বসুন্ধরায় একটি ভাল দুধের ফার্ম আছে। জাফরের খাঁটি দুধ। মালিক জাফর খামারের নামটা এ রকম না রাখলেও পারতেন। তবে এই খামারের দুধ খাঁটি। ওরা দুধে কোনও ভেজাল দেয় না। তাদের দুধে জ্বাল দিলে সর পড়ে। দুই থেকে তিন মগ খেলেও পেটের ভেতর মেঘে মেঘে ঘষা লাগে না। মা সেই দুধ খায়। ওটা আমারও পছন্দের দুধ। আম আর দুধ মার পছন্দ। রাশেদ মাকে ভালোবেসে আম নিয়ে এসেছে। উপস্থিত আমরা সবাই মাহরাম ছিলাম। তাই ওয়াজিফা তার বোরকার জালিটা মাথার উপর রেখেছিল। আমি দেখেছিলাম ওয়াজিফার হুরের মতো চেহারা। গোলগাল। মিষ্টি। ভাই আমার ছয় ফুট লম্বা। তার বউ পাঁচ ফুট। রাশেদ বউকে খুব ভালবাসে। ছোটখাট ওয়াজিফাকে পুতুলের মতো বুকে তুলে নেয়। আমি এক বার দেখে ফেলেছিলাম। দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। ভাই তখন ঘরের বার হয়ে আমাকে মাগী বলে গালি দিয়েছিল। আর দুই মাস পরে আমের আসরে ভাই আমাকে গালি না দিয়ে আপা বলে ডাকল। "কেমন আছিস, আপামণি? তোর জন্য ওয়াজিফা আর আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। তোর দুঃখের কথা ভেবে বারবার কান্না আসে, আপামণি। ছোট ভাইয়ের উপর রাগ করিস না। আমাদের সবারইতো একই সমস্যা, সেই কথা কি জানিস না? তাই মাঝে মাঝে আমিও দু'একটা খারাপ কথা বলে ফেলি।"

সে দিন ভেবেছিলাম, ভাইটাকে আলিঙ্গন করি। ছোটবেলায় ওকে আব্বার মারের হাত থেকে বাঁচানো আমার কাজ ছিল। ও টাকা চুরি করত মায়ের ব্যাগ থেকে। মার ব্যাগে টাকা কখনও গোনা থাকত না। তাই সব সময় ধরা পড়ত না। কখনও ধরা পড়লে মার খেতে হত। আমি মিথ্যা কথা বলতাম। বলতাম আমি নিয়েছি। ভাই পালিয়ে যেত। ওকে অনেক ভালোবাসতাম। মনে নাই কখন সর্বশেষ আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছি। ওই দিন মন খুব চাইছিল রাশেদকে একটু জড়িয়ে ধরি। তা করা হয়নি। যদিও ওর জন্য আমি রান্না করেছি। ও বিরানি খেতে পছন্দ করে। বাচ্চা দুটি বিরানি খেতে পছন্দ করে। রাশেদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আমি জলপাই তেলে স্বাস্থ্যকর বিরানি রান্না করেছি। রান্না শেষ হতে তিনটা বেজে যায়। খাশির বিরানি আর

মুরগির রেজালা খেয়ে আমরা সবাই ভাইয়ের আনা আম দুধ মেখেছি। প্লেটে প্লেটে হলুদ আমদুধ। রাশেদ তখন কেঁদে ফেলে।

"আমার জামির আর আমিরার কী হবে, আম্মা?"

মাও ভালো করে আম দুধ মেখেছে। ভাই যত্ন করে মার প্লেটে দুধের সর তুলে দিয়েছে। মা প্রস্তুত আমদুধভাতের প্রথম লোকমা মুখে নেয়ার জন্য। ভাই কেঁদে চলেছে।

"আমার জামির আর আমিরার কী হবে, আম্মা? আমিতো বেশি দিন বাঁচব না। বাইপাসের গড় আয়ু আট বছর।" রাশেদ হুহু করে কাঁদে। ওয়াজিফা হুহু করে কাঁদে। জামির আর আমিরা আমার দুই পাশে বসা। ওদের একজন আমার শাড়ির আঁচল আর এক জন আমার পেট খামচে ধরেছে। রাশেদ আর ওয়াজিফার কান্না বাড়তে থাকে। "ওয়াজিফার বিষয়টা দেখো একবার, আম্মা। ওর জরায়ুটা কেটে ফেলে দিতে হবে। তুমিতো ডাক্তার, আম্মা। তুমি দেখো তোমার ছেলে আর ছেলের বউ পথে বসতে চলেছে।"

"আচ্ছা দেখা যাবে," আমি বলি। "মাকে আগে তোর আম দিয়ে দুধভাত খেতে দেয়।"

"দেখো, আম্মা, দেখো। আপা কত ভাল। হবে না কেন? সে তো বিজ্ঞানী। জীবনে কখনও কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়নি। তাও যদি গ্রামের স্কুল হত। সবইতো শহরের স্কুল। জেলা স্কুল। সব ভাল ভাল স্কুলে আমার আপামণি প্রথম হয়েছে। সব সময় এক নম্বর। এখন কত ভাল চাকরি করে। ওর বাড়ির কী দরকার, আম্মা? ঢাকা ইউনিভার্সিটি এখন টিচারদের জন্য বড় বড় কোয়ার্টার করেছে। এক একটা ফ্ল্যাট মন্ত্রীদের ফ্ল্যাটের চেয়ে বড়। আপামণি ওই কোয়ার্টারগুলির একটা নিয়ে নিবে। আপামণি তো শিক্ষিত। আর আমি? আমি অশিক্ষিত, মুর্খ, বর্বর। আপামণির কোনও সন্তান নাই। ওতো চায়ও না, আম্মা। আর কখনও বিয়েও করবে না। তাই না, আপামণি? যে দুঃখ পেয়েছিস, তারপর তুই কি আর বিয়ে করবি? করবি না। আর কোন বেটা তোর যোগ্য? এ দুনিয়ায় কে আছে যে তোকে দাঁত মেজে সন্তুষ্ট করতে পারবে? না, নাই। এক জনও নাই। আর ওরা সিগারেট কিছুতেই ছাড়বে না। মদও না। লুকিয়ে লুকিয়ে খাবে। আচ্ছা না হয় ধরেই নিলাম, আপামণি, তুই বিয়ে করবি। করলেওতো তুই কখনও বাচ্চা নিবি না। নিবি? আর কয়েক দিন পরেতো এমনিও তোর সন্তান হবে না। বয়স দেখতে হবে না? তাই না আপামণি, তাই না? দেখো, আম্মা, দেখো, আপামণি আর বিয়ে করবে না। ওর কোনও সন্তানও নাই। আর কখনও হবেও না। আর আমার দিকে দেখো, আম্মা। আমার দুইটা ছেলেমেয়ে। আমরা আল্লারাসুল মেনে চলি। আমরা কোনও প্রোটেকশন করি না। তাই বলা যায় না আরও কয়টা হবে। আমি আজ মরে গেলে কাল ওদের রাস্তায় বসে ভিক্ষা করতে হবে, আম্মা। চিন্তা করে দেখো আম্মা, তোমার ছেলের বউ এক গণ্ডা বাচ্চা নিয়ে ফার্মগেটের ফুটপাতে ভিক্ষা করছে। চিন্তা করো, আম্মা। তুমি কি এটা মেনে নিতে পারবে?"

"সবতো বুঝলাম," আমি বলি। "তুই চাসটা কী?"

"আমার আপামণি সব বুঝে, আম্মা," রাশেদ বলে। "তুমি আমাকে বাড়িটা দিয়ে দাও, আম্মাা।"

মা দাঁড়িয়ে যায়। আর আমারও শিরদাঁড়া সোজা হয়ে যায়। আমি মার তেজের কথা জানি। রাশেদও জানে। রাশেদের মুখে তখন রক্ত নাই। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে রাশেদের মুখ। ওয়াজিফাকে দেখে মনে হচ্ছিল ও তখনই উঠে দৌড় দিবে। আর পেছনে ফিরেও দেখবে না, ওর স্বামী সন্তানদের কী হল। মা তার প্লেটের দুধভাত রাশেদের মুখে ছুঁড়ে মারে। তারপর মা প্লেটটা টেবিলে আছাড় মারে এবং এরপর সে বাথরুমে ঢুকে যায়। মাকে রাশেদের আম খাওয়ানোর নাটক ওখানেই শেষ। পরে আমাকে খোরাশানি চক্ষু হাসপাতাল থেকে নার্স এনে রাশেদের চোখ পরিষ্কার করাতে হয়।

বাথরুম থেকে মা তার কক্ষে চলে যায়। চোখের ব্যান্ডেজ করা শেষ হলে রাশেদ জামিরের হাত ধরে টান দেয়। জামির আর আমিরা একযোগে বলে ওঠে, আমরা ফুপ্পির সাথে থাকব। রাশেদ জামিরকে পিঠের উপর মারে। ওয়াজিফা আমিরার হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমার আচঁল থেকে আমিরার হাত সরিয়ে নেয়।

ওদের চেঁচামেচি শুনে মা দা নিয়ে আসে। এক চোখে ব্যান্ডেজ এবং আর এক চোখে আতঙ্ক নিয়ে রাশেদ দৌড় দেয়। ওয়াজিফা রাশেদের পিছু নেয়। ওয়াজিফার এক হাতে জামির, আর এক হাতে আমিরা। সে যে ওরা গেল, তারপর গত ছয় মাস ওদের সাথে আমাদের আর দেখা হয় নাই। এর মধ্যে বাচ্চা দুটিকেও ওরা আর এখানে পাঠায়নি।

ছাব্বিশ

“নাআআআ!”

রাশেদের চিৎকারে আমার কথা মুখের মধ্যে আটকে যায়। মায়া খালার মুখ অন্ধকার হয়।

“কবর দিয়ে দিলে আমি কীভাবে জানব আমার আম্মা কীভাবে মরেছে?” রাশেদ গলা ফাটায়। “কে আমার আম্মাকে মেরেছে? কীভাবে মেরেছে? গলা টিপে মেরেছে? না বিষ খাইয়ে? আম্মা, আম্মাগো।” রাশেদ কেঁদে ওঠে। কান্নায় ওর হেঁচকি ওঠে। ও হেঁচকির দমক সামলায় গলায় হাত চেপে ধরে। “গতকাল দুপুরে আমি আম্মাকে দেখে গেছি। আম্মার হাতের রান্না করা ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছি। রাতে আম্মা মরে গেল। এ ভাবে মানুষ মরে যায়? এ কথা কে বিশ্বাস করবে? কোন পাগল বিশ্বাস করবে? ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বাস করবে? প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস করবে? জাতিসংঘ বিশ্বাস করবে? কেউ বিশ্বাস করবে না। আমাকে জানতে হবে কীভাবে আমার আম্মা মারা গেল। তাড়াতাড়ি তাকে কবর দিয়ে সব কিছু গায়েব করে দিতে আমি কাউকে দেব না। দরকার হলে আমি শত্রুর সাথে লড়ব। যুদ্ধ করব। মামলা করব। অপরাধী ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে, তা কিছুতেই হবে না।”

রাশেদের বউ উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে ওঠে। তার গলা থেকে তীক্ষ্ণ খেঁক খেঁক আর নাক থেকে ভেজা প্যাঁচপ্যাঁচ আওয়াজ আসে।

রাশেদের বউ অভিনয় করেছে এমনটা শুনিনি। তবে রাশেদের অভিনয়ের ইতিহাস দীর্ঘ। কিন্তু ও এমনভাবে কাঁদছে, ওর চোখ থেকে এত জল ঝরছে, আমি ভাবতে পারছি না, ওর এই কান্না অভিনয়। রাশেদতো ওই মহিলারই সন্তান। যত স্বার্থপরই হোক না কেন। হয়তো ওর বুকেও ব্যথা বাজছে। কিন্তু মাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কাটাছেঁড়া করবে, এটা আমি মানতে পারছি না। আবার রাশেদের সন্দেহের বাণ আমার দিকে, সে কথাও আমি জানি। তাই আমি গলায় জোরও পাচ্ছি না, রাশেদকে বাধা দিয়ে কিছু বলতে। আমি নিজেও জানি না, মা কীভাবে মারা গেল। এমনকি এ নিয়ে আমি এখনও ভাববারও সময় পাইনি। পুলিশ অফিসারটা ভাল মানুষ। যাওয়ার সময় অবশ্য বলে গেছে, “ম্যাডাম, সাবধানে থাকবেন। আমি পজিটিভ রিপোর্ট দেব। কিন্তু আপনার আম্মা যদি সম্পত্তি রেখে যায়, তবে আপনার ভাই ঝামেলা করতে পারে।”

আমি অফিসারটাকে স্মরণ করি। আর ভাবি। ওকে আমি বিয়ে করব। আমি জানি আমার মতো নির্ঝঞ্ঝাট পাত্রী পেলে ও এখন বিয়ে করবে। নইলে ওকে ওর বোনগুলির বিয়ে হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ওর টাকাকড়ি নাই। বেতনভাতার উপর ওর জীবন চলে। একটা সৎ ছেলেকে বিয়ে করা আনন্দের ব্যাপার হবে। ও এসে আমার এ-সব ঝামেলা সামলাক। রাশেদকে আমি কিছুতেই দেব না, মায়ের শরীরে ছুরির দাগ বসাতে। কিন্তু রাশেদ যা করছে, তাতে কি আর ওই ছেলেরই এখন সেই সুযোগ রয়েছে, আমাকে

এই ঝামেলার হাত থেকে বাঁচানোর? কিন্তু কত আর ঝামেলা হবে? আমিতো মাখে খুন করিনি। এসব প্রমাণ হয়ে যাবে। আসল ঝামেলা একটাই। মায়ের বুকে ডাক্তারের ছুরি। এ ছাড়া আর কোনও কিছুকে ভয়ও পাচ্ছি না, পরোয়াও করছি না।

পুলিশ অফিসারটা সত্য কথা বলে গেছে। আমি রাশেদকে চিনি। রাশেদকে মায়া খালা আর শেখর ভাইও বোঝে। তারা সব জানে।

আমি মায়া খালার হাত ধরে ওনাকে বারান্দায় নিয়ে যাই। রাশেদের লাফালাফি আমার বুকের ভেতরে গিয়ে লাগে। তবু আমি ওকে পাশ কাটিয়ে যাই। বারান্দায় গিয়ে আমি মায়া খালাকে কিছু কথা বলি। আমরা যখন ঘরে ফিরে আসি, তখন রাশেদ শান্ত। ও নিশ্চয়ই একা একা শেখর ভাইয়ের সামনে লাফালাফি করতে বিব্রত বোধ করছিল। আমাকে ফিরে আসতে দেখে ও আবার লাফালাফি শুরু করে।

"রাশেদ, শোন্," মায়া খালা বলেন।

"আমি তো আপনার কথা শুনব না," রাশেদ বলে। "আপনি আর আপনার ছেলে এ বাড়ির পোষ্য। যাঁরা আপনাদের পেলেছেন তাঁদের এক জনকে খুন করা হয়েছে, অথচ আপনাদের তাতে কোনও বিকার নাই। আপনি আর আপনার ছেলে খুনির পক্ষ নিয়ে বসে আছেন। আপনার ছেলে আমাকে মেরেছে। আপনি জানেন আপনার ছেলের হাতের আঙ্গুল কত শক্ত? বঙ্গপোসাগরের রোদে পোড়া আঙ্গুল। পুড়ে পুড়ে লোহার ডান্ডার মতো শক্ত হয়ে গেছে। সেই আঙ্গুল দিয়ে সে আমাকে চড় দিয়েছে। আমি আপনাদের সবার বিরুদ্ধে লড়ব।"

শেখর ভাই কৌতূহলী চোখে রাশেদের দিকে চায়। "রাশেদ, শান্ত হ। আমি দুঃখিত, তোকে মারার জন্য," শেখর ভাই বলে।

রাশেদ শেখর ভাইয়ের দিকে তাকায় না। মায়া খালা রাশেদকে হাত ধরে টানেন।

"আপনি বেগানা মহিলা।" রাশেদ লাফ দিয়ে ওঠে। "আর আপনার ইতিহাসও ভাল না। সতেরো বছর বয়স থেকে বিধবা। কী করেছেন না করেছেন আমি সব জানি। আমাকে ধরবেন না। কোথায় বসতে হবে, বলেন।"

"এখানে বোস্, বাবা।" মায়া খালা একটা চেয়ার টেনে দেন। "তোকেতো শেখরের চেয়ে কখনও কম আদর করিনি। ছোটবেলায় তোকে আমি খাইয়েছি, গোসল করিয়েছি, কাপড় বদলে দিয়েছি। এখন আমি বেগানা নারী হয়ে গেলাম? আর আমাকে নিয়ে কথা বলছিস? আমি কিছু মনে করছি না। আমি তোর মা না হলেও তোকে শেখরের চেয়ে একটুও কম ভালবাসি না। শিশিরকে নিয়ে কোনও খারাপ কথা বলিস না, বাবা। ওর মনে এখন অনেক কষ্ট।"

"ও আপামণি এখন আমার চেয়ে আপনার কাছে বেশি আপন। আমাদেরতো সরাসরি রক্তের সম্পর্ক। আর আপনার সাথে আপামণির কী সম্পর্ক? অনেক দূরের সম্পর্ক। আর আপনি এখন আপামণির কাছে আমার চেয়ে বেশি আপন হয়ে গেলেন। আপনি বেগানা নারী এটাই সত্য। নাকি আপনি কোরান-হাদিস বদলে দিতে চান?"

"না, না, তা চাই না। বাবা, তুই বোস্।"

রাশেদ বসে। আর হাত দুটিকে দুই দিকে ঝুলিয়ে রাখে।

"তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন। আমার অনেক কাজ আছে। সব কিছু উদঘাটন করতে হবে। কোথায় কোথায় যেতে হবে, কে জানে? কে আছে আমাকে সাহায্য করবে? আপনারা মা বেটা খুনির পক্ষ নিয়ে বসে আছেন।"

আমি রাশেদের উল্টা দিকে আর মায়া খালার পাশে বসি। "ভাইয়া, শোন্। মা কীভাবে মারা গেছে আমি জানি না। মায়ের হার্ট অ্যাটাক করেছে এটাও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"হার্ট অ্যাটাকের প্রশ্নই আসে না। আমি হার্টের রোগী। আমি জানি হার্ট অ্যাটাক কী।"

"আমিও তা-ই ভাবছি, ভাইয়া," আমি বলি। "মা'র হার্ট অ্যাটাকের কোনও কারণ আমি দেখি না। আত্মহত্যা করারও কোনও চিহ্ন নাই।"

"থাকবে কী করে। তাকে গলা চেপে ধরে খুন করা হয়েছে। ওড়না পেঁচিয়ে খুন করলে গলায় দাগ বসে না।" রাশেদ আড়চোখে আমার দিকে চায়। "আর আমরা সবাই জানি আমাদের এখানেই নাকে আঙ্গুল দিয়ে খুন করার এক জন আছে। যে কৌশলে খুন করলে আমেরিকায় নিয়ে সুরতহাল করালেও খুনের কারণ জানা যাবে না। যারা খুনির পক্ষ নেবে, তাদের উপর আল্লাহর গজব পড়বে। তাদের কৃতজ্ঞতা কই?" রাশেদ চেঁচিয়ে ওঠে। "কই আজ তাদের কৃতজ্ঞতা? আল্লাহ, আল্লাহগো। তুমি শুধু আমাকে জানতে দাও, আমার আম্মা কীভাবে মরেছে। আমার আর কিছু চাওয়ার নাই তোমার কাছে। আল্লাহ, ও আল্লাহগো। কী নেমকহারাম তোমার দুনিয়ার এই মানুষগুলো। আল্লাহ মেহেরবান। তুমিতো এদের জন্যই আগুনের শাস্তি রেখেছো। কিন্তু আমার আম্মাকে যে ওরা মেরে ফেলল। আম্মা, ও আম্মা, আম্মাগো। ওওও।"

আমার কান গরম হয়ে যায়। মায়া খালাও আমার দিকে আড়চোখে চান। শেখর ভাই যদিও টেবিলের দিকে চেয়ে আছেন। আমার বুকে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। রাশেদের চোখ থেকে গলগল করে পানি বের হচ্ছে। মনে হচ্ছে মায়া খালা আর শেখর ভাই রাশেদকে বিশ্বাস করা শুরু করেছে।

"শিশির, সব কিছু খুলে বল্," শেখর ভাই বলে।

"হ্যাঁ, মা, সব কিছু খুলে বল্। এটাই ভাল," মায়া খালা বলেন।

"আমি সব শুনতে চাই," রাশেদ বলে। "কখন মায়ের গলা চেপে ধরা হয়েছে? নাকি আগের পদ্ধতিতে খুন করা হয়েছে। কখন ঘরের একটুখানি পানিকে বন্যা নামে অভিহিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে? কখন কে সে পানি ছেড়েছে? কতটা কত মিনিটে মৃত্যু নিশ্চিত করে মায়ের নাক আর গলা থেকে হাত তুলে নেয়া হয়েছে?"

আমার কাছে পৃথিবীটাকে বিষাক্ত মনে হয়। রাশেদ আবার নাটক শুরু করেছে। অভিনয়ে রাশেদ পাকা হাড্ডি।

সাতাশ

রাশেদ সবচেয়ে বড় অভিনয় করে ছয় বছর আগে। আব্বা তখন শুকিয়ে আমাদের বাসার সামনের ল্যাম্পপোস্টটার মতো চিকন হয়ে গেছে। এর মধ্যে দুই বার হার্ট অ্যাটাকের ধকল সামলেছে। সে দিন বিকাল পৌনে তিনটায় ফোন আসে আব্বার কাছে। ফোনটা আমার বা মা'র কাছে আসতে পারত। কিন্তু রাশেদ সব সময় দুর্বলকে আঘাত করতে পছন্দ করে। রাশেদ সে দিন ভর করে আব্বার নিভুপ্রায় প্রাণের উপর।

মা আর আমি আব্বাকে টেনে টেনে বাসা থেকে নামাই আর ঠেলে ঠেলে গাড়িতে উঠাই। আমি ভয়ে কাঁপছিলাম আর আমার মেরুদণ্ডটা যেন একটা বরফের চোঙার মধ্যে ঢোকানো হয়েছে এমন বোধ করছিলাম। আমাদের ভাগ্য ভাল ড্রাইভার সুরুজ আকবর পার্কিঙেই ছিল। জানুয়ারি মাস। তবু গাড়িতে ওঠার আগেই আমি ঘেমে যাই। গাড়ি চলে। আমি ভাবি ওটা আরও জোরে চলে না কেন। আব্বা কখনও ড্রাইভারকে গাড়ি জোরে চালাতে বলে না। সে দিন বলেছিল। গাড়িতো আর ঠেলে ট্রাফিকের মাথার উপর দিয়ে নেয়া যায় না। ট্রাফিক যত ঘন হয়, ড্রাইভার সুরুজ আকবর গাড়ির এক্সিলারেটরে তত হ্যাঁচকা চাপ মারে আবার বার বার ব্রেকে লাথি মারে আর ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উল্টে ফেলার উপক্রম করে। এক সময় দেখি আমি ড্রাইভারের সিটের মাথা ধরে লটকে আছি। তারপর মাকেও দেখি একই অবস্থা। সেও তার সামনের সিটের মাথা ধরে ঝুলে আছে। এ ভাবে ঝুলতে থাকলে বুঝি আমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছব। আব্বা ড্রাইভারের পাশে বসা। সে-ও দুই হাত দিয়ে সিটের দুই পাশ খামচে ধরে আছে। আমাদের শরীরগুলিই শুধু শক্ত হয়। ট্রাফিকের মুভমেন্ট তার নিয়মেই চলে। বাড্ডা-রামপুরা রোডের কুরিল ক্রসিং পার হতে আমাদের চল্লিশ মিনিট সময় লাগে। চল্লিশ মিনিটে আমাদের ষাট ফুট দূরত্বের অগ্রগতি ঘটে। দুই ঘন্টা পর আমরা বশিরউদ্দিন স্পেশিয়ালাইজড করোনারি হাসপাতালে পৌঁছি।

গাড়ি থেকে নেমে আমি আব্বার হাত ধরি। বলি, আব্বা আপনি চিন্তা করবেন না। বোধ হয় ব্যাপারটা তত মারাত্মক নয়, যতটা তারা বলেছে। রাশেদের এমন হওয়ার কোনও কারণ নাই। আমার কথা শুনে আমার মুঠির মধ্যে থাকা আব্বার বাম হাতের শীতল কব্জিটা বুঝি একটু নরম হয়।

হাসপাতালটা ওয়াজিফার মামার। আমাদের গ্রহণ করার জন্য নীল ইউনিফর্ম পরা দুই জন দারোয়ান মূল ফটকের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের তিন জনের কেউ কখনও আগে ওই হাসপাতালে যাইনি। দুই দারোয়ানেরই মুখে চাপ দাড়ি। একজন ছয় ফুট লম্বা। এক জন সাড়ে চার ফুট। যেন জর্জ মিল্টন আর লেনি স্মল। তাঁরা আমাদের যত্ন করে সুপরিসর করিডোর বরাবর পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। খাটো দারোয়ানটা লিফটম্যানকে ধমক দেন। জানিয়ে দেন কোন জমিদার তার সামনে উপস্থিত হয়েছে তা জানলে তিনি হুঁশ হারাবেন। লিফটম্যান আব্বার লিকলিকে শরীরটার দিকে তাকান। যেন তিনি কথিত জমিদারের সন্ধানে আছেন। আমি কষ্ট পাই। এক সময় আমার আব্বার গঠন আর চেহারা জমিদারের মতোই ছিল। খাটো দারোয়ানটা আবার খেঁকিয়ে ওঠেন। লিফটম্যান উঠে দাঁড়ান। লিফটে বারো থেকে পনেরো জন যেতে পারে, এমন বড় লিফট। দারোয়ান ওই লিফটে শুধু আমাদের তোলেন। আমার অস্বস্তি হয়। দুই পাশে লাইন ধরে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। দারোয়ান দুই জন আমাদের লিফট থেকে দোতলায় নামান।

বারান্দার মার্বেল অনেক পরিষ্কার। মনে হচ্ছিল একটু ঝুঁকলেই আমি আমার চেহারা দেখতে পাব। কিন্তু ভয়ে তাকাই না, কী দেখব এই ভেবে। সব কিছু ঝকঝকে তকতকে। দুধের হলুদ সরের রঙের দেয়াল আমাদের দুই পাশে। এমন কি যে দু'জন আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের পায়ের কালো জুতাগুলিও চকচকে। দোতলার বারান্দায় দুই কদম হাঁটার পর আমি আমার এক ছাত্রের মাকে দেখি। এক জনসম্পদ রপ্তানিকারকের স্ত্রী তিনি। আমার মরহুম ব্যবসায়ী স্বামী আর মরহুম শ্বশুরের সুবাদে আগেও বোধ হয় তাঁকে দেখেছি। মনে হচ্ছে তাঁর স্বামীরও হার্ট অ্যাটাক করেছে বা স্ট্রোক করেছে।

মহিলার মুখ দেখে আমার বোধোদয় হয়েছিল। আর আমার শাশুড়ি তরী চৌধুরীর কথা স্মরণে এসেছিল। ওই হাসপাতালের বারান্দায় আমার ছাত্রের মা যেন আমার সামনে সব মেলে ধরে। শুধু তার মুখই নয়, সারা দেহ জানান দিচ্ছিল, ধনী মানুষের স্ত্রী হয়ে থাকা কত সাধনার বিষয়। নিজের দেহকে স্বর্গীয় রাজকুমারী ডায়ানার মতো লিকলিকে রাখা। সিলিকন আর লবনের জল মিশিয়ে বুকে দুটি হানিডিউ বা পেপে বা আপেল বা জাম্বুরা, যার যেমন পছন্দ, তেমন বপন করা, যা এমন টেকসই ফল, যা অথচ এত রসহীন, যা

এমনকি কবর দেয়ার পরে যখন দেহের সব পেশি ঝরে যায়, তখনও টিকে থাকে। তারপরও স্বামী সাহেব কখনও স্ত্রীর এমন মজবুত ফল ধরে দেখেন না, ধরেন যদি তা বেগানা নারীর বুকে বসানো হয়। এঁদের কোমর পাতলা করতে হয়। আবার কোমরের নীচের অংশ যাতে কলসির মতো চওড়া হয়ে নামে, সেই ব্যবস্থাও করতে হয়। এটা অবশ্য কাটাছেঁড়া না করে ব্যায়ামাগারে করা সম্ভব। মুখমণ্ডলকে জওয়ানি ক্রিম দিয়ে ঘসে ঘসে ফর্সা বানাতে হয়। এঁদের জীবনের সংগ্রাম কেউ বুঝবে না, যদি সে এমন কোনও মহিলাকে দশ বা পনেরো বছর আগে না দেখে থাকে, যখন তাঁর স্বামী দরিদ্র ছিল বা সবে ব্যবসা শুরু করেছে, আর মহিলাটা ঘরের মধ্যে তরকারি কুটতে কুটতে, থালাবাসন ধূতে ধূতে, আঙ্গুলের মাথাগুলো ঘা করে ফেলেছে। আমার শাশুড়ি, সাবেক কইতরি খাতুন কি কইতরি বেগম, আমার শ্বশুর আমিন চৌধুরীর তরক্কি হাসিলের পর তাঁর হাতের আঙ্গুলের ঘা মলম লাগিয়ে ঠিক করে নিয়েছিলেন। তাতেও কাজ হয়নি। আমার শ্বশুর যখন রঙিন রঙিন শহরে কচি মুরগি জবাই করছেন আর কচি ডাব ফাটাচ্ছেন, আমার শাশুড়ি তরী চৌধুরী তখন শুধু ধনী স্বামীর স্ত্রী হিসাবে টিকে থাকার জন্য, স্বামীর ঘরের তিন ঘর পরের একটা ঘরে শোবার জায়গা পাওয়ার জন্য, অবিরাম গালের উপর জওয়ানি ক্রিম ঘসে চলেছেন। সকাল বিকাল পেটের মাপ আর বুকের মাপ নেয়া আর ট্রেডমিলের উপর তাঁর পা চালানো আমি নিজে দেখেছি। যখন স্বামী আমিন চৌধুরীর ওপেন হার্ট সার্জারি হয়, যখন জরা আর ব্যাধির কারণে চৌধুরী সাহেবের মুষ্ক আনন্দরস উৎপাদনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, যখন ডায়াবেটিসের কারণে তাঁর হৃৎযন্ত্রের দেয়ালে ক্ষয় শুরু হয়, পচন্ত কলিজা থেকে নিঃশ্বাসের সাথে পচা মদের সুবাস আসে, যদিও চৌধুরী সাহেব তত দিনে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, তখন তরী চৌধুরী আবার তাঁর স্বামীকে নিজের করে পান। তিনি এত সুখী হন যে ছয় মাসে তাঁর ওজন বাড়ে পঞ্চাশ কেজি আর চৌধুরী সাহেবের ওজন কমে পঞ্চাশ কেজি। চার বছর আগে অবশ্য আমার সেই শ্বশুর মুরগি ছানা আমিন চৌধুরী রুগ্ন যকৃতের হাতে পরাস্ত হয়ে ইহকাল ছেড়ে চলে যান। তত দিনে তিনি হাজার দশেক মুরগি ছেনেছেন আর হাজার চারেক ডাব ফাটিয়েছেন, তবে ওগুলি আসল না নকল ডাব বলা মুশকিল, ডাব চাইলে দালাল ডাব দেয়, যেমন ইউরোপে কতক সিরিয়ান আর লেবানিজ আর আফগান দালাল সুপার মার্কেট থেকে মাথায় গুলি করে মারা গরুর গোস্ত কিনে এনে তা হালাল গোস্ত বলে মুসল্লিদের বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসে, আর মুসল্লিরা বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করে কারণ তারা বিশ্বাস করে গুনা হলে দালালের হবে, তাদের হবে না, তেমনি আমিন চৌধুরীর বেশির ভাগ ডাবও যে নকল ছিল তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আমিন চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী তরী চৌধুরীর জীবনে স্থায়ী শান্তি নেমে আসে আর তিনি দিন দিন তরুণী হতে থাকেন, দিনে ছয় ঘন্টা গুলশান ক্লাবের ব্যায়ামাগারে আর ছয় ঘন্টা হিন্দি সিনেমা দেখে তিনি ভাল জীবন কাটাতে থাকেন। আমার ছাত্রের মারও যে একই অবস্থা তাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ হাসপাতালের বারান্দায় আমি আমার ছাত্রের মায়ের মুখে কোনও উদ্বেগের চিহ্ন দেখি না। আর আমি অবাকও হই না। আমি জানি স্বামীর একটা বড় হার্ট অ্যাটাক একটা নারীর মন কতটা হালকা করতে পারে। কিন্তু রোগিটি যদি ভাই হয়, তবে আলাদা কথা। আমার ভাই রাশেদের জন্য তখন আমি, আমার মা, আমার আব্বা, যার এর মধ্যে দুই বার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে, আমাদের এই তিন জনের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার অবস্থা।

দারোয়ান দুই জন আমাদের একটা কক্ষের বাইরে আনেন। দরজার সামনে একটা প্লাটিনাম রঙের প্লেটে অভিজাত কালো রঙের খোদাই করা অক্ষরে লেখা, 'প্রেসিডেন্সিয়াল সুইট।' লম্বা দারোয়ানটা শরীর টানটান করে দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢোকেন আর আদবের সাথে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে ইশারায় আমাদের ভেতরে যেতে বলেন।

আমার ভাই রাশেদ সিসিইউর প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটের মাঝখানে শুয়ে আছে। আমার মা, আমার আব্বা, আমি, আমরা তিন জন থমকে আছি। রাশেদ আমাদের দিকে চায়। ওর চোখ দুটি গোল আর হলুদ। দেখে আমার বুকে কষ্ট মোচড় দেয়। আমার আর সন্দেহ থাকে না যে রাশেদের স্বাস্থ্যের একটা বড় বিপর্যয়

ঘটে গেছে। হাসপাতালের একটা বেড এত বড় হয় আমার তা জানা ছিল না। তকতকে পরিষ্কার সাদা বিছানা। আমি ক্লান্ত বোধ করছিলাম। মন চাইছিল গিয়ে বিছানাটার উপর বসি, রাশেদের পাশে। কিন্তু আমাকে আব্বার কথা ভাবতে হয়। আমি একটা চেয়ার টেনে আব্বাকে বসাই। আমি আর মা দুই জন আব্বার চেয়ারের দুই পাশে দাঁড়াই।

আমি আব্বা আর মার দিকে চাই। আমরা সবাই উন্মুখ। জানতে চাই, কী হয়েছে? সবাই আমরা রাশেদের কথা শুনতে চাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে ছন্দপতন হয়ে গেছে। কারও গলা দিয়ে কথা বের হল না। আব্বার মুখে উদ্বেগের ছাপ লেপ্টে আছে। আব্বার এক সময়ের ভরাট মুখের চামড়ার ভেতর থেকে রোগশোকের কারণে বিভিন্ন হাড্ডির মাথা চাড়া দিয়ে আছে, আর সেই মুখে তখন বাড়তি অত্যাচারের আবরণ, যেন একটা আগুনের মুখোশ দিয়ে আব্বার মুখে সে ছাপ মারা হয়েছে। অসুখের পর থেকে আব্বার কপাল আর গালে অজস্র বলিরেখা। আর তখন রাশেদের অবস্থা দেখে আব্বার কপাল আর গলার বলিরেখার সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুণ হয়েছে। মা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মতো এতটা অপ্রতিভ নয়। ওটা অবশ্য ছিল ওসিডির প্রভাব। বিপদ দেখলে মা সতর্ক হয়ে যেত। তবে মায়ের বুকটা বেশ উঠানামা করছিল। মনের চাপ মায়ের নিঃশ্বাস অগভীর করেছে। রাশেদের মাথা কাঁপছিল। ও কি কথা বলতে পারছে না? ওর কি জবান বন্ধ হয়ে গেছে? কিছুক্ষণ আমাদের চোখাচোখি চলে। রাশেদের চোখের পাতা স্থির হয়। রাশেদ ডান হাতের তর্জনিটা তুলে আমাকে ইশারায় ডাকে। আমি ওর পাশে বসতেই ও কেঁদে ফেলে। "আপামণি, আমাকে মাফ করে দে। আব্বা-আম্মাকে বল আমাকে মাফ করে দিতে। কত অপরাধ করলে এমন হয়? আমি মরে যাচ্ছি। অথচ তুই আমাকে একবার ভাইয়া বলে ডাকলি না। বাবা কী হয়েছে, কী হয়েছে তোর, এ কথা বলে আম্মা আমার মাথার কাছে এসে বসল না। আব্বা একটা কথা বলল না। কত বড় অপরাধী আমি, বুঝে দেখ, আপামণি। কিন্তু আমি কী করব? আমিতো শৈশবেই খারাপ হয়ে গেছি। গাঁজা আর ফেনসিডিল আমাকে শেষ করতে পারেনি। ইয়াবা আমাকে শেষ করে দিল। আপামণি, আমাকে মাফ করে দে। তোর এই কুলাঙ্গার ভাই মরে যাচ্ছে। তোর ছোট বেলার আদরের ভাই, যে বড় হয়ে বোনের মর্যাদা রাখতে পারেনি। তুইতো পৃথিবীর সেরা বোন, আপামণি। আর, আমি? পৃথিবীর নিকৃষ্টতম ভাই। কিন্তু এখন আমার সময় শেষ, আপামণি। মাফ করে দে, আপামণি, আমাকে মাফ করে দে। আব্বা-আম্মাকে বল আমাকে মাফ করে দিতে। আমিতো চলেই যাচ্ছি। আজ বা কাল। পরশু, বড়জোর। তোদের মাফ যদি পাই, আজরাইল আমার প্রতি করুণা দেখাবে, জান কবজের সময় আমি একটু কম কষ্ট পাব।"

রাশেদ তাবলিগ থেকে এসে মাকে আম্মা বলে ডাকা শুরু করেছে। এখন আর সে মা বলে না। বলে আম্মা। আমি ছোট বেলা থেকেই আব্বা আর মা এই বলে আমার পিতা আর মাতাকে ডাকি। চুয়াডাঙ্গাতে রাশেদ স্কুলের নাটকে অভিনয় করে পুরস্কার পেয়েছিল। ও যখন কলেজে পড়ে আব্বা তখন যুগ্ম সচিব হয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পোস্টিং পেয়ে ঢাকায় এসেছে। রাশেদ ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়। ক্লাসে না গিয়ে সে এফডিসিতে যেত সিনেমার শুটিং দেখতে। এক শুক্রবারে খাবারের টেবিলে রাশেদ ঘোষণা করে, ও আর পড়বে না, কলেজেও যাবে না, ও একটা ছবিতে নায়ক হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ছবির নাম চুম্বন কসাই। পরিচালক গজলে টেন্ডন। রাশেদ নায়ক। সে চুম্বন কসাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করবে। রাশেদ ছবির গল্প বলে। চুম্বন কসাই জবাই করার আগে পশুকে চুম্বন করে। খাল ছাড়িয়ে সে খালটাকে চুম্বন করে। রান আলগা করার আগে সে পশুর রানকে চুম্বন করে। খদ্দেরের হাতে তুলে দেয়ার আগে প্রতিটা গোস্তের প্যাকেটকে সে চুম্বন করে। এ জন্য তার নাম হয়ে গেছে চুম্বন কসাই। এক দিন গোস্ত বিক্রির সময় শহরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মির্জা মশহুরের সুন্দরী, সতেরো বছরের কন্যা অহনা মির্জা তরুণ কসাইর কাছে আসে তাদের বড়লোকের বেটিদের পিকনিকের জন্য পাঁচটা গরুর অর্ডার দিতে। চুম্বন কসাই বলে সে ভাড়া খাটে না। নিজে গরু পালে। সেই গরু জবাই করে। পালিত গরুর গোস্ত বিক্রি করে। অহনা মির্জা চুম্বন কসাইকে বলে কত টাকা হলে সে

ভাড়া খাটবে। এক লাখ। দুই লাখ। তিন লাখ। ত্রিশ লাখ। পঞ্চাশ লাখ। পাঁচ কোটি। পাঁচশ কোটি। চুম্বন কসাই বলে পৃথিবীর সব টাকা দিয়েও চুম্বন কসাইয়ের চুম্মন কেনা যাবে না। মেম সাহেব যেন চলে যান। মেম সাহেব চলে যান না। তিনি চুম্বন কসাইকে চুম্বন করেন। তারপর তাদের মধ্যে রোমাঞ্চ শুরু হয়। সিনেমা সেখান থেকে টেক অফ করবে। জঙ্গলে শুটিং হবে। প্রেমের দৃশ্য, গানের দৃশ্য, নাচের দৃশ্য। এসো আমি তুমি আজ অজানায় হারিয়ে যাই। ছি ছি অমন করে ডেকো না গো বড় শরম পাই। রাজকুমারী কী হইলো কোথায় গেল তোমার বড়াই? ছি ছি অমন করে বোলো না গো ও আমার চুম্মন কসাই। চুম্মন! চুম্মন! চুম্মন! তারপর অহনা মির্জাকে গোখরা সাপ কামড় দেবে। চুম্মন কসাই চুম্মন দিয়ে অহনা মির্জার শরীর থেকে সাপের বিষ বের করবে। পাহাড়ে শুটিং হবে। চুম্বন কসাই পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়া অহনা মির্জাকে পাহাড়ের মাঝ ঢাল থেকে উদ্ধার করবে। সমুদ্রে শুটিং হবে। সাঁতার না জানা অহনা মির্জাকে চুম্বন কসাই সমুদ্র থেকে তুলে মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনবে। কাজটা করার সময় রাশেদ অভিনয়ে ডুবে যাবে। খেয়াল করবে না নায়িকা দাঁত মেজে এসেছে কি আসেনি। এ দিকে মির্জা মশহুর চুম্বন কসাইকে তাড়া করতে থাকবেন। এক সময় তিনি এক হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে চুম্বন কসাইকে তাঁর মেয়ের জীবন থেকে সরে যেতে বলবেন। চুম্বন কসাই বলবেন মির্জা মশহুর পাঁচ মহাসাগর আর সাত মহাদেশ দিয়ে চুম্বন কসাইয়ের প্রেম কিনতে পারবেন না। মির্জা মশহুর চুম্বন কসাইকে পিস্তল দিয়ে গুলি করবেন। অহনা মির্জা আড়াল থেকে দৌড়ে এসে গুলির আঘাত বুকে নিয়ে নেবে। ট্রাজেডি, রাশেদ ঘোষণা করে। ছবি শেষ হবে গরুর গোস্তের ব্যবসায় ফিরে আসা চুম্বন কসাইয়ে গোস্তের প্যাকেটে চুম্বনের দৃশ্য দেখানোর মধ্য দিয়ে। আমরা রাশেদের কথা শুনছিলাম। গল্পের শুরুতে আমি হাসি চেপে রাখতে বেগ পেয়েছি। সতেরো বছরের অবিকশিত বুক নিয়ে একটা বাচ্চা মেয়েকে হিরোইন বানানো আমার কাছে হাসির ব্যাপার মনে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম সিনেমার ধারণাগুলি এখনও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রয়ে গেছে। কিন্তু গল্প বলতে বলতে রাশেদ আমাকে সম্মোহিত করেছিল। শেষে এসে এমনকি আমার চোখ আর্দ্র হয়ে গিয়েছিল। তাই আব্বা কখন টেবিল থেকে উঠে গেছে খেয়াল করিনি। মাও বেশ কৌতূহল নিয়ে রাশেদের গল্প শুনছিল। আমি দেখি মার কপালে ঘাম। আব্বা আলমারি থেকে পিস্তল নিয়ে এসেছে। আব্বার গাল লাল। দেখে আমার গায়ে জ্বর আসে। রাশেদ কাঁপতে থাকে।

"উঠে আসো," আব্বা বলে।

"কেন, আব্বা, কেন?" রাশেদ বলে। "আপনি কি আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবেন? আমার জীবনের সিনেমা কি এখানেই শেষ?"

"না, তোমাকে মারব না। তুমি উঠে এসো।"

রাশেদ খুব মনোযোগ দিয়ে খেতে থাকে। আসলে ও এক লোকমা ভাত মুখে নিয়ে মুখ নাড়ায়। মনে হল ও ওই এক লোকমা ভাত সারা দিন সারা রাত সারা জীবন মুখের মধ্যে চিবাবে। প্লেটের দিকে তাকিয়ে থেকে। আর এরকম করলে বুঝি তাকে উঠে গিয়ে আব্বার সামনে বুক পেতে ধরতে হবে না পিস্তলের গুলি খাওয়ার জন্য। মা অবশ্য সব কিছুতেই আব্বাকে সাপোর্ট করে। আজ করল না। আমরা বুঝলাম আব্বার মাথা গরম হয়ে গেছে। মা উঠে গিয়ে আব্বার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নেয়।

"ও যদি অভিনয় করতে চায়, করুক," মা বলে।

"পরিবারে অশান্তি করে আমি অভিনয় করব না," রাশেদ বলে। ও যেন খুব আরাম পেল।

আব্বা আর মার কী আদর রাশেদকে। "মরিয়মের ছেলে কখনও আমাদের কথা ফেলতে পারবে না," আব্বা বলে। মরিয়ম: আমার মায়ের নাম।

পরের দিন সকালে রাশেদ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। একটা চিঠি রেখে যায়। ও অভিনয় করতে চলে গেছে। ও আর বাড়ি ফিরবে না। অশিক্ষিত-মূর্খ বাবা মায়ের সন্তান হয়ে সে থাকতে চায় না। তারা তাকে তাদের মেয়ে শিশিরকণাকে যে-ভাবে মাটির পুতুল বানিয়ে রেখেছে, সে-ভাবে তারা তাদের ছেলে রাশেদকে মাটির পুতুল বানিয়ে রাখতে পারবে না।

এক বছর পর রাশেদের প্রথম ছবি মুক্তি পায়। অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা কেউ একশ বার, কেউ দুইশ বার, ওই ছবি দেখে। আমিও চুরি করে পাঁচ বার চুম্মন কসাই দেখেছি। চুম্বন কসাই যখন অহনা মির্জার গালে ফুঁ দিয়ে তার ফুসফুসে অক্সিজেন ঢুকাচ্ছিল, তখন ক্যামেরা তার ফোকাস চাতুর্যের সাথে বানানো অহনা মির্জার পরনের ভেজা পাতলা সাদা হাফ প্যান্টের উপর নিবদ্ধ করে রেখেছিল। আর সে কী রানরে বাবা? আমারই হিংসা হয়েছিল। নায়িকা অহনা মির্জার মধ্যে সতেরো বছরের কিছুই পেলাম না। একেবারে পাকা ফল। সব কিছু ভরাট; ভরাট বাঁক, ভরাট ঢেউ। জাতির আবাল বৃদ্ধ বনিতা চুম্বন কসাই সিনেমা দেখে, কেউ অহনা মির্জার রান দেখার জন্য, কেউ নিজের রানের গঠনে কোনও ত্রুটি আছে কি না, তা মিলিয়ে দেখার জন্য। আবার অনেকেই, আমার মতো, চুম্মন কসাই দেখেছিল রাশেদের অভিনয় দেখার জন্য, এত ভাল অভিনয় করেছিল সে। চুম্বন কসাই জিন্দাবাদ, এই মিছিল আমি নিজ চোখে দেখেছি, বহু বার। দুই বছরের মধ্যে রাশেদের পাঁচটা ছবি মুক্তি পায়। তারপর পাপের ভয়ে রাশেদ সিনেমা ছেড়ে দেয়। সাড়ে তিন বছর পর রাশেদ বাড়ি আসে। তাবলিগ থেকে। শেষের দেড় বছর সে তাবলিগে ছিল। দেশের আনাচে কানাচে বিভিন্ন মসজিদে সে চিল্লা দিয়েছে। আর সিনেমা করার জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছে।

তাবলিগে গিয়ে রাশেদের ওয়াজিফার বাবার সাথে পরিচয় হয়। রাশেদ বিয়ে করে। আব্বা আর মা রাশেদ আর ওয়াজিফাকে ঘরে তুলে নেয়। কিন্তু রাশেদের জীবন অভিনয়ের জীবনই রয়ে যায়। নানান নাটক করে রাশেদ এক সময় শ্বশুর বাড়িতে চলে যায়।

সে দিন হাসপাতালের বেডে রাশেদ যে অভিনয় করছে না, সে ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার হয়ে গেলাম। আমার বুকের ভেতর হাতুড়িপেটা চলে। আমার গলা শুকিয়ে গেছে অনেক আগে। এই বুঝি রাশেদের শেষ সময়। আমি উঠে গেলে আব্বা আমার জায়গা দখল করে। রাশেদ আব্বার হাত চেপে ধরে, “আব্বা আমাকে মাফ করে দেন, আমি আপনার ছেলে হবার যোগ্য নই। তবু দুঃখ কী, আব্বা? দুই দিনের এই দুনিয়ায় এক সাথে নাই বা করলাম বসবাস। আখেরাতে আমরা এক সাথে থাকব, আব্বা,” রাশেদ কেঁদে ওঠে।

যখন মা রাশেদের পাশে বসে, রাশেদ মা’র হাত ধরে না। তাবলিগ থেকে আসার পর রাশেদ ওয়াজিফা ছাড়া আর কোনও নারীর হাত ধরে না। “আম্মা, আমি তোমার ছেলে হবার যোগ্য নই।” রাশেদ কান্নার রোল বাড়িয়ে দেয়।

“কেঁদো না, তুমি কেঁদো না।”

কে? কে কথা বলল? আমি লাফ দিয়ে উঠি। ওয়াজিফা যে প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটের এক কোনায় দাঁড়িয়ে ছিল, তা আমরা কেউ খেয়াল করিনি। ওয়াজিফাকে না দেখার একটা কারণ বোধ হয় ওর পরনের ধবধবে সাদা বোরকা। যে পর্দার পাশে ওয়াজিফা দাঁড়িয়ে ছিল, সেই পর্দাটাও ধবধবে সাদা পর্দা ছিল।

“আমাদের খবর দাওনি কেন, বউমা?” আব্বা বলে।

“আপনার ছেলে দিতে দেয়নি, আব্বা। ও বলেছে, আমি ওই বাড়ির ছেলে হবার যোগ্য নই। ওদের আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। ওদের আর কষ্ট দিয়ো না।”

একটা লোক নীরবে রাশেদের সুইটে ঢোকে। আমি ওনাকে দেখি। হালকা-পাতলা, চর্বিহীন পেটযুক্ত এবং প্রায় ছয় ফুট লম্বা পুরুষ। আমি ছাড়া আর কেউ তাঁকে খেয়াল করে না। তাঁর মুখের রং তামাটে। মাথায় ছাই রঙের কাশ্মিরি টুপি। টাক ঢেকে রাখার জন্য বোধ হয়। পরনে নীল রঙের প্রিন্স কোট আর নীল রঙের প্যান্ট। তিনি ডাক্তার শদরুল খলিল, ওয়াজিফার ফুফা। তিনি হলেন আর্মির একজন সাবেক কর্নেল। মেডিকেল কোরের সদস্য ছিলেন। বাইপাস আর ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য ঢাকার হাতে গোনা কয়েক জন ডাক্তারের এক জন তিনি। শুনেছি এক বার সিসিউতে থাকা অবস্থায় স্ক্রিনে এক রোগির হার্টবিটের গ্রাফ সরল রেখায় চলে আসে। প্রফেসর কর্নেল শদরুল খলিলকে ডেকে আনা হয়। তিনি ওখানেই ছুরি দিয়ে কেটে রুগির বুকের ছাটনা খুলে হৃৎপিণ্ড বের করে এনে হাত দিয়ে তাতে পাম্প করতে থাকেন। তাঁর অভিজ্ঞ সহকারিরা তৈরি হয়ে যান। তাঁরা সবাই রোগীর সিটটা ঠেলতে ঠেলতে তাঁকে অপারেশন থিয়েটারের দিকে নিয়ে যেতে থাকেন। হাতে ধরে রাখা রোগীর হৃৎপিণ্ডটা পাম্প করতে করতে ডাক্তার শদরুল খলিল রোগীর বেডের পাশাপাশি দৌড়ান। দ্বিতীয় বার অপারেশন করা সে রোগী এখনও বেঁচে আছেন। ডাক্তার শদরুল খলিলের সময় ছিল না হৃৎপিণ্ডটা ধরার আগে হাতে গ্লাভ পরে নেয়ার। ফলে অপারেশনের পর রোগীর বুকে ইনফেকশন হয়। সেই ইনফেকশনও ডাক্তার খলিল সারিয়ে তোলেন। পৃথিবীতে মৃত মানুষ জীবিত করার একটাই উদাহরণ। “মৃত, তবে আজরাইল তখনও তার জান কবজ করেনি,” ডাক্তার শদরুল খলিল নাকি বলে থাকেন। “আজরাইল জান নিয়ে গেলে আমি খলিল কেন, এই পৃথিবীর কেউ তাকে জীবিত করতে পারত না।” তবে ডাক্তার খলিল যতই তথ্যটা সংশোধন করুন না কেন, তিনি এক মৃত ব্যক্তিকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর এই সুনাম চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে।

প্রফেসর শদরুল খলিলকে দেখে আব্বা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান। ডাক্তার সাহেব আব্বাকে জড়িয়ে ধরেন।

“আমি বলেছিলাম জামাইকে চেন্নাই নিলে ভালো হয়,” ডাক্তার খলিল বলেন। “ওপেন হার্ট করা ছাড়া উপায় নাই। আপনার ছেলে অনেক কাঁদল। সে আপনাদের অনেক ভালবাসে, বেয়াই সাহেব। এই শহর ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। সে বাবা-মার কাছাকাছি থাকতে চায়। সে বলল, বাঁচলেও এই শহরে। মরলেও এই শহরে। আমি চারটা রিং পরিয়ে দিলাম। কিন্তু –”

“কিন্তু কী?” আব্বা বলেন।

“সে কথা কী করে বলি, বেয়াই সাহেব?”

“ও কি বাঁচবে না?”

“বুকের দুইটা দরজা পুরোপুরি বন্ধ, বেয়াই সাহেব,” ডাক্তার শদরুল খলিল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন।

“আব্বা, আমি বাঁচব না, আব্বা!” রাশেদ কাঁদে।

“ওপেন হার্ট করতে হবে, বেয়াই সাহেব,” ডাক্তার শদরুল খলিল বলেন। তারপর তিনি আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। “এই কেসের রোগীর ফিরে আসার কোনও প্রিসিডেন্স নাই, বেয়াই সাহেব।”

আমার অবস্থা তখন চুপসে যাওয়া নেতানো বেলুনের মতো। আব্বার মুখটা ছোট আর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মা আর আমি ঘামতে থাকি। রাশেদের জন্য আমার খুব মায়া হয়। ও যে আমাকে এই জীবনে হাজার বার মাগী বলে গালি দিয়েছে, তা আমি ভুলে গেছি। ওকে ছোটবেলার মতো ভালবেসেছি। সেই ভালবাসা যা বুকে আসার পর নিজের হৃৎপিণ্ডটা রাশেদের জন্য দিয়ে দেয়ার ইচ্ছে হয়েছিল আমার।

“আব্বা মাফ করে দিয়েন!” রাশেদের কান্না মৃদুতর হতে থাকে। আর ওর জন্য আমাদের কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে রাশেদ শুধু চোখ দিয়ে কাঁদে।

তখন হাসপাতালে বসে আব্বা রাশেদকে আব্বার গুলশানের বাড়ির হিস্যা বুঝে নেয়ার জন্য উকিল এনে কাগজপত্র তৈরি করান। বাড়ির তিন ভাগের দুই ভাগ রাশেদের। এক ভাগ আমার। রাশেদের জন্য তখন আমি আমার হৃৎপিণ্ড দিতে প্রস্তুত। বাড়ির হিস্যাতো কোনও ব্যাপারই না।

“আব্বা আপনি পুরো বাড়ি ওকে দেন,” আমি বলি।

আব্বা মাথা নাড়ে। হবে না।

“কেন হবে না, আব্বা? ওর দুইটা ছোট ছোট বাচ্চা। একটা বুকের দুধ খায়।” আমিরার বয়স তখন আট মাস।

মা কিছু বলে না। আমি চেঁচামেচি শুরু করি। “আব্বা, আপনি যদি ওকে পুরো বাড়ি না দেন, আমি সিন ক্রিয়েট করব।”

আমি জানি আমার আব্বা কিসে ভয় পায়। সিন ক্রিয়েট হবে বলে আব্বার জন্য আমি হামিদকে তালাক দিতে পারিনি। তাই সিন ক্রিয়েট না করে আমি হামদিকে মেরে ফেলেছি। সিন ক্রিয়েট হয়নি। ওটাই আব্বার স্বস্তি। হামিদ গিয়েছে তাতে আব্বা অবশ্যই খুশি হয়নি। তবে সিন ক্রিয়েট যে হয়নি, তাতে আব্বা স্বস্তি পেয়েছে অনেক বেশি। সরকারি লোক সবাই সিন ক্রিয়েটকে ভয় পায়। জনতা সিন ক্রিয়েট করলেও তারা ভয় পায়। তবে সে অন্য রকম ভয়। আর পরিবারের লোক জনসমক্ষে সিন ক্রিয়েট করলে তাদের ধমনীগুলো দড়ির মতো শক্ত হয়ে যায়, অনেক সময় রক্ত চলাচল বন্ধ হয় আর তাদের হার্ট অ্যাটাক হয় বা ব্রেইন স্ট্রোক করে। সিন ক্রিয়েটের মোকাবেলা করার সাহস না থাকাতে করিম চাচাকে পাট খেতে জীবন দিতে হয়। একই ভয়ে বাহার চাচা নিজের শয়ন কক্ষে মরে পচতে থাকে। আব্বা আবার বংশগতভাবেও এই ভয় রক্তে বহন করে চলেছে। সিন ক্রিয়েট করে আমার দাদি আমার দাদার হাতে আলজিহ্বা হারাতে বসেছিল। দাদির আলজিহ্বা অক্ষত থাকলেও তিনি আর কখনও সিন ক্রিয়েট করেননি। আমি আব্বার দুর্বলতা কাজে লাগাই। শেষ পর্যন্ত মাও আমার পক্ষ নেয়। মা আব্বাকে বলে, আমি যা চাইছি, আব্বা তাই করুক।

আব্বা সিন ক্রিয়েটের ভয়ে পুরো বাড়ি রাশেদের নামে লিখে দেয়।

অবশ্য রাশেদকে ওই অভিনয়ের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছিল। শাস্তিটা ছিল: ওই ঘটনার পর আব্বা আর কখনও রাশেদের মুখ দেখেনি। রাশেদ অনেক অনুমতি চেয়েও আব্বার মৃত্যুর সময় হাসপাতালে ঢুকতে পারেনি। আব্বা আমার মাথায় হাত রেখে মরেছে। এত দিন ধরে ওই সুখের কথা যত বার ভেবেছি তত বার মনে হয়েছে, একটি কি দুটি নয়, ওই সুখের ক্ষমতা আছে আমার মতো একশটা জীবনের কষ্ট এক নিমেষে গিলে ফেলার। কিন্তু আজকে তা ভাবতে পারছি না। আজকের দিনের দুর্যোগে নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছে। তবু আমি আমার চুলে আব্বার মৃত হাতটি অনুভব করার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি মনের শক্তি বাড়াতে। আজ আমরা দুই ভাই-বোন এক হতে পারলে জীবন শক্তিশালী হত। এমন সময়েইতো ভাই-বোনের হাতে হাত রেখে পৃথিবীর মুখোমুখি হওয়া উচিত। কিন্তু রাশেদের মাথায় সেই বুদ্ধি নাই। আর কী সেই জিনিস যা রাশেদের বোধবুদ্ধি কেড়ে নিল, তা আমি জানি না। কিন্তু আমার জানার বড় ইচ্ছে। সন্দেহ একটা আছে বটে। তবে যতক্ষণ নিশ্চিত হতে পারব না, ততক্ষণ ধারণা থেকে কোনও শান্তি পাব না। রাশেদ, ভাই আমার, এত নিষ্ঠুর হোস নে, আমি মনে মনে বলি, আর আল্লাহকে বলি, আল্লাহ্, তুমি রাশেদের মনে বুঝ আর দয়ার সঞ্চার করো।

আটাশ

রাশেদ চেঁচিয়ে গলা ফাটায়।

রাশেদের চিৎকার থামার পর শেখর ভাই বলেন, "শিশির, তুই রাশেদকে সব খুলে বল্।"

রাশেদ কিছু শুনতে আসেনি, শেখর ভাই, আমি মনে মনে বলি। রাশেদ সম্পত্তি আর টাকা চায়। রাশেদকে এ বাড়ি দিয়ে দিলে রাশেদ কোনও ঝামেলা করবে না। মার পঞ্চাশ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র আছে আর উত্তরা ব্যাংকে এক কোটি টাকার একটা ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট আছে। এগুলি রাশেদকে দিলে রাশেদ খুশি মনে মায়ের লাশ দাফন করতে নিয়ে যাবে। মায়ের জন্য দামি আতর নিয়ে আসবে। নিয়ে আসবে সবচেয়ে মোলায়েম কাফন। রাশেদকে আমি চিনি। আর ওকে আমি দিবই না বা কেন। একটা চাকরি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-একটা শিক্ষক এক-একটা পরিবার চালায়। আর আমি তো একা। আমার সাথে এখন আর মাও নাই। আছে শুধু সোনিয়া। আমি অনায়াসে এবং খুব ভালভাবে আমার জীবন কাটাতে পারব। আমার দরকার আমার মায়ের সম্মান রক্ষা করা। আমার লাজুক মায়ের দেহ যাতে কোনও ডাক্তারের কাছে বেআব্রু না হয়, তার জন্য আমি সব কিছু রাশেদকে দিতে চাই।

"রাশেদ, তুই যা চাইবি তা-ই হবে। শুধু মায়ের দাফনে কোনও সমস্যা করিস না, ভাই," আমি বলি।

"আমাকে অপমান করা হচ্ছে।" রাশেদ ছ্যাঁৎ করে ওঠে। "বারবার আমাকে অপমান করা হয়। আমাকে ঘুষ দিতে চায়। ভাবে আমাকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলা যাবে। মানুষের সামনে আমাকে লজ্জিত করে কার কী সুখ? কার কী সুখ মানুষের সামনে আমাকে লজ্জিত করে?"

"রাশেদ, বাবা, তুই কি চাস্," মায়া খালা বলে।

"আমি চাই আমার মায়ের হত্যাকারীর ফাঁসি," রাশেদ বলে। ওর চোখ দিয়ে পানি ঝরে।

আমি রাশেদকে বিশ্বাস করি না। মায়া খালা আর শেখর ভাই রাশেদকে বার বার জিজ্ঞেস করেন, রাশেদ, তুই কী চাস? তাঁরাও রাশেদের চরিত্র জানেন। কিন্তু তাঁদের কথায় কোনও কাজ হয় না। রাশেদ এক কথায় অটল থাকে। খুনির শাস্তি। এ ছাড়া রাশেদ আর কিছু চায় না। আধা ঘন্টা বিতর্কের পর আমার মনেও পরিবর্তন আসতে থাকে। আগে সে বারবার প্রতারণা করেছে। এবার যদি সে সত্য কথা বলে। তা হলে সে মায়ের খুনির শাস্তি চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। ওর পরিবর্তন হলে তো ওর অর্থলোভ-বিত্তলোভ চলে যাওয়ার কথা। যে রাশেদ মায়ের কাছে বাড়ি চেয়ে দায়ের তাড়া খেয়ে পালালো, ও কি আর সেই রাশেদ নাই? যদি না থাকে, আমিইতো সবচেয়ে খুশি হব। আমি খুশি হতে চাই। আমি আমার ভাইকে ফেরত পেতে চাই। কোন্ ওসিডি আমার ভাইকে এমন করল তা আমার কাছে অজানা। হয়তো জানি। ভাই বলে তেমন ভাল করে ভেবে দেখিনি। তবে ভাই যদি পরিবর্তন হয়, তা আমার জন্য ভাল। এত ভাল যে এর বেশি ভাল আমার জন্য আর কিছু হতে পারে না। আমি ওর ছেলেমেয়েকে বুকে নিয়ে ঘুমাব। আমিও সুখী হব। ওর ছেলেমেয়ে আমাকে যে কত ভালবাসে, আর আমি যে ওদের কত ভালবাসি। সব ভালবাসার প্রকাশ সহজ হয়ে যাবে যদি আমার ভাই ভাল হয়ে যায়। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তা-ই যেন হয়। আমি অতীতের সব ভুলে যাব। আমি আমার ভাইকে ফিরে পেলে আমার আর কিছু চাওয়ার থাকবে না। মনের সবচেয়ে গভীর ক্ষত, যা মুক্তি ক্লিনিকে সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ও হয়তো মুছে যাবে। যদি আমার ভাই আমার কাছে ফিরে আসে। ভাই ফিরে আয়। তুই তোর আপামণির কাছে ফিরে আয়, আমি মনে মনে বলি। তোর বউ আর দুই সন্তানসহ আয়। দরকার হলে আরও কাউকে নিয়ে আয়, তোর শ্বশুর শাশুড়ি, বা আরও যদি কেউ থেকে থাকে, তুই সবাইকে নিয়ে আয়। তবু ভাই আমার, তুই আমার হয়ে যা।

ভাবতে ভাবতে খুশিতে আমার চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হয়।

ওয়াজিফা রাশেদের বাম কব্জি চেপে ধরে। মেয়েটার ছোট হাত। রাশেদ যখন ওকে বিয়ে করে তখন ওর বয়স বড় জোর পনেরো ছিল। ওর বাপ ছিল নারী মন্ত্রণালয়ের সচিব, যার কাজ ছিল এটা দেখা যে, আঠারো, না একুশ, বছরের কম বয়সী কোনও মেয়ের যাতে বিয়ে না হয়। আমার আব্বা ওয়াজিফার বাবাকে এই প্রশ্ন করেছিল। রাশেদ অবশ্য তখন ওয়াজিফাকে বিয়ে করে ফেলেছে। ওই প্রশ্ন করার পর ওয়াজিফার আব্বা আমার আব্বাকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। এটা কী বললেন, স্যার? আল্লাহর আইন উপরে না বান্দার আইন উপরে? আপনার ছেলে আর আমার মেয়ে ঘরের ভেতর নিরাপদে হালাল হালাল সহবাস করা ভাল? না দুই জনে চুরি করে আমাদের অজান্তে হারাম হারাম জেনা করা ভাল? আব্বা আর কিছু বলেনি। আমি ওয়াজিফার হাত দেখি। ওর হাত রাশেদের মোটা কব্জিতে বেড় দিতে পারছে না। তবু সে রাশেদকে টেনে নেয়। ওয়াজিফার ভঙ্গি বলে দেয়, বয়স কম হলেও সে অনেক অভিজ্ঞ মেয়ে। সে ঘাড় টেনে সামনের দিকে ঠেলে ধরেছে, যেন পাল তোলা নৌকার গতি ওর। রাশেদকে টেনে টেনে ও ড্রয়িং রুমের সামনে নিয়ে যায়, যা আমাদের অবস্থান থেকে ত্রিশ মিটার দূরে। তারপর ওরা বাম দিকে করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে ঘরের সামনে যায় যে ঘরকে মা যাদুঘর বানিয়েছে। রাশেদ টোকা দিয়ে দেখে, দরজার হ্যান্ডেল ঘুরায়। দরজা খোলে না। রাশেদ আমার দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে পড়ে। রাশেদের মাথা দেড় ফুট নিচে নামে যাতে ওয়াজিফার মুখ ওর কানের নাগাল পায়। ওয়াজিফা রাশেদের কানে কানে কথা বলে। আমি নিজের অজান্তে নিঃশ্বাস বন্ধ করি। মায়া খালা চুপ। শেখর ভাই চুপ। লোকমানের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। লোকমানই বুঝি একমাত্র মানুষ যে আমার উপর কোনও বিশ্বাস হারায়নি। আর সোনিয়া। সে অবশ্য ব্যস্ত। সে ঘর মুছে যাচ্ছে। মেয়েটা কাজ না করে এক মিনিট বসে থাকে না। টিভি দেখার সময় ছাড়া। সোনিয়া যখন ইউটিউব দেখে, তখনও মনপ্রাণ ঢেলে সে তা দেখে। যখন সে কাজ করে, তখনও সারা দেহ দিয়ে কাজ করে। আমি নিঃশ্বাস ছাড়ি। ওয়াজিফা কথা বলেই চলেছে, রাশেদের কানে। রাশেদের পিঠ ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে আছে। ওর কালো পাঞ্জাবি পিঠের উপর ভেজা। ওয়াজিফা কথা শেষ করে ওর মুখের উপর বোরকার ঝালর টেনে দেয়। রাশেদ ফিরে আমাদের সামনে আসে। ডাইনিং হলে। যেখানে আমি, মায়া খালা, শেখর ভাই, সোনিয়া আর লোকমান অপেক্ষা করছি রাশেদের জন্য।

মায়া খালা রাশেদের হাত দুটি ধরতে গিয়ে থমকে যান। মনে হল রাশেদ এবার মায়া খালাকে ওর হাত ধরতে দিত। মায়া খালা নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, “রাশেদ, বাবা।”

“সব করা হয়ে গেছে, খালা,” রাশেদ বলে। “আমি ছেলে হয়েছি বলে কি আমার নিজের লোক নাই? ফস্টিনস্টি না করে কি আপনজন বানানো যায় না? আমার বউ ওয়াজিফা কি ফস্টিনস্টি করে? করে না। আল্লাহ ওকে কত আপনজন দিয়েছে। তারা সবাই আমারও আপনজন। আপনজন বানাতে হলে চরিত্র লাগে, খালা, চরিত্র। চরিত্র রক্ষার জন্য আমি ঘরের বাইরে চলে গেলাম। আর একজন ঘরে থেকেও চরিত্র বিলিয়ে দিচ্ছে। কেয়ামতের আর আছেই বা কয় দিন? মজা নিচ্ছ, মজা? যখন জ্বলন্ত লোহার ডান্ডার উপর বসিয়ে তোমার পরীক্ষা নেয়া হবে, তখন তুমি কী করবা? কী জবাব দিবা? তুমি ফস্টিনস্টি কর? আজকে এক জন। কালকে এক জন। পরশু এক জন। ফস্টিনস্টি। তোমার এক দিনের বেশি কাউকে ভাল লাগে না। হায় আল্লাহ। কেয়ামত চলে এসেছে। তাই আজ ছেলে হয়ে আমি বাড়ি ছাড়া। আর তুমি মেয়ে হয়ে বাড়ি দখল করে আছো। তুমি বাড়ি ছাড়া করলেও আল্লাহ আমাকে বাড়ি দিয়েছেন। তোমার ষড়যন্ত্রে আমি আপনজন হারা হলেও আল্লাহ আমাকে আপনজন দিয়েছেন। আমার দুই মামা-শ্বশুর আর্মির জেনারেল। আমার এক চাচা-শ্বশুর সুপ্রিম কোর্টের উকিল। ব্যারিস্টার বদরুল আহমেদ এর নাম শুনোনি? মতিঝিলে ছয় তলা একটা দালানের পুরোটা জুড়ে ওনার চেম্বার। ওনার আন্ডারে দেড়শ উকিল কাজ করে। ওদের যে কোনও একজনের

জন্য এই ষড়যন্ত্র খুঁজে বের করা নস্যি। থানায় মামলা হয়ে গেছে। আমার এখন আর কিছু করতে হবে না। আমার শ্বশুর-আব্বা সব কিছুর দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তুমি রহম করো। বেরহমের দিলে রহম করো। রহমের দিলে রহম বাড়িয়ে দাও। আল্লাহ, তুমি আমার আম্মাকে জান্নাতবাসি করো–”

বাইরের দরজায় ঢকঢক আওয়াজ হয়।

“ওই যে এসে গেছে, বোধ হয়,” রাশেদ বলে।

আমি রাশেদের বাক্যবাণ থেকে মুক্তি চাচ্ছিলাম। আমার কান গরম। দরজায় আওয়াজে মনে হল আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবুল করেছে। শেখর ভাই দরজা খুলে দেয়।

হুড়মুড় করে সেই পুলিশ অফিসার আর তার পেছনে তিনজন পুলিশ ঘরে ঢোকে। পুলিশ অফিসারটাকে রাতে দেখেছি। এখন যেন নতুন করে দেখলাম। সবুজ ইউনিফর্ম পরা। বেশ লম্বা। মুখটা রাতে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি মায়াময়। মাঝারি গঠনের নাক। কপালটা চওড়া। কপালে কয়েকটা ভাঁজ। আর মুখে উদ্বেগের ছাপ। কিন্তু কেন?

“তাড়াতাড়ি বেঁধে নিয়ে যাও। আমার আম্মাকে হাসপাতালে নিতে হবে ছুরতহাল করানোর জন্য,” রাশেদ আর্দ্র গলায় বলে। তবে ও কারও দিকে তাকায় না।

আমি দৌড়ে মায়ের ঘরে যাই। মাকে পাহারা দেয়ার জন্য মায়া খালা এসেছিল। কিন্তু রাশেদের কারণে মায়া খালাকে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। মা একা। শুয়ে আছে লাল চাদরের নিচে। মায়ের শরীর ফুলে যাচ্ছে। বিশেষ করে পেটের অংশটা। কষ্টে আমারও পেট শক্ত হয়ে আসে। বুকের ভেতর ধুড়ুম ধুড়ুম হাতুড়ির বাড়ি চলছে। এই অবস্থায় আমার পুলিশকে মোকাবেলা করতে হবে। মনে হয় একটা দা নিয়ে বসে পড়ি। মাকে কাটার জন্য যে নিতে আসে তার কল্লা কাটি। মার শরীরে ছুরির আঘাত ঠেকানোর জন্য যত কল্লা কাটার দরকার, কেটে ফেলি। তবে রাশেদের কল্লা কাটব না। ওর মাজা আমি অবশ করব। তারপর ওকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে শেষ করব। এক খুনের যা শাস্তি, একশ খুনেরও সেই শাস্তি।

সোনিয়া আর লোকমান আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। আমি ইশারা করলেই সোনিয়া দা এনে আমার হাতে দেবে। তারপর? তারপর? তারপর আর কল্লা কাটা সম্ভব হবে না। তারপরও রাশেদকে থামানো দরকার। দরকার মা'র নিথর দেহের সম্ভ্রম রক্ষা করা। তোরা এখানে থাক। আমি সোনিয়া আর লোকমানকে বলি।

আমি বের হয়ে ডাইনিং হলে আসি। পুলিশ অফিসার আমার সামনে থমকে দাঁড়ায়। আমাদের চোখাচোখি হয়। অফিসারটার চোখে চোখ রেখে শান্তি পেলাম। রাতে সে চলে যাবার পর থেকে এখন পর্যন্ত এমন শান্তি আর কেউ দিতে পারেনি। আমার মনে হয় অফিসারটাই আমাকে রক্ষা করবে। আমার বুঝি আর কোনও চিন্তা নাই।

অফিসার রাশেদের সামনে যায়।

“একটু দূরে দাঁড়াও,” রাশেদ বলে। “আমার গায়ে ঘামের গন্ধ।”

“আপনি কি রাশেদ সাহেব?” অফিসার বলে।

“কী সমস্যা তোমার?” রাশেদ বলে।

“সমস্যাতো আপনার। আমারতো চাকরি,” পুলিশ অফিসার বলে।

“তা হলে চাকরি করো।”

“আপনি বারবার আমাকে তুমি করে বলছেন কেন?”

“কী?”

“আপনি এমন করে কথা বলছেন কেন?”

“ওই বেটা? কেমন করে কথা বলব? তোকে মহারাজ ডাকব? হুজুর বলব? মহোদয় বলব? বেটা চাকরের বাচ্চা চাকর। যে কাজে এসেছিস সেই কাজ কর্।”

অফিসার চোখ বড় করে আমার দিকে তাকায়। মায়া খালার দিকে চায়। শেখর ভাইয়ের দিকে চায়। সোনিয়ার দিকে চায়।

“কী দেখছো?” রাশেদ বলে। “তুমি কী সেই একই লোক?”

“জি, আমি আপনার বোনের সাথে রাতে কথা বলে গেলাম,” অফিসার বলে।

“ও, কথা বলে গেলা? কত নিয়েছো? কী নাম তোমার?”

“আপনি কি মরহুম শামসুর রহমান সাহেবের ছেলে?”

“ওই মিয়া পুলিশের বাচ্চা। তাকে সাহেব বলছ কোন আক্কলে? তোমার কী পদ? আর সে কোন পোস্ট থেকে রিটায়ার করেছে? তাকে স্যার বলো। এখনই বলো।”

“আপনি এমন করছেন কেন?” অফিসার শান্ত গলায় বলে।

“তুমি আমার আব্বাকে স্যার বলছ না কিন্তু। বলবে কেন? কারণ আব্বা মারা গেছেন। তোমার কী ধারণা আমার আর কেউ নাই? কে আছে জানলে তোমার প্যান্ট ভিজে যাবে।”

“রাশেদ সাহেব, আপনি মাথা ঠাণ্ডা করেন।”

“তা-ই? আমার মাথা গরম। কত টাকা নিয়েছো রাতে? না কি অন্য কিছু।”

“কী বলছেন আপনি?”

“ও কিচ্ছু বোঝো না? দুদু খাও? আগে বলো আপসে? না জোর করেছো? আপসে হলেও সমস্যা নাই। গোসল না করলেই হল।” রাশেদ আমার দিকে তাকায়। “গোসল করলেই বা কি? পানি দিয়েতো আর সব ধুয়ে ফেলা যায় না। পরীক্ষা হবে বশিরউদ্দিন স্পেশিয়ালাইজড করোনারি হসপিটালে। কোনও চালাকি চলবে না। এই পুলিশের বাচ্চা। তোমাকে দেখেতো ফ্রেশ লাগছে। গোসল করে সব ধুয়ে ফেলেছো। তা-ও সমস্যা নাই। ডিএনএ’র স্যাম্পল নেয়া হবে। ধর্ষণের মামলা। বুঝে রাখো।”

“বোনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দিয়েছেন। এখন আবার বোনের পক্ষে নারী নির্যাতনের মামলা দিবেন?”

“অবশ্যই দেব। আমার বোন খুন করেছে। তাই বলে তার ধর্ষণের বিচার আমি চাইব না? আর তুমি যা করেছো তা কি নারী নির্যাতন? কত খারাপ তোমরা পুলিশরা। নারী নির্যাতনের শাস্তিতো কয়েক মাসের জেল। তোমার হবে ফাঁসি। জেনে রাখো আমি মানবিক মানুষ। তোমাদের মতো নিষ্ঠুরতা আমি জানি না।”

আমি রাশেদকে দেখি। ও হাত-পা ছুঁড়ছে। গলা উঁচিয়ে কথা বলছে। সবচেয়ে যেটা বেশি কৌতূহলের, তা হল ওর গলার সুর। একেবারে খাঁটি। ওর অঙ্গভঙ্গি আর গলার আওয়াজের কোথাও কোনও কৃত্রিমতা নাই।

সবার চোখে একই জিজ্ঞাসা? কী শুনছি আমরা? কার সামনে আমরা? আমিই বরং সবার চেয়ে কম অবাক হচ্ছি। কিন্তু তারপরও? রাশেদ আমাকে যে পীড়ন করছে, তার ব্যাখ্যা কী? কিন্তু আমরা সকলেই কি সব সময় কাউকে না কাউকে পীড়ন করে চলছি না? আমি আমার বিভাগের শিক্ষকদের দেখতে পারি না, অন্য বিভাগের শিক্ষকদের দেখতে পারি। রাজনীতির লোকরা নিজের দলের লোককে অন্য দলের লোকের চেয়ে অপেক্ষকৃত বেশি ঘৃণা করে। রাষ্ট্র নিজের মানুষকে হত্যা করে। প্রকৃত ঘৃণা দাম্পত্য শুরুর পরপরই চলে আসে। তা যদি নাও আসে, আসতে কত দিন লাগে? জলবিয়োগ, কাশি, নাকের গর্জন, গায়ের গন্ধ, যে কোনও ছুতাতেইতো সেই ঘৃণা চলে আসে। কিন্তু কেন এমন হয়? বিরানি রান্না করার সময় চালের বিষ মাংসে ঢোকে, মাংসের বিষ চালে ঢোকে, মসল্লার বিষ চাল আর মাংসে ঢোকে। তারপর প্রস্তুত হয় বিষযুক্ত বিরানি। অতি সুস্বাদু খাবার। ভাই রাশেদ, আমি মনে মনে বলি, তুই আমাকে যতই পীড়ন কর্, আমি সয়ে যাব। এক সময় তোকে ক্ষমাও করে দেব। তুই আঘাত দিয়ে যা। ভালো হত, যদি তুই এত নাটক না করে যা চাইছিস, তা সরাসরি চেয়ে নিতিস। আমি তোকে সব কিছু দিয়ে দিতে চাই। শুধু মাকে যদি একটু কবরে শুইয়ে দিতিস। সেখানেও সে পচবে। অন্তত সম্মানের সাথে পচবে। সেটুকু দয়া যদি আজ আমি তোর কাছ থেকে পেতাম। কিন্তু তোরতো সেই চেতনা নাই। আমি কাকে কী বলব?

“ইন্সপেক্টর সাহেব, ওকে বাঁধেন। বেঁধে কতক্ষণ পিটান।” শেখর ভাই এগিয়ে আসে।

“কিচ্ছু করা যাবে না,” ইন্সপেক্টর বলেন।

শেখর ভাইয়ের গাল শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়।

“আপনি বোধ হয় জানেন না, ওনার পেছনের শক্তি,” ইন্সপেক্টর বলেন। “টাকার শক্তি। ক্ষমতার শক্তি।”

“শক্তি থাকলেই কি কেউ আপন বোনের সাথে এ রকম করে?” শেখর ভাই বলে।

“খুনাখুনিতেও গড়ায়,” অফিসার বলেন। “লাশ কবর দিতে দেয়া হয় না অনেক সময়।”

শেখর ভাইয়ের মিলিটারি চোখ দু’টি এক বার ধক করে জ্বলে ওঠে। তারপর সে মাথা নামিয়ে নেয়। মায়া খালার বোঝার শক্তি তার ছেলের চেয়ে বেশি। তবে তিনি বিড়বিড় করছেন। মনে হয় দোয়া পড়ছেন।

আমার মাথা ঘুরতে থাকে। আমিতো ভালই ছিলাম। না ভাল ছিলাম না। ভেতরে ভেতরে নিজেকে অনেক ভেঙ্গে ফেলেছি। গড়বার আগেই মাথা ঘোরা আক্রমণ করে বসল।

এখন আর কিছু করার নাই। যা হতে যাচ্ছে তা হতে দিই। আমি জ্ঞান হারাই। স্নায়ুগুলোর কাছে আত্মসমর্পণের দরকার। তারপর এ নির্যাতিত অবস্থা থেকে অবসর। মূর্ছা যাওয়ার বাসনা আমাকে আক্রমণ করে। মন চায়, আমি দ্রুত অজ্ঞান হয়ে যাই। আর অজ্ঞান থাকি, যতক্ষণ না আমার মা কবরস্থ হচ্ছে। মা যে কী লজ্জা পেত মানুষের কাছে যেতে। ধরতে গেলে দশ বছর সে লুকিয়ে ছিল। লজ্জা আর ভয়। কথা প্রায় বলতই না। বললেও তা ছিল শুধু আমাকে আক্রমণ করা। এখন এত মানুষ মাকে দেখছে। আমি তা সহ্য করতে পারছি না। আমার মাথা চক্কর দিচ্ছে। আমি যে পুলিশটার সামনে, তার পেছনের দেয়াল, আমাদের

মাঝখানে যে আরাম কেদারা, এগুলি ঘুরছে। পুলিশটা পূর্বে, পুলিশটা উত্তরে, পুলিশটা পশ্চিমে, পুলিশটা পূর্বে। আমার চোখের সামনে পুলিশটা ঘোরে। ঘোরার গতি বাড়ে।

আমি নিজেকে এই ঘূর্ণনের হাতে ছেড়ে দেব দেব করি। আমার হাত দু'টি আমারই অজান্তে কিছু একটা খোঁজে। কাছেই তারা একটা চেয়ার পেয়ে যায়। চেয়ারের পিঠের দুই মাথায় দুইটা শক্ত লোহার রড। দুইটা রড আর একটা ভূমির সমান্তরাল রড দিয়ে আটকানো। আমি সেই লোহার ডান্ডাটাকে শক্ত করে ধরি। ততক্ষণে আমার চোখের সামনে কর্মরত সিসিফাসের উদয় হয়। সিসিফাস আপন মনে পাথর ঠেলে চলেছে। গলা ছেড়ে গানও গাইছে। আমি লোহার রড খিঁচে ধরি আর দ্রুত পেটের গভীরে শ্বাস টানি। তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ি।

আমার মাথা ঘোরা কমতে থাকে। আমি সিসিফাসকে দেখি। পাথরের গা বেয়ে বেয়ে সিসিফাস সেই বৃহৎ শিলাখণ্ড ঠেলে চলেছে, যে শিলাখণ্ডকে বিশাল-দেহী সিসিফাসের সামনে ভিসুভিয়াস পাহাড়ের সমান বড় মনে হচ্ছে। সিসিফাসের পথের দুই ধারে সবুজ গাছপালা। সূর্যের উজ্জ্বল আলো। সতেজ সবুজ, সোনালি, নানা রঙের পাতার উপর রোদের ঝিকিমিকি। সিসিফাস মাথাটা একটু পেছনের দিকে হেলিয়ে পাথর ঠেলছে। তার কোনও বিকার নাই। রাজদণ্ড হাতে একে তাকে খুনের হুকুম দেয়া ভাল? না একাকি পাহাড়ের গা বেয়ে উপরের দিকে পাথর ঠেলা ভাল? পাথর ঠেলতে ঠেলতে করিন্থের রাজা সিসিফাস যেন এই প্রশ্ন রেখে যাচ্ছে।

আমার মন শক্ত হয়। দেখি: আমি শিশিরকণা এই নগরের সিসিফাস হতে পারি কি না। এর মধ্যে স্নায়ুর কাছে নিজের পরাজয় ঠেকিয়েছি। আমি নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসে মনোযোগ দিই। সচেতনতার সাথে একটা ভয়ও মনে আসে। আমাকে পুলিশ নিয়ে যাবে। আমার মনের চোখে দৃশ্যটা দেখি। যা সুন্দর নয়। এই কথা বাতাসে ভাসে। তাই তা মনে আসে। বিষয়টা গুজব না সত্যি, তা অবশ্য কখনও জানা হয়নি। এখন কি নিজেকে দিয়ে তা জানতে হবে? অবশ্য জীবনের কোনও কিছুই কষ্ট বা সুখ নয়। সব কিছুই অভিজ্ঞতা। সব কিছুতেই শান্তি আছে। সেই শান্তি পেতে হলে নিজেকে পেতে হয়। সিসিফাসের মতো। যদি আমার জীবনে আর একটা জিনিস যোগ হয়, হোক। আমি যা থামাতে পারব না, তা মেনে নিতে হবে। দেখা যাক কী হয়? আমি আর কতদূরই বা দেখতে পাব। ওরা কি আমাকে নিয়ে যাবে? আর রাশেদকে রেখে যাবে মায়ের কাছে?

জীবনে কত কী পড়েছি। কিছুই কাজে লাগাতে পারিনি। এখন শুধু এটুকু করতে পারি। আমার সম্পূর্ণ মনোযোগটা, আমার বোধে আমার মায়ের জন্য যে কষ্ট, তার উপর নিবদ্ধ করতে পারি। কোথায় আমার বোধ তবে? ব্যথাটা কি আমি আমার শরীরে পাচ্ছি না? হ্যাঁ পাচ্ছি। তবে তা দায়ের কোপ খাওয়া বা বেতের বাড়ি খাওয়ার ব্যথা নয়। আমি শিশিরকণা রসায়ণ শাস্ত্র পড়ি। রসায়ণ শাস্ত্র পড়াই। এই ব্যথা দেহের ভেতর অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ব্যথা। এদের আমরা সনাক্ত করতে না পেরে আমরা কবিতা লিখি। আমার প্রাণের ব্যথা। কিন্তু প্রাণ কোথায়? তারপরও ব্যথা আছে। তা প্রাণে হোক বা রক্তে হোক। কিংবা সারা দেহে রক্তের আর মগজের মধ্যে রাসায়নিক নিঃসরণের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হোক। ব্যথা ব্যথাই।

উনত্রিশ

দুই ঘন্টার উপর হবে রাশেদ এখানে এসেছে। এই দুই ঘন্টায় ও এক বারও কোথাও বসেনি। এখন রাশেদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। অবশ্য আমি ছাড়া ওর কাঁপন কারও চোখে পড়ছে না। রাশেদ ছাড়া আমাদের পুরো ঘর নিস্তব্ধ। বসে বা দাঁড়িয়ে যে যেখানে আছে, সবাই স্থির। পুলিশের সাথে থানায় যাওয়ার ব্যাপারটাকে আমার কাছে খেলো মনে হয়। মায়ের লাশ ঘরে রেখে থানায় যাওয়া। কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না, আমি

আমার মাকে খুন করেছি। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। পুলিশ অফিসার এক বার রাশেদের দিকে তাকায়। তারপর আমার দিকে এগিয়ে আসে।

“কী নাম আপনার?” আমি রাজরানীর মতো জিজ্ঞেস করি। নিজের কণ্ঠের কৃত্রিমতা আমার নিজের কাছেই বিরক্ত লাগে। আমার মধ্যে নানান ঘাতপ্রতিঘাত চলছে। তার থেকে নিজেকে বিযুক্ত করার জন্য হয়তো আমি অদ্ভুত কিছু বলতে চেয়েছি। তবে আমি সাথে সাথে সতর্ক হই আর অফিসারের মুখের দিকে চাই।

“মতিউর রহমান,” অফিসার থেকে উত্তর আসে।

অফিসার আমার সাথে ভদ্রতা দেখালেন। তাঁর কাছে একটু সাহায্য চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। “আমার মার কবর হওয়া পর্যন্ত কি আমি মার সাথে থাকতে পারি?” আমি বলি। “দেখছেন তো, আমার ভাইয়ের মাথা ঠিক নাই।”

“আমি এই প্রশ্ন করে এখানে এসেছি, ম্যাডাম,” মতিউর বলেন। রাতেই দেখেছিলাম আপনার মার সাথে আপনার সম্পর্ক। তাই নিজ থেকে প্রশ্নটা করেছিলাম। তারা আমাকে পারমিশন দেয়নি।”

“প্রেম শুরু হয়ে গেছে? এর মধ্যেই?” রাশেদ দৌড়ে এসে বলে।

রাশেদের কথায় আমার কান গরম হয়। নিজের জন্য যতটা না, তার চেয়ে বেশি পুলিশ অফিসারের জন্য। রাশেদের বাক্য প্রত্যাশিত। উপরন্তু ওর অবস্থা আমাকে চিন্তায় ফেলে রেখেছে, কারণ ও এখনও কাঁপছে। আর কাঁপতে কাঁপতেই রাশেদ বলে, “প্রেম যা করারতো রাতেই করে ফেলেছো। এখন কাজ করো। আসামীকে নিয়ে যাও। আমার অনেক কাজ আছে।”

আমার কান আরও গরম হয়। আমি আমার দেহের এই প্রতিক্রিয়া পছন্দ করতে পারছি না। এই অবস্থাটা এক দিকে ভাল যদিও। কিন্তু সব সময় এটা ভাল নয়। এটা আমার দেহের স্বভাব। সকল নারীর দেহের স্বভাবও হতে পারে। আসলে এটা সকল নারীরই দেহের স্বভাব। যে কোনও কিছুতেই সাড়া দেয়া। গাছ থেকে আম পড়লে এই দেহ সাড়া দেয়। বিদ্যুতের লাইনের ট্রান্সফর্মার ফেটে গেলে এই দেহ সাড়া দেয়। পুরুষের চোখ পড়লে এই দেহ সাড়া দেয়। নারীদের চোখ পড়লেও এই দেহ সাড়া দেয়। গোয়েন্দা বিভাগের মেয়েগুলির স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ অকেজো করার ব্যবস্থা হয় নিশ্চয়ই। অবশ্য সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমেও এই সংবেদনশীলতা মোকাবেলা করা সম্ভব। যা অর্জন করার লাইনে আমি আছি। আমি সচেতন হয়ে রাশেদকে বলি, “রাশেদ, আমি কি মার কবর হওয়া পর্যন্ত মার সাথে থাকতে পারি?”

“ও আল্লাহ, এ কী কথা শুনি,” রাশেদ চেঁচায়। “খুন করে এখন লাশের প্রতি দরদ দেখায়।”

“ভাই, শোন্,” আমি বলি। “লাশ কবর দেয়া হলেই আমি গ্রেফতার হব, তুই যেভাবে চাস সেভাবে।”

“এই পুলিশটা কেন কাজ করছে না? তার উপর কি আদেশ জারি হয় নাই?”

“ওনার উপর আদেশ জারি হয়েছে,” আমি বলি। “কিন্তু তুই চাইলে আমি কিছু সময় বাইরে থাকতে পারব। এই অনুরোধটা রাখ্, ভাই।”

“রাশেদ সাহেব, আপনি আপনার বোনকে আপনার মায়ের কবর হওয়া পর্যন্ত থাকতে দিন,” পুলিশ অফিসার বলেন। “আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, আমি আপনার বোনের গ্রেফতার নিশ্চিত করব।”

“ওই, তুমি কীভাবে জানো আমার মায়ের কবর কখন কীভাবে হবে? যদি মায়ের কবর দিতে ছয় মাস দেরি হয়, তা হলে তুমি কি ছয় মাস অপেক্ষা করবে? বাহ্, কী মজা? ছয় মাস এখানে থাকবা। সরকারি বেতন নিবা। আর প্রেম করবা। লাগাতার প্রেম। তাই না? এই জন্যই আজ দেশের এই অবস্থা। কোনও সরকারি লোক কাজ করে না। তুমি আছো প্রেমের ধান্দায়। আমি কি বুঝি না? আমাকে কি তোমার ষড়যন্ত্রের কাছে হেরে যেতে হবে?”

“উনিতো ওনার মায়ের মেয়ে। আপনি আপনার মায়ের ছেলে। দুই জন আপনাদের মায়ের কবর হওয়া পর্যন্ত এক থাকুন। এত নিষ্ঠুরতা করলে পরে আপনারও কোনওদিন খারাপ লাগতে পারে।”

রাশেদ পুলিশ অফিসারের দিকে চায়। চোখ পিটপিট করে। ও সাহস নিয়ে অফিসারের স্থির দৃষ্টির দিকে বেশি সময় তাকিয়ে থাকতে পারে না।

“এখন সব বুঝতে পেরেছি,” রাশেদ মাথা নামিয়ে আর গলা চড়িয়ে বলে। “রাতে সব কিছু আপসেই হয়েছে। তা হলে আমি মামলা করব কী করে? কীভাবে আমার বোন এত নষ্ট হতে পারে? আল্লাহ্, আল্লাহ্ গো, এই পাপের জন্য আমাদের বংশটা খানখান হয়ে গেল? আল্লাহ্, আমি এখন কী করব? এই দুই জন আমার আম্মাকে মেরে ফেলেছে। এদের ব্যভিচারের সাক্ষীকে ধ্বংস করার জন্য। এরা কত দিন ধরে ব্যভিচারে লিপ্ত, তাওতো জানি না। দশ বছরওতো হতে পারে। না, দশ বছর হবে না। তবে আট বছর পর্যন্ত হতে পারে। আমি বাড়িতে থাকি না বলে ওরা এই বাড়িকে ব্যভিচারের আস্তানা বানিয়েছে। আমার আব্বার বাড়ি ব্যভিচারের আস্তানা, এটা আমি কী করে সহ্য করি? আল্লাহ্, আল্লাহ্গো। যে ব্যভিচারের পথের উপর কাঁটা হয়ে ছিল, তারা তাকে সরিয়ে দিয়েছে। কী আরাম ওদের? ও আম্মা গো। তোমাকে ওরা মেরে ফেলেছে। কিন্তু আল্লাহ্তো আছে। আল্লাহ্র মার সবার উপর। এখন সবার উপর গজব নেমে এসেছে। এই যে, আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, তারা সবাই দেখলেন। সবাইকে আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে। না হলে আমি কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্র কাছে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। বিচারের দায়িত্ব আল্লাহ্র। কিন্তু আমি আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবই। আপনারা অন্ধ। আপনারা বধির। ব্যভিচারের ভারে পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে। আপনাদের কোনও হুঁশ নাই। আল্লাহ্, ও আল্লাহ্। এখনতো আমি এদের বিয়েও দিতে পারব না। ওদের পাপের শাস্তি হয় দোর্‌রা, নয় বিয়ে। ওই ওসি, তুমি কি বিবাহিত? তা হলেতো তোমাকে রজম করতে হবে। কিন্তু আমার বোনের শাস্তি কী? ওরতো স্বামী মারা গেছে। কেউ কি একটা মৌলবি ডাকতে পারে? বিষয়টা জানা দরকার। বিধবাদের ব্যভিচারের শাস্তি কী? আর বিয়ের কথা যদি বলি। আমার বোন কোনও সতিনের ঘর করবে না। ওসি, আমি তোমাকে জানিয়ে দিলাম, আমার বোন কোনও সতিনের ঘর করবে না। আর আমার বোনতো পিএইচডি। তুমিতো মূর্খ, বড়জোর বিএ পাশ। তা হলে কী করে এত সমস্যা উতরে তোমাদের মধ্যে জোড়া মিলবে? তা ছাড়া তুমি কয় বিয়ে করেছ, সেটাওতো জানি না। তোমাদেরতো ঘরে চার পাঁচটা বউ, বাইরে আট দশটা মেয়ে। আবাসিক হোটেল, রেস্টহাউজ আর পতিতালয়গুলির কথা বাদই দিলাম। তা ছাড়া আমাদের বংশের ব্যাপারটাওতো দেখতে হবে। তোমাকে দেখেই বোঝা যায়, তুমি গ্রাম থেকে উঠে আসা ছেলে।”

ঢ্যাব।

একটা আঘাতের শব্দ। একই সাথে কোনও মানব দেহের পতনের শব্দ। আমি শক্ত হয়ে হোঁচট খাওয়া থামাই। আর লাফ দিয়ে পেছনের দিকে ফিরি। রাশেদের বকবকানির এক পর্যায়ে আমি ওর দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই দৃশ্যটা দেখার জন্য আমাকে আবার ঘুরতে হল। এখন দেখি রাশেদ দুই হাতের তালু মেঝেতে ঠেশ দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ওর মুখের রং বদলে ফিকে হয়ে গেছে। আর ওর কাঁচাপাকা

দাড়ির সাদা সাদা ছোপগুলির সংখ্যা বেড়ে গেছে। আবার অন্য দিকে ওর দেহের যে মৃদু কম্পন, তা-ও বোধ হয় থেমে গেছে।

“মোজাম্মেল!” ইন্সপেক্টর মতিউর বলেন।

আমার বুকে একটা ভয়ের ঢেউ খেলে যায়। এই প্রথম অফিসারের গলায় আমি রাগের প্রকাশ শুনতে পাই।

“স্যার, রাইফেলের বাট দিয়ে রানের গোড়ায় মেরেছি।”

“বাহাদুরি!”

“জি স্যার, করেছি। ওনার পেছনে যারা আছে তারা রুই কাতলা। আমাকে ওরা ধরতে আসবে না। আপনার নিচে নামবে না, স্যার। সেই সুযোগ নিলাম।”

ইন্সপেক্টর মতিউর দুই ঠোঁট খিঁচে ধরে মোজাম্মেলের দিকে চান। মনে হয় তাঁদের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক আছে। নাকি নাই? ইন্সপেক্টর মতিউর চোখ বড় করে হালকা মাথা নাড়ান, আর বলেন, “আমাকে তোমরা কেউ মানো না, মোজাম্মেল।”

“এটা কী বললেন, স্যার? আপনাকে আমরা সবাই মানি। কিন্তু আপনাকে আমরা কেউ ভয় পাই না। শুধু ভালবাসি। তাই মাঝে মাঝে বেয়াদবি হয়ে যায়, স্যার।”

“এর পরে যদি চাকরি যায়?” ইন্সপেক্টর মতিউর বলেন।

মোজাম্মেল নামক পুলিশটা গলা ঠেলে ধরেন। তিনিও কাঁপেন। আমার কাছে ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগে না। মনে হয় শুরু থেকেই রাশেদের আচরণে তাঁর মনে ক্ষোভ জমা হতে থাকে। সে জন্য তিনি কাঁপছেন। আর এ রকম হওয়া তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। মোজাম্মেলের কাঁপন রাশেদের মতো অদৃশ্য কাঁপন নয়। তিনি ইন্সপেক্টর মতিউরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

“দুই বছরে তিন বার আমি তোমার চাকরি বাঁচিয়েছি,” মতিউর বলেন।

“এবার গেলে চলে যাক, স্যার,” মোজাম্মেল কাঁপতে কাঁপতে বলেন। “আর আপনি আমার চাকরি বাঁচাতে আসবেন না।”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর কারও গায়ে হাত তুলবে না,” ইন্সপেক্টর মতিউর বলেন।

“সেটা আমার পক্ষে সম্ভব না, স্যার, আপনি জানেন।”

“যা মন চায় তা-ই করো,” ইন্সপেক্টর মতিউর বলেন।

“পঁয়ত্রিশ বছর পিটিয়ে যাচ্ছি, স্যার। কিন্তু এর মতো এমন দয়ামায়াহীন কোনও ইবলিশকে পিটিয়েছি এমনটা মনে করতে পারছি না।”

“ভাল।” ইন্সপেক্টর মতিউরের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

“চিন্তা করেন কেন, স্যার? সাড়ে সাত বছর ঢাকা শহরের ট্রাফিক সার্জেন্টের চাকরি করেছি। আমার ডালভাত খাবার ব্যবস্থা করা আছে। আমার আর কিসের চিন্তা? এই স্যারের রানে বাড়ি দিয়ে মনে শান্তি পাচ্ছি, স্যার।”

“তুমিও নিশ্চয়ই আমার বোনের উপর ভাগ বসিয়েছ?”

এটা রাশেদের গলা। ও উঠে গেছে। আর রাশেদের কাঁপনও আবার শুরু হয়েছে। আমাকে আঘাত দিয়ে রাশেদ যে খুব আনন্দ পাচ্ছে, তা মনে হচ্ছে না। আবার এটাও মনে হচ্ছে, আমাকে আঘাত না দিয়েও রাশেদ থাকতে পারছে না।

“এটাতো তোমাদের চল। তোমরা সবাই মিলে ভাগ বসাও,” রাশেদ বলে।

মোজাম্মেল নামক পুলিশটা রাইফেলের বাট তোলেন।

“ওকে মারার দরকার নাই,” আমি বলি।

মোজাম্মেল সাহেব আমার দিকে তাকান আর হা হয়ে যান। তাঁর মুখের রং ধুলা মাখানো পোড়া তামার মতো। নাক খাড়া। তাঁকে সার্জেন্টের মতো লাগছে না। মন্ত্রীদের মতো লাগছে। টাকা তাঁর আছে। বাড়ি গাড়ি সবই আছে বোধ হয়। আর সে জন্য মনে এত সাহস। তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা। অথচ এখন তাঁর মুখ নড়ছে না।

“ও আমার ভাই। ও কী করছে ও জানে না,” আমি বলি।

মোজাম্মেল সাহেব রাইফেলটাকে তার কাঁধে ঝুলিয়ে নেন। “কী জানি, কেমন মানুষ আপনারা, ম্যাডাম?”

“আমি ওর বোন। এটা কেন বুঝতে পারছেন না, মোজাম্মেল সাহেব? আমি হয়তো ওর চেয়ে একটু কম পাগল।”

“এটাকে পাগলামি বলে, ম্যাডাম?” মোজাম্মেল সাহেবের ভ্রূ কপালের দিকে লাফ দেয়। “আপনার সুযোগ আছে এখানে। আমরা সবাই আপনার পক্ষে। আপনি চাইলে আমি নিজে আপনার ভাইয়ের ঠ্যাং দুটির ব্যবস্থা করতে পারি। আপনি এই সুযোগ না নিয়ে ভাইয়ের জন্য মায়া দেখাচ্ছেন। কী বলব, ম্যাডাম?”

মোজাম্মেল সাহেব জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানেন। আর আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। মনে যে একটু আঘাত পাননি, তা-ও বলা যাবে না। এমন দুঃসময়ে আমি আর কী করতে পারি? আমি মোজাম্মেল সাহেবের দিকে মমতার দৃষ্টিতে তাকাই। চোখ নরম করে। সচেতনভাবে। মানুষকে ভালবাসা দিতে আমার ভাল লাগে। যদি সারা পৃথিবীর সব মানুষকে একটা করে আলিঙ্গন দিতে পারতাম, তা হলে হয়তো আমার একটা স্বপ্ন পূরণ হত। মানুষের মায়া দরকার। কিন্তু দেয়া যায় না। লজ্জা লাগে। শরীর কাঁপে। উত্তেজনা হয়। কত কত বাধা। তাই কোলকুলি সম্ভব নয়। মোজাম্মেল সাহেবের মুখটা এর মধ্যে স্বাভাবিক হয়। ঠোঁট দুটি শিথিল হয়ে বন্ধ হয়। ভ্রূজোড়া স্বস্থানে ফিরে আসে। তিনিও আমার দিকে মমতার দৃষ্টিতে চান। তারপর মুখ খোলেন। “ম্যাডাম, আপনি আমাকে পছন্দ করেননি।”

“না, কেন?”

“সাড়ে সাত বছরে আমার সাত বার জন্ডিস হয়। জন্ডিস নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক ঠিক রেখেছি। ঢাকা শহরের ধূলা আর ধোঁয়া খেয়ে আমার লিভারের অর্ধেক নষ্ট হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম ফুসফুস নষ্ট হবে। সেটা হল না। নষ্ট হল লিভার। আমার লিভারের অর্ধেক কেটে ফেলা হয়েছে, ম্যাডাম। আমি চাই আপনি আমার হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির কথাটাও জানুন। আমি কাজে ভাল বলে ট্রাফিক বিভাগ থেকে চেয়েও বদলি নিতে পারিনি। সহজে বদলি করে না দেখে মন্ত্রীদের গাড়ি আটকেছি। আইজি সাহেবের গাড়ি আটক করে জরিমানা

করেছি। তবু আমার বদলি হয়নি। আমার বদলি হয়েছে লিভার পচে যাওয়ার পর। কোনও রকম জানটা যাতে বাঁচে।”

“এত কথা কেন বলছ?” ইন্সপেক্টর মতিউর বিরক্ত হয়ে বলেন।

“আসল কথা যে বলতে পারছি না, স্যার!”

এরপর মোজাম্মেল সাহেব চোখ সরিয়ে মেঝের দিতে তাকান। তাঁর বুক বুঝি ঠকঠক করে। “আমার মেয়েটা, আমার মেয়েটা!” তাঁর গলা দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কথাগুলি বের হয়, আর মেঝেতে তাঁর অশ্রু ঝরে। বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা মার্বেলের উপর বাড়ি খায়। আমার কানে তার আওয়াজ আসে। জানি না, কী কষ্ট লোকটার মনে।

“কিছু মনে করবেন না,” ইন্সপেক্টর মতিউর বলেন। “ওনার একটা মেয়ে ছিল। মেয়েটা ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যায়। সাতাশ বছর বয়সে। আপনার বয়সী হবে।”

“আর বলবেন না, স্যার!” মোজাম্মেল চেঁচিয়ে ওঠেন। “আর সহ্য করতে পারছি না, স্যার। আমার মেয়েটা। কী রোগ এটা, স্যার? চার দিনে চল্লিশ গুন বাড়ে। এত কষ্ট আর কিছুতে নাই। এত কষ্ট আর কিছুতে নাই, স্যার। আমার মেয়ে যে কষ্ট পেয়ে মরল সে কষ্ট আমি কোথাও দেখিনি। কোথাও না, স্যার। কোথাও না। আপনি আর একটা কথাও বলবেন না, স্যার। আমি সহ্য করতে পারছি না।”

আমার নিঃশ্বাস পড়ে।

“পৃথিবীর সব মেয়েকে মোজাম্মেল তার নিজের মেয়ে মনে করেন,” ইন্সপেক্টর মতিউর বলেন।

মোজাম্মেল সাহেবের কষ্টে আমার চোখ ভিজে যায়। আমি ফুসফুসের ক্যান্সারের দুর্ভোগের কথা জানি। আমার এক বান্ধবীর মাকে দেখেছি এ রোগে মারা যেতে। কত দ্রুত মানুষের ক্ষয় হয়। তখন আর তার কোনও সান্ত্বনা চলে না। আজকে আমার যে বিপদ সেখানে দাঁড়িয়েও আমার মনে হচ্ছে আমার বিপদ ফুসফুসের ক্যান্সারের বিপদের চেয়ে কম। ফুসফুসের ক্যান্সারে মেয়ে হারানো এক পিতা আমার সামনে কাঁদছে। আমাকে তার নিজের মেয়ে মনে হচ্ছে। পৃথিবীতে ভালবাসার অভাব নাই। কিন্তু বেশির ভাগ ভালবাসা নষ্ট হয়ে যায়। ভালবাসার প্রয়োগের উপর মানুষের জোর দেয়া উচিত। তার জন্য দরকার পৃথিবী থেকে সব সংস্কার দূর করা। আমার ইচ্ছে করছে ঘন্টা দুয়েক একান্তে মোজাম্মেল সাহেবের কথা শুনি। তা হলে তিনি অনেক ভাল অনুভব করতে পারবেন। এমন কাজ আমি অনেক করেছি। সর্বশেষ ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লেখা যাবে। সেটা ঘটে গত বছর বর্ষাকালে। এক দিন রাস্তায় পানি উঠলে আমি গাড়ি ছেড়ে রিক্সায় উঠি। বাসার গলিতে ঢোকার পথে দেখি পানিতে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে এক তরুণ বসে আছে। তার লুঙ্গি তাঁবু হয়ে আছে আর চারপাশের সব পানি রক্তে লাল হয়ে গেছে। আমি রিক্সা থামিয়ে জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে? লোকটা বলল ম্যানহোলে পড়ে তার পা ফেটে গেছে। লোকটাকে আমি সাহায্য করতে চাই। সে সাহায্যের দরদাম করে। আমি তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিই, আর আমার রিক্সাটা দিই তাকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য। এর দশ কি এগারো দিন পরের ঘটনা। আমি শুকনা রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছি। তামান্না ফার্মেসিতে ঢুকব কিছু জিনিস কেনার জন্য। ঢোকার পথে দেখি সেই লোক। তার ডান রান থেকে রক্ত বের হচ্ছে। লুঙ্গির ভেতর থেকে। সে বালু দিয়ে রক্ত চাপা দিচ্ছে। তার মনে যেন অসীম ধৈর্য, এমনভাবে সে মুখ গোল করে রেখেছে। আমি কেনাকাটা সেরে বের হওয়ার পথে তাকে বলি আমার গাড়িতে উঠতে। সে আমার গলায় মায়ার আভাস পায়। আমার সাথে আসতে রাজি হয়। তবে হেঁটে হেঁটে। আমাদের বিল্ডিংয়ের নিচে আমার একটা খালি ঘর আছে। আমি তাকে সেটাতে ঢুকাই। আর তার গল্প শুনি। সে আমার সাথে গাড়িতে ওঠেনি, এ জন্য নয় যে

আমার গাড়ি রক্তে ভরে যাবে, যদিও সে চাচ্ছিল না আমার গাড়ি নষ্ট হোক। তার গাড়িতে না ওঠার মূল কারণ ছিল আমি বেগানা নারী। সে আমাকে বলল, চার বছর বয়সে মক্তবের হুজুরের কাছে সে দোজখের গল্প শোনে, আর ভয় পেয়ে যায়। সেই ভয় খেয়ে সে সিদ্ধান্ত নেয়, সারা জীবন সে সেজদায় কাটাবে, আর আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাইবে, আল্লাহ যেন তাকে দোজখে না পাঠায়। আট বছর বয়স পর্যন্ত সে বাড়িতে বসবাস করেছে। এক বার স্কুল ছেড়ে মাদ্রাসায় যায়। বাপ ধরে এনে পেদায়, আর স্কুলে দেয়। সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে সে মসজিদে মসজিদে বাস করে। নামাজ পড়ে আর সেজদায় পড়ে থাকে। একটা পুটলি নিয়ে ঘোরে। পেট চালানোর জন্য নানান কায়দায় ভিক্ষা করে। বেশি সময় ভিক্ষা করলে সেজদার সময় কমে যায়। সে কম সময়ে ভিক্ষার কাজ সারে। আর তাই সে ভিক্ষার জন্য নতুন নতুন কৌশলের আশ্রয় নেয়। ওই সময়টায় পা ভাঙ্গার ভান করা ছিল তার নতুন কৌশল। সে আমাকে বলেছে, "বলেন, আপা, কেউ যদি দোজখের ভয় করে, সে কি কখনও সেজদা থেকে উঠতে পারে? আমি আপনাকে বুঝাতে পারব না, আপা। আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ দোজখের ভয় করে না। যারা ভয় দেখায়, তারাও ভয় করে না। শুধু আমি দোজখের ভয় করি। তাই আমি সেজদায় কাটাই।"

"মিথ্যা কথা বলে ভিক্ষা করা কি গুনার কাজ নয়?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"অবশ্যই গুনার কাজ," সে বলেছিল। "কিন্তু আমার ভেতর কোনও যুক্তি কাজ করে না। আমি অনেক ভয় পাই। যখন সেজদায় থাকি শুধু তখন ভয় পাই না। তাই আমি বেশি সময় সেজদায় থাকি। আমাকে খেয়াল রাখতে হয় অন্য কোনও কাজে যেন আমার সময় নষ্ট না হয়।"

আমি তার কথা বুঝি। আমি তাকে বিশ্বাসও করি। এটাতো সত্য যে, দোজখের আগুনের যে বিবরণ আমরা জানি, আর তা যদি আমরা বিশ্বাস করি, তা হলে আমাদের কারও পক্ষেতো সেজদা থেকে ওঠা সম্ভব নয়। ছেলেটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়। তার ভেতর, একমাত্র তার ভেতর, আমার সারা জীবনে এক জন সত্যিকার বিশ্বাসী মানুষ দেখার সুযোগ হয়।

ছেলেটা বলেছিল তাকে কারও কাছে কোনও জবাবদিহি করতে হয় না। সেজদারত মানুষকে কেউ প্রশ্ন করে না। ছেলেটার বয়স উনিশ কি কুড়ি হবে। সে বলল দশ বছর ধরে সে মসজিদে বাস করছে, আর দোজখের ভয়ে জীবনটা সেজদায় কাটিয়ে দিচ্ছে। আমি তাকে আবার পাঁচ হাজার টাকা দিই। পরে আর তার সাথে আমার দেখা হয়নি। হলে আবার টাকা দিতাম।

মানুষের কথা শুনতে আমার ভাল লাগে। সুযোগ থাকলে আমি মোজাম্মেল সাহেবের মেয়ের কথা শুনতাম। তাকে কোনও কিছু সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমার এ দুর্যোগে তা সম্ভব নয়। তবু মোজাম্মেল সাহেবকে কিছু একটা বলা দরকার।

"আমি কাউকে ঘৃণা করি না, মোজাম্মেল সাহেব," আমি বলি। "আপনার হৃদয়ে আপনার মেয়ের জন্য যে ভালবাসা, সেটাকে আপনি কষ্ট থেকে সুখে পরিণত করুন। ভালবাসা নতুনরূপে অনুভব করার চেষ্টা করুন। দেখবেন, এটা সম্ভব। ভালবাসা সুখের জিনিস। কষ্টের জিনিস নয়। শুধু আমাদের এটা শিখতে হয় কী করে ভালবাসাকে সুখের অনুভূতিতে রূপান্তরিত করতে হয়। তখনও কষ্ট আপনার থাকবে। কিন্তু আপনি যে শান্তি পাবেন তা হবে অনেক বেশি গভীরতর। মেয়ের প্রেমে স্থায়ী শান্তি। আপনি তা অর্জন করতে পারবেন। আপনার সেই গুণ আছে। চেষ্টা করুন।"

মোজাম্মেল সাহেবের দুই গাল আর কপাল উজ্জ্বল হয়। আমার মনে হয় তিনি ভালবাসার সুখ খুঁজে পেতে শুরু করেছেন। দেখে আমার খুব ভাল লাগে। আমার উপর তাঁর দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ তেমন নরম আর মোলায়েম। তাঁর চোখে অশ্রু টলটল করে। তবে তাঁর বুকে এখন আর মোচড় নাই।

মোজাম্মেল সাহেবকে দেখে আমার সুখ হয়। দশ বছর ধরে মেয়ের ব্যথায় কষ্ট পাওয়া পিতা। তাঁর অধিকার আছে ভালবাসার সুখের। আমার খুব ভাল লাগে। এতক্ষণ তিনি গুলি করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পজিশন নিয়ে। এখন তিনি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমারও বোধোদয় হয়। আমি তাঁকে যা শেখালাম তা নিজের উপর প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিই। আমার জীবনে এখন যা দরকার, তা নিয়ে আমার ভাবতে হচ্ছে। আমার মায়ের জন্য আমার ভেতর যে ভালবাসার কষ্ট আমিও তা আমার ভেতর সুখে রূপান্তর করতে চাই। ভালবাসাকে আমি আর মায়ের মৃতদেহের মধ্যে সীমিত রাখব না, আমি সিদ্ধান্ত নিই।

মোজাম্মেল সাহেব আমার জন্য আশির্বাদ হয়ে এলেন। তাঁর সাথে কথা বলে আমি আমার ভাবনার রাস্তা পেয়ে যাই। আমি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করিঃ মায়ের দেহ এখন নির্জীব। ওটাকে কবর দিলেই বা কী, না দিলেই বা কী? হাসপাতালে দান করে দিলেই বা কী, আর সমুদ্রে ফেলে দিলেই বা কী? এ দেহ হয় পচবে, নয় ছাই হবে, মিশবে পৃথিবীর মাটি আর বাতাসের সাথে। হয়ে যাবে মহাবিশ্বের অংশ। আমরা সবাইতো সেই মহাবিশ্বের অংশ। শুধু কয়েক বছর আমাদের এই জীবন।

সান্ত্বনা অর্জন করার জন্য কথাগুলো আমি নিজেকে চার বার বলি। বর্তমান অবস্থায় আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে বাধ্য। যা আমি করতে বাধ্য, তা মানতে না পারা কোনও বাহাদুরি নয়, এটা আমি শিখেছি। মায়ের শেষ আলিঙ্গনটা মনে আসাতে আমার চোখ আবার বন্ধ হয়ে আসে। আমি চোখ খিঁচে ধরি। তারপরও অশ্রু ঠেকাতে পারি না। এমন নয় যে সে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আলিঙ্গন করেছে। ওসিডির কারণে তা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু সে যে আমাকে আলিঙ্গন করেছে, আমি তা-ই ভুলতে পারছি না। পৃথিবীতে মা মেয়ের সম্পর্ক যে সবচেয়ে নির্মল, তাও আমার বোঝা হয়ে গেছে। মায়ের পেটে অঙ্কুরিত হওয়ার পর থেকে মা বা মেয়ের যে কোনও এক জনের মৃত্যু পর্যন্ত এই দুই জনের যে সম্পর্ক, আমি তার কথা বলছি। মা আর ছেলের সম্পর্কও নির্মল হতে পারে, তবে সে জন্য দুজনকেই সঠিক হতে হবে। মা মেয়ের সম্পর্কের জন্য এই বাধ্যবাধকতা নাই। তাই এই সম্পর্ক নির্মলতম সম্পর্ক। আমার এই নির্মল সম্পর্ক এখন আমার সম্বল। রাশেদের উপর কী ভর করেছে, তা আমি আর এক বার ধারণা করার চেষ্টা করি। আগেও করেছি। এখন বোধ হয় তা বেশি করে অনুধাবন করতে পারছি। তবে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। জীবনে কখনও যদি সুযোগ হয়, তখন রাশেদকে বোঝার চেষ্টা করব। আমার এই জীবনে আমার এক মাত্র ভাই আমার অজানা রয়ে যাবে, তা আমি হতে দেব না।

আমি বুঝতে পারি আমিই সঠিক। আমি মোজাম্মেল সাহেবকে যা বলেছি তা আরও বেশি সঠিক। তাই বুঝি আমার কাছে কিছু একটা প্রকাশিত হয়। আমার ত্বকের নিচে কোনও আলো, সারা শরীর জুড়ে, আলো কিংবা আলোর মতো কিছু। আর তার থেকে মোলায়েম মিষ্টি অনুভব, সারা দেহ জুড়ে। আমি নিঃশ্বাসে মনোযোগ দিই। দেখি আমার নিঃশ্বাস শান্ত আর গভীর আর ধীর। না, আমার মনের দুঃখ আর কষ্ট একটুও কমেনি। তারপরও শান্তি পাচ্ছি। আমাদের মা মেয়ের নির্মল সম্পর্কের কথা ভাবতে ভাবতে। নির্মল মানে নিরুপদ্রব নয়। অনেক উপদ্রব ছিল। কিন্তু সম্পর্ক থেকে গেছে। কারণ এটা নির্মলতার গুণ। এখন নির্মলতার আর এক গুণ উপলব্ধি করতে পারছি। তাই বুঝি আমি মায়ের বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করার শক্তি অর্জন করছি। আমি দেহের প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দিই। পায়ের নিচে চপ্পল অনুভব করি। তারপর চপ্পল খুলে ফেলি। মেঝের শীতলতা অনুভব করার জন্য। তারপর আবার চপ্পল পরে নিই। আমি বুঝে যাই, কী জ্ঞান পেলাম। নতুন জ্ঞানের সাহায্যে আমি মনে মনে বলি, মা, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তোমার ছেলের এই অবুঝ নিষ্ঠুর খেলা আমাকে এটাই শেখাল, মা। আমি তোমাকে আমার মধ্যে বিলীন করে নিলাম। তোমাকে আর লজ্জা পেতে হবে না। এখন তোমার লজ্জা আমার মুখ পাবে, তোমার অবসাদ আমার মাথা গ্রহণ করবে, আমার দেহে তোমার অপরিচ্ছন্নতাকে আমি স্থান দিলাম, মা। আমি তা বারবার ধুতে যাব না। কখনও না। তুমি এখন

আমার। আর প্রকৃতির। তোমাতে আমাতে আমি মহামিলন ঘটিয়ে নিলাম, মা। তোমার ছেলে যা করতে চাইছে, করুক। শুধু এটুকু চাই, ও যেন এ পৃথিবীতেই বুঝতে পারে, ও ভুল করেছে। ও যেন সচেতন হতে পারে, যাতে ও নিজের কষ্ট দূর করতে পারে। ও যেন মৃত্যুর ভয়ে বেহুঁশ হয়ে না যায়। আমি ইন্সপেক্টর মতিউরকে বলি, "হাতকড়াই পরান। আমার ভাইকে দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দিন, যে আমি পালিয়ে যাব না।"

"এখন আর হাতকড়া পড়িয়ে কী হবে?" রাশেদ বলে। "যা জানার তাতো সবাই জেনে গেছে। শেখর ভাই দেখো। মায়া খালা দেখেন। দেখেন ঢলাঢলি।"

রাশেদকে এখন আর কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না। রাশেদ বকে যাচ্ছে। কেউ তাকে শুনছে না। আমি শুনছি। কারণ আমি সব কিছু শুনতে চাই, দেখতে চাই। আমি পলায়নপর নই। রাশেদ এক জন পুলিশকে ইশারা করে। সে হাতকড়া নিয়ে আমার সামনে হাজির হয়। "আমাকে দাও," ইন্সপেক্টর মতিউর বলেন।

ইন্সপেক্টর মতিউর তাঁর ডান হাত দিয়ে এমন ভাবে হাতকড়াজোড়া আমার নাভির সামনে উঁচিয়ে ধরেন, মনে হয় ওগুলি প্রেমের বাঁধন। তারপর আমার বাম হাতে তিনি একটা হাতকড়া পরান। ইন্সপেক্টর সাহেবের ত্বক ঘামে ভেজা আর শীতল। আমার মনে হয় আমি একটি বাগদানের আংটি পরলাম। গায়ে কাঁটা দেয়। রোমাঞ্চ! আসল আরামটা তখন লাগে যখন মেরুদণ্ডের দুই পাশের পেশিগুলিতে শীতলতা ছড়িয়ে পড়ে। এই আরাম আরও গভীর হত, যদি পেশিগুলির শিথিল হওয়ার সুযোগ থাকত। কিন্তু বোধের জন্মের কারণে সেগুলি আগেই শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তবে পেশির সব শিথিলতা এখন আরও বেশি টের পাচ্ছি। এই আরাম অনুভব করার দরকার আছে। ভেতর থেকে সৃষ্টি হওয়া আরাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোন্ আরাম আমার? কেউ আমার পিঠের নিচের তোষক টেনে নিয়ে যেতে পারে। বিদ্যুৎ চলে গিয়ে আমার ঘরের এসি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। খেতে খেতে আমার গলায় কাঁটা বেঁধা বা আমার হেঁচকি ওঠা বা আমার ভরা পেটের বিদ্রোহ ঘটতে পারে, আর ঘর্ষণের আরাম, তাওতো রাগমোচনের আগেই ফুরুত করে প্রথম বুলেটের উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, অথবা নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে সিক্ততা। আর এই যে আরাম, যা ভেতর থেকে তৈরি হল, যা বাইরের কিছু আমাকে দিল না, শুধু সচেতন চিন্তা, সপ্রতিভতা, আর সচেতনতা আর ধ্যান দিল, এ আরামে আমার অধিকার একচ্ছত্র। আমি তা উপভোগ করি। আমি অনুভব করি আমার ঘাড়ের পেশি, যা এখন শিথিল আর মোলায়েম। হৃৎপিণ্ডটা পূর্ণ কিন্তু ওজনে হালকা। মাথাও হালকা। যেন আমার উপর দিয়ে কোনও ঝড় বয়ে যায়নি। আমার বাড়ি ভেঙ্গে যায়নি। আমার পায়ের নিচের মাটি সরে যায়নি। আসল কথা হল, এর সব কিছু হয়েছে। তবে সব আমার হাতের বাইরে। হাতের মুঠোয় এসেছে সচেতনতা। আমার মা আকাশে মিলিয়ে গেছে আর আকাশ আমার হয়েছে। আমাদের মা মেয়ের আর আকাশের ভয় নাই, মা শুষে নেবে বজ্রের আঘাত কিংবা বিজলিচমক, আর আমি হব চিরকালের পাখি।

বোধ হয় হয়েও গেছি। আমার দেহ আনন্দের ঝর্নাধারা ছেড়ে দিয়েছে। আমি তা উপভোগ করি।

ত্রিশ

আমার দেহের এই সুখ সহসা ঘটে যাওয়া কোনও সুঘটনা নয়। স্বীকার করতে দ্বিধা নাই আমার কিছু অর্জন আছে। আমি মানুষের সকল সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছি। আমি বুঝতে পারি রাশেদের অত্যাচার আমার শরীরটাকে কতটা আমার অজান্তে শক্ত করে ফেলেছিল। একটা জ্ঞানের প্রকাশ আর ইন্সপেক্টর মতিউরের একটুখানি – না অসীম – ভাল ব্যবহার কী মধুর পরিবর্তন আনল আমার দেহের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। যা ছড়িয়ে পড়ল কোষে কোষে। মধুর অনুভূতি হয়ে। আমি মতিউরের ঠোঁটগুলি দেখি। সেখানে কোনও ভেসলিনের আভাস নাই। সে যে গোসল করেছে সেটা বোঝা যায়। আর ওর ঠোঁটগুলি দেখে

মায়া লাগে। অনেক মায়া। যে মায়া আমার নরম পেটে মোলায়েম পরশ হয়ে ত্বকের উপর আর নিচে সমানভাবে ছুঁয়ে যায়। কোনও ছেলের যেমন লাগবে তার স্বপ্নের মেয়েটির ধোয়া ঠোঁট, যেখানে প্রসাধন নাই, আছে প্রসাধনের দুর্ব্যবহারের চিহ্ন, একটু শুকনো, একটু পাণ্ডুর। একখানা হাতকড়া ইন্সপেক্টর মতিউরের হাতে। আমি চলি তার সাথে।

আমার আর নিজেকে একা মনে হচ্ছে না। এই দুর্যোগে আমার এক জন সাথী আছে। মন চায় মাকে এক বার দেখি। আরতো দেখব না। তারপর মনে হল, কষ্টটা পেয়ে কী লাভ। মাকে আকাশ হিসাবেই রাখি। তারপর মনে হল সিসিফাসতো মাকে দেখত। যত কষ্টই পাক না সে। সিসিফাস কষ্টকে আপন করে নিয়েছে। আমি বলি, মায়ের ঘরে যাব। ইন্সপেক্টর মতিউর আমাকে নিয়ে যান। মা লাল চাদরের ভেতর। মায়ের পেটের অংশ আরও ফুলে গেছে। তারপরও মনে হচ্ছে: গত দশ বছরে মা এই প্রথম শান্তি পাচ্ছে। মা'র কোনও সুইসাইড নোট রেখে যাওয়ার কথা নয়। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সুইসাইড নোট: আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। রনিও একটা লিখে গিয়েছিল। সুইসাইড নোট তারাই লেখে, যারা আবার দুনিয়াতে ফিরে আসতে চায়। যারা জীবনের মায়া কাটাতে পারেনি। মা মুক্তি চেয়েছে। মা কীভাবে মরেছে, তা আমি বোধ হয় একটু বুঝতে পারছি। বিষয়টা মনে আসছে আর যাচ্ছে। রাসায়নিক পদার্থগুলি নিয়ে আমি অনেক ভাবি। কিন্তু এখন ভাবতে চাচ্ছি না। পরে ভাবব।

"চলুন," আমি বলি।

শেষ বারের মতো সচেতনভাবে মাকে আমার মধ্যে বিলীন করে নিই। আর মাকে দিয়ে আকাশ গড়ি। চূড়ান্তভাবে। মায়ের ওই দেহটার মধ্যে মায়ের জন্য আমার ভালোবাসা আর সীমিত রইল না। আমি যে এই ভালোবাসা অর্জন করতে পেরেছি, সে জন্য খুভ ভাল লাগছে আমার। আশা করি আজ থেকে মোজাম্মেল সাহেবও একই সুখ পাবেন। মতিউরের দীর্ঘ দেহ আমার পাশে পাশে যায়। একটা কদমও সে আমার আগে বাড়ায় না। আমি পা ফেললে ও পা ফেলে। জহিরের কাছ থেকেও কখনও এমন একটা সূক্ষ্ম কিন্তু মর্মভেদী অনুভূতি পাইনি। পূজারী হিসাবে জহিরের তুলনা দুই পৃথিবীর কোথাও নাই। জহির মায়ের স্বপ্ন-সন্তান, মতিউর নারীর স্বপ্ন-পুরুষ।

মানুষের ভেতর ঘটা রাসায়নিক পরিবর্তনগুলিকে এক সময় আমার কাছে অশ্লীল মনে হত। এখন দেখি এই পরিবর্তনগুলিই সব। আর সুযোগ পাব কি না, জানি না। যদি পাই। তবে জৈবরসায়ণ আরও ভালভাবে পড়ব। গবেষণা করব। এ মুহূর্তে যদিও প্রতিটা বিক্রিয়ার প্রক্রিয়া আমার জানার দরকার নাই। আমি তাদের ফলগুলি অনুভব করছি। আমার অনুভবের এই পরিবর্তনকে আমি রূপান্তর হিসাবে দেখতে চাই। যা স্থায়ী। রূপান্তর অবশ্য হচ্ছে। তাই বুঝি আমার ভেতর থেকে লজ্জা বা হীনম্মন্যতা বা বিব্রতভাব ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে। আমি মায়া খালার দিকে চাই। জীবনযুদ্ধে বিজয়ী বীরাঙ্গনা, মায়া খালা। তার চোখে বিহ্বলতা ছাড়া কিছু দেখি না। রনির মা মায়া খালা। দেখে মনে হচ্ছে না, রনিকে তার মনে আছে। আমার মনে না হলেও, আসলে মায়া খালা তার মেয়েকে ভোলেনি। মা কখনও তার সন্তানের কথা ভোলে না। কিন্তু মায়া খালা কখনও রনির কথা তোলেও না। মায়া খালা রনির একটা জিনিস কবরে নিয়ে যাবে। মায়া খালা এ কথা আমাকে নিজে বলেছে। আর সেটা হল রনির সুইসাইড নোট। তেইশ পৃষ্ঠা।

আমাদের থেমে যেতে হয়। রাশেদ এসে মায়া খালার হাত দুটি ধরে আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। রূপান্তরিত আমি জীবন আর অভিনয়ের মধ্যে পার্থক্য সহজে ধরে ফেলি। রাশেদের কান্নায় কোনও অভিনয় নাই। মায়া খালা ওকে বুকে টেনে নেয়। রাশেদের কান্না আরও তীব্রতর হয়।

রাশেদের জন্য আমার মায়া লাগে। আমার ইচ্ছা করে ওকে একটু সান্ত্বনা দিই। ও এখনও শিশু রয়ে গেছে। জীবনের শান্তি-সুখ কোনও কিছুর খোঁজ ও পায়নি। কী পেয়েছে, ও-ই জানে। ওর অসুখের সাথে চেয়ারম্যান স্যারের কিংবা হামিদের অসুখের কী পার্থক্য আছে, কে জানে? আমি রাশেদের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াই। "রাশেদ আয়। তোকে আলিঙ্গন করি," আমি বলি। "তুইতো আমার ভাই।" রাশেদ মায়া খালাকে ছেড়ে আমার বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে। আমার বাম হাতটা তুলতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। ইন্সপেক্টর মতিউর নীরবে হাতকড়া থেকে আমার হাত মুক্ত করে দেন। আমি রাশেদকে আলিঙ্গন করি। নিজের মমতায় নিজে সিক্ত হই। বুঝতে পারি রাশেদের উপরও আমার মায়ার প্রভাব পড়েছে। রাশেদের শরীরের ঢেউ শান্ত হতে থাকে। রাশেদ কান্না থামালে আমি ওকে মুক্ত করি।

রাশেদ, মায়া খালা, শেখর ভাই সবাইকে বিহ্বল অবস্থায় রেখে, পুনরায় বাম হাতে হাতকড়া পড়ে, মতিউরের পাশে হেঁটে খোলা দরজা দিয়ে বের হয়ে লিফট পর্যন্ত যাই। যেন আমি বেহেশতে যাচ্ছি, কিংবা শ্বশুর বাড়ি, আমার ভেতর এমন অনুভূতি। আমার পাঁজরের উপর নরম পেশিগুলি অনেক শিথিল। আর শক্তিশালি। আমি বুকের ভেতরে আর বাইরে এমন অনুভব আগে কখনও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। জহিরের জন্য দুশ্চিন্তায় আমার বুকের পাঁজরগুলি সব সময় শক্ত হয়ে থাকত।

"আপনি কি আমার কেস ডিল করবেন?" আমি ইন্সপেক্টর মতিউরকে জিজ্ঞাসা করি।

"জি।"

"এরপর কী হবে?"

"আপনাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করব। আপনি একটা জবানবন্দি দিবেন। তারপর কাল সকালে আপনাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে।"

যে দুঃস্বপ্ন মাথায় এসেছিল, তার রেশমাত্র আমার ভেতর নাই। ইন্সপেক্টর মতিউর আর আমার মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। শুনেছি ইতালির পুলিশ বন্দিদের গায়ে কখনও হাত তোলে না। আমাদের দেশে তা হয় না। ইন্সপেক্টর মতিউর এক জন আদর্শ অফিসার হোক, আমি সেই কামনা করি।

আমরা পুলিশ ভ্যানের সামনে আসি। ভ্যান থেকে দুই জন মহিলা পুলিশ নেমে আসেন। ওঁদের মধ্যে যিনি নাদুসনুদুস, পেট বের হওয়া, মুখ মায়ায় ভরা, তিনি ইন্সপেক্টর মতিউর থেকে হাতকড়ার অর্ধেক গ্রহণ করেন আর যত্ন করে তা ধরেন। আমি আগে ভ্যানে উঠি। তারপর আমার রক্ষী দুজন ওঠেন। আমাদের সামনে আর একটা গাড়ি। ইন্সপেক্টর মতিউর ওটাতে গেলেন।

আমি পুলিশ ভ্যানটা দেখি। নতুন ভ্যান। প্রাথমিক স্কুলের টুলের মতো দুইটা টুল দুই পাশে বসানো। আমি একটার মাঝখানে বসি। আমার সামনের টুলে মহিলা দুজন বসেন। আমি মাঝে মাঝে ভাবি মানুষের গায়ের রং নিয়ে কথা বলা ঠিক নয়। আমি বরং তাঁদের শরীরের কথা বলি। দ্বিতীয় মহিলাটা তেমন লম্বা নন, তবে তিনি আরও বেশি স্বাস্থবতী। দেহটা চতুর্দিকে ছড়ানো। তাঁর শরীরের অনেকগুলি চর্বির রোল তাঁর ইউনিফর্মের ভেতর থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে। তাঁর মুখটা মলিন। দুজনই আমাকে অপলক দেখছেন। আমি কোনও জড়তা অনুভব করছি না। ওঁদের দুজনকেই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। অথচ এঁরা সারা দিন ডিউটি করবেন বলেই মনে হয়। এই মোটা ভারী ইউনিফর্ম পরে আমাদের দেশের মেয়েরা পুলিশে চাকরি করছেন। ওঁরা ঘামছেন। তা ঘামুন। বাতাসের আর্দ্রতা যদিও একটু কম হওয়ার কথা। তবু তাঁরা এভাবে ঘামছেন। আমার বিষয় নিয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। আমি মবিলের গন্ধ পাচ্ছি। পচা মবিল দিয়ে নতুন ভ্যানটার ইঞ্জিনের বারোটা বাজানো হচ্ছে।

ভ্যানটা চলতে শুরু করে। আমি ড্রাইভারকে দেখতে পাচ্ছি না। তাতে কী? আমার এখন যেই অবস্থা সেই অবস্থায় যা দেখা যায় না তা বেশি দেখা যায়। এটা জীবনের কোনও ভাল বা মন্দ অবস্থা নয়। এটাই বর্তমান। এটাই সপ্রতিভতা। সকল রোগের ওষুধ। সকল সমস্যার সমাধান।

একত্রিশ

আমি আগে কখনও থানায় আসিনি। আমি জানতাম না, থানার ভেতর একটা শীতল শান্তিময় আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে। অবশ্য এক জন আমলার মেয়ে হিসাবে ব্যাপারটা ধরতে আমার দেরি হয়নি। এ সব সরকারি অফিস ব্রিটিশ আমল থেকে কুমারীর জীবন যাপন করছে। আমি জানালা দিয়ে একটা নারকেল গাছ দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি আমার মাথার সমান উঁচু মধুমালতী আর মোরগঝুঁটি গাছ আর তাদের শাখে লাল আর লাল-সাদা ফুল। এই অফিস প্রাঙ্গণগুলির রয়েছে কুমারীর জীবনের অমলিন সুখ। কুমারী জীবনের কী সুখ, তা সমসাময়িক পৃথিবীতে মাদার তেরেসার মতো বোধ হয় আর কেউ জানে না। সুখের মধ্যে যারা থাকে, তারা অবশ্য খেয়াল করতে পারে না যে, চাইলে নির্মলভাবে সেই সুখ উপভোগ করা যায়। আমাদের পুলিশ কর্তা মতিউর এই সুখের মাঝে জীবনের বড় একটা সময় কাটান, কমপক্ষে প্রতিদিন ষোলো ঘন্টা। আমরা যারা পুলিশকে উঠতে বসতে গালি দিই, তারা অনেকেই জানি না, এ সব পুলিশ কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে। সকালে কাজে আসতে হবে বলে অনেকে রাতে বাসায় না গিয়ে গাড়িতে কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নেয়, উঠে আবার ডিউটি শুরু করে। অবশ্য পুলিশ যে একা পরিশ্রম করে, তা নয়। আব্বা যখন ফেনীর ডিসি ছিল, আব্বা চব্বিশ ঘন্টা কাজ করত। ঘুমের মধ্যেও কাজ করত। কারণ আগামী দিনের সমস্যা কীভাবে মোকাবেলা করবে, তা ভাবার জন্য চার-পাঁচ ঘন্টার ঘুমের সময়টা ছাড়া আর কোনও সময় ছিল না। মগজের অর্ধেক ঘুমাত আর অর্ধেক আজকে হাতে আসা আগামী দিনের সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবত।

নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করছি, এ জন্য যে, আমি এক জন ন্যায়বান পুলিশ ইন্সপেক্টর পেয়েছি। ইন্সপেক্টর মতিউর, আমি যাঁর মুখোমুখি বসে আছি। আমার পর্যবেক্ষণের ইতি টানেন এক জন পুলিশ ভাই। আমার সামনের টেবিলের উপর একটা পিতলের ট্রে রাখেন। ট্রের মধ্যে একটা চওড়া পিতলের থালা, থালার মধ্যে দুইটা ভাঁজ করা পরোটা, একটা ডিমের ওমলেট, এক স্তুপ ভাজি সবজি, একটা দুই বটু কাটা আর পানি দিয়ে ধুয়ে ধূলামুক্ত করা পরিপাটি সাগর কলা। পাশে একটা পিরিচের মধ্যে কাচের গেলাসে দুধ-চা। ধোঁয়া ওঠা দুধ-চা।

খাবার দেখে এতক্ষণে মনে হল আমি গত দিন দুপুরে তিন লোকমা ভাত আর আলু ভর্তা খেয়েছিলাম। মার জন্য মন খারাপ থাকাতে আর কিছু খেতে পারিনি। মা অবশ্য খালি পেটেই মারা গেছে। সে বোধ হয় সর্বশেষ খেয়েছিল গত পরশু সন্ধ্যায়। আমি আমার এক ঠোঁট দিয়ে আর এক ঠোঁট স্পর্শ করি। ওরা শুকিয়ে কড়া ভাজা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মতো হয়ে আছে, আমি অনুভব করি। নিচের ঠোঁট ভেজানোর গোপন চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বুঝতে পারি আমার জিভও শুকনা। জিভ ভেজানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝতে পারি, আমার দাঁতও শুকনা। তবে এখন জিভের আর্দ্রতা ফিরে আসছে, খাবার দেখে। আর অনুভব করি আমার খালি পেট। আমি পানি চাই। পুলিশ সাহেব কাচের গেলাসে করে আমার জন্য পানি আনেন। দেখে বেশ পরিষ্কার মনে হয় গেলাসটাকে। নিশ্চয়ই পানিটাও বিশুদ্ধ হবে। পুলিশ নিশ্চয়ই সবাইকে এই খাতির করে না। তবে এরা সবাই জেনে গেছে, আমি নির্দোষ। মনে হয় এটাও জেনে গেছে, আমি বড় বিপদে আছি। তাই এখন আমার প্রতি সবার মায়া হচ্ছে। আমি গেলাসটা হাতে নিই। আমার হাতে কাচের শীতল পরশ, যা আমাকে জানিয়ে দেয় আমি আমাতে আছি। ইন্সপেক্টর সাহেব আমার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেন। পানির গেলাসটা মুখের দিকে

তোলার আগে এটুকু প্রাইভেসি আমার ভাল লাগে। আমি পানি পান করি। গেলাসটা টেবিলের উপর রেখে একটা তৃপ্তির দম ছাড়ি।

থানায় আসার ব্যাপারটাকে এখনও তামাসাই মনে হচ্ছে। না, মায়ের মৃত্যু নয়। সেটা ঘটেছে। তবে এই মামলা-মকদ্দমাটাকে তামাসা মনে হয়। অবশ্য এর চেয়েও অনেক ছোট ব্যাপারে থানা-পুলিশ হয়ে থাকে। তারপরও আমার কেন যেন মনে হয় মতিউর সাহেব আমাকে ছেড়ে দেবেন। আর আমি বাড়ি যাব। সোনিয়ার অবস্থাটা জানা দরকার।

"কী হতে যাচ্ছে, মতিউর সাহেব?" আমি বলি।

অফিসার আমার দিকে তাকান। বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল আর তর্জনির মধ্যে থুতনিকে হালকাভাবে আবদ্ধ করেন।

আমি কপট তাচ্ছিল্যের সাথে যোগ করি, "আমাকে কি রিমান্ডে নেয়া হবে?"

"আমাকে রিমান্ড চাইতে হতে পারে।"

আমি মতিউরের কণ্ঠে চটুলতার কোনও আভাষ খুঁজে পাই না।

"কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"চার জন মানুষ আপনাকে খুন করতে দেখেছে। আপনি স্বীকার করলে কোর্টের কাজ তাড়াতাড়ি হবে। না করলে দেরি হবে।"

"তারা কারা?"

"আমি জানি না, ম্যাডাম।"

"মিথ্যা সাক্ষ্যতে আমার বিচার হবে?"

"তা জানি না, ম্যাডাম। তবে আপনি আপনার আম্মাকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবেন, এমনই মনে হচ্ছে।"

"মিথ্যা সাক্ষ্যতে?"

"মনে হচ্ছে শাস্তি নির্ধারণ করেই এগুনো হচ্ছে। তার আগের অংশটা কেবলই একটা প্রক্রিয়া।"

"সত্যিই কি তা-ই?"

"জি।"

রাশেদের নিপীড়নের পুরো ঘটনা আমার সারা শরীর দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করি। আমার চোখ দু'টি বুঝি পেছনে ঘোরানো তারপর ১৫০ ডিগ্রি উপরের দিকে তাক করা। আমি আমার মাথার মধ্যে থাকা রাশেদকে পরীক্ষা করি।

"কী ভাবছেন?" ওসি সাহেব বলেন।

"রাশেদের কথা।"

"আমাদের এখানে ওনার একটা ফাইল থাকার কথা। ওটা খুঁজতে গেছে এক জন।"

“রাশেদের ফাইল! এটা আপনি কী বললেন?”

“জি। তবারক কী হল।” ওসি সাহেব তার সামনে থাকা পুলিশটার দিকে গলাটা বাড়িয়ে দেন।

“বলেন কী?” আমার মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে।

“ভোরে আমি সময় পাইনি,” ওসি সাহেব বলেন। “ডেপুটি কমিশনার সাহেব বার বার ফোন করছিলেন আপনার ওখানে যাওয়ার জন্য। তাই ফাইলটা দেখা হয়নি।”

খটখট বুটের আওয়াজ পাওয়া যায়। তবারক নামক পুলিশ ভাই একটা ফাইল ওসি সাহেবের সামনে থপ করে রাখেন। টেবিলের উপর একটা হালকা ধূলার ধোঁয়া সৃষ্টি হয়। ওসি মতিউর তবারক সাহেবের দিকে তাকান।

“সরি, স্যার,” তবারক সাহেব বলেন। “আপনার তাড়া দেখে ফাইলটা মুছতে ভুলে গেছি।”

আমার চোখ আমার নাস্তার উপর। ধূলার ঝড় এ পর্যন্ত আসেনি তেমন একটা। তবারক সাহেব ঘুরে কোনার একটা কেবনিেটের একটা ড্রয়ার খুলে একটা রুমাল বের করেন আর টেবিল থেকে ফাইলটা নিয়ে কোনার কেবিনেটটার উপর রেখে ওটাকে ডলে ডলে মুছতে থাকেন।

“আমি কৌতূহলবশত দেখতে চেয়েছিলাম,” মতিউর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন। “এখন মনে হচ্ছে ফাইলটা দেখা জরুরি।”

তবারক সাহেব বাদামি রঙের ফাইলটা আবার ওসি সাহেবের সামনে রাখেন।

“রাশেদের?” আমি জিজ্ঞেস করি।

ওসি সাহেব আমার কথার উত্তর করেন না। তিনি ফাইলটার ফিতা খোলেন, ডাল খোলেন, তারপর ওটার উপর ঝুঁকে, ফাইলটা পড়তে থাকেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে প্রথম পাতা পড়েন। তারপর তিনি কয়েকটা পাতা উল্টে যান আবার একটা পাতা মনোযোগ দিয়ে পড়েন। তারপর তিনি কয়েকটা পাতা মনোযোগ দিয়ে পড়েন। কৌতূহলে আমার দাঁড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় মতিউর ফাইলের মধ্যে আমার সমস্যার, কিংবা আমার ভাই রাশেদের সমস্যার সন্ধান পেয়েছেন। একটা পাতা পড়তে গিয়ে ইন্সপেক্টর মতিউরের ভ্রূজোড়া উপরের দিকে ওঠে। তিনি পাতাটা পড়েন। এবার তাঁর ভ্রূজোড়া কুঞ্চিত হয়। তিনি পড়তে থাকেন। তিনি আরও কয়েকটা পাতা উল্টান। এর পর তিনি একটা বেশ লম্বা পাতায় পৌঁছেন। পাতাটার নিচের অংশে ভাঁজ। তিনি হাতের তালু দিয়ে ভাঁজটা মসৃণ করার চেষ্টা করেন। তারপর উনার মাথা একটু সামনের দিকে সরে আসে। মনে হচ্ছে তিনি প্রথম লাইন থেকে পড়তে শুরু করেছেন। মনে হচ্ছে তিনি খুব ধীরে ধীরে পড়ছেন। তাঁর চোখের উপরের পাতা টানা, ভ্রূজোড়া আবার উপরে উঠে যায়, আর নামে না।

আমি নিঃশ্বাস ধরে রাখি। জানি না কী আছে ওটাতে। রাশেদ কি খুনটুন কিছু করেছে? কী করতে পারে রাশেদ? ওর কি সেই সাহস আছে? রাশেদ একটা ভীরু ছেলে। ও আর কত দূর যেতে পারে। আমি ইন্সপেক্টর মতিউরের টানটান চোয়ালের দিকে চেয়ে থাকি। বেচারার জন্য আমার মায়া লাগে। কী দরকার আছে ওঁর? আমার জন্য এত কিছু করার। আর আমি যে রাতে তাঁর সাথে কঠোর আচরণ করেছি তার জন্যও আমার খারাপ লাগে। এতটা কঠোর না হলেও হয়তো পারতাম। অবশ্য বুঝতে পারছি আমাকে এ জীবনে আর ছিনালিপনা করতে হবে না। ছিনালিপনার সুবিধা আর অসুবিধা দুটোই আছে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল অনেক ছেলে ওটাকে মায়া হিসাবে না নিয়ে প্রেম হিসাবে নেয় আর প্রেমে পড়ে যায়। সুবিধা হল পুরুষদের একটু প্রাণবন্ত রাখা যায়, যা আমার ভাল লাগে। সব মানুষকে এক দাগে মাপা আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস।

ব্যতিক্রম কাউকে পেলেই কেবল আমরা ভাবি যে ব্যতিক্রম মানুষও আছে এ পৃথিবীতে। টেবিলের উপর ঠেকা খাওয়া ফাইলটাতে দুই কব্জি ঠেকিয়ে ব্যতিক্রম মানুষ ইন্সপেক্টর মতিউর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

"কী হয়েছে?"

"আপনার ভাই আগেও একটা বিয়ে করেছিল। বোধ হয় সেটা আপনারা জানেন না।"

ওসি সাহেব আমার দিকে তাকান। তাঁকে বিচলিত দেখায়। আমি মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিই: আমরা রাশেদের একটার বেশি বিয়ের কথা জানি না। তবে রাশেদ বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। তখন সে একাধিক বিয়ে ইত্যাদি করলে অবাক হবার কিছু নাই।

"আপনারা, মানে আপনি, আপনার ভাই, আপনার মা, সবাই অদ্ভুত। মোজাম্মেল ঠিকই বলেছে।"

"কেন, কী হয়েছে? আপনি নিজে বিবেচনা করুন। মোজাম্মেল সাহেবকে টানছেন কেন?"

"ম্যাডাম, তার জীবনের যেই অভিজ্ঞতা, তার সিকি ভাগওতো আমার নাই।"

"তো? কী হয়েছে?"

"কিছু মনে করবেন না, ম্যাডাম। একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

আমি ওসি সাহেবের পানে কান পাতি। আমি দীর্ঘ দিন ধরে যা করতে চেয়েছি, বর্তমানে বাস করা, যা আমি আগে কখনও করতে পারিনি, এই ওসি সাহেবের প্রভাবে আমি তা করতে পারছি। আমি তাঁর চোখের দিকে চাই। নিজের নিঃশ্বাস অনুভব করা যে একটা আরামের ব্যাপার সেটা আবিষ্কার করি। আমি আরও বেশি বর্তমানে প্রবেশ করি।

"কী প্রশ্ন?"

"ওসিডি আর নেশা কি একই জিনিসি?"

"কেন বলছেন?"

"দুটি কি একই জিনিস?"

"ওসিডি আর নেশার মধ্যে মিল আর অমিল দু'টোই আছে," আমি বলি। "ওসিডি মস্তিষ্কের চাহিদা আর এর ফল হল নিরন্তর কষ্ট আর হতাশা। নেশাও মস্তিষ্কের চাহিদা। তবে নেশা পূরণ হওয়ার পর সাময়িক তৃপ্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আখেরে তা আবার হতাশা নিয়ে আসে। কাজেই এই দুটোর শেষ ফল বিষণ্নতা আর হতাশা। তবে নেশার মধ্যে সাময়িক আনন্দ আছে, যা ওসিডির মধ্যে নাই।"

ওসি সাহেবের চোখ দু'টি তাঁর ভিতরের দিকে চায়। আমি জানি তিনি রাশেদকে নিয়ে ভাবছেন, নিজেকে নিয়ে নয়।।

"আমাকে খুলে বলুন, প্লিজ," আমি বলি।

"তা হলে আপনার ভাইয়ের ওটা নেশা, ওসিডি নয়," ইন্সপেক্টর মতিউর বলেন।

"কিন্তু বিয়ের বিষয়েইতো বললেন। আর নেশার ব্যাপারটা আমরা জানি। বিয়ের কথাটা জানি না। ও তিন বছর বাড়ি ছিল না। ওই সময় কী হয়েছে আমরা কিছুই জানি না।"

“বিয়ের বিষয়টা আমার কাছে বড় ব্যাপার না।”

“তা হলে?”

“নেশার ব্যাপারে কী জানেন?”

“ও গাঁজা, ইয়াবা এসবের নেশায় পড়েছিল।”

“আর কিছু?”

“আর কিছু আমি জানি না।”

ওসি সাহেবের একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে ফাইলটার উপর।

“আমি কিছু বুঝতে পারছি না,” আমি বলি।

“আপনি নিজেই পড়ুন,” ওসি সাহেব বলেন।

ফাইলটা হাতে নেয়ার আগে আমি কয়েকবার ঢোক গিলি। তারপর ভারী ফাইলটা আমার সবুজ সালোয়ার আর বাদামী কামিজের কোলের উপর রেখে আমি মাথা নিচু করি। লিগ্যাল সাইজের পেপারে গোছানো হাতের লেখা। ছোট ছোট কালো অক্ষর। প্রথমে আমি কিছু বুঝি না। কার লেখা? কেন লেখা? অনেক দূর পড়ে এসেও কিছু বুঝতে পারি না। তারপর একটু একটু বুঝতে শুরু করি। আর পড়াতে আমার মনোযোগ নিবিষ্ট হয়।

“...আমারে বাচান। সবাই মিলে আমারে বাচান। হে দিনে আট দশ বার চায়। আমি কাজ করতাম। হে কাজের জাগায় গিয়া বইসা থাকত। আমার সন্তান আছে। সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াইতে পারি নাই তার জন্য। হে দিনে পনর বিশ বার চায়। আমার হাতে অনেক কাজ। হে আমারে কাজে যাইতে দেয় না। আমি কাজে ফিরা যাইতে চাই। আমি তারে জাগা দেখাইচি। বলচি, তুমি যাও, আমি কিচু বলব না। হে যাইবার চায় না। বলে ছিপিলিচ আর গনোরিয়া অইবে। আমি কি করি। আমি আর তারে সামলাইতে পারি না। আমার প্রথম চবি হিট খাইচে। দ্বিতীয় চবিটা করতে পারচি না। চবি না করলে আমি কেমনে বাচুম। হে একটা পাগল। হের কোনো বিরাম নাই। রাইত দিন শুধু এইটা চায়। আমার গা হইয়া যায়। হাটতে পারি না। হে এইটা বার বার চায় বইলা হেরে তারা চবি থেইকা বাইর কইরা দিচে। হে বলে অবিনয় করতে পারি না, ফন্টি। হিট খাইয়া যাই। আমি গরে থাকুম। তুমি গরে থাক। টাকার বেবস্তা আমার। আমরা তোমার বাইচ্চাটারে এতিমখানায় দিয়া দিই। আমরা দুই জন সুখে থাকি। আমার চেলেটার বাপ মরে গেচে। আমি চাই হে আমার সন্তানের বাপ হইয়া থাকুক। হে আমার সন্তানরে এতিম খানায় দিবার চায়। আমার বড় বয় করে। আমি অবিনয় করতে চাই। তার উপর আমি নির্বর করতে পারুম না। আমি কত্তিপখের কাচে বিছার চাই না। টাকা চাই না। কিসের টাকা? এক টাকার কাবিন। আমি সুদু হের হাত থেইকা নিছতার চাই...”

এই অংশটা মনে হল আমি এক নিঃশ্বাসে পড়লাম। ভুল বানানগুলির জন্য আমার হাসি পায় না। মেয়েটার জন্য খারাপ লাগে। আমি চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ রাশেদের কথা ভাবি। রাশেদের জন্য আমার আরও বেশি খারাপ লাগে। আমি ওর রোগ বহু বছর ধরে আন্দাজ করছিলাম। সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না। এখন সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম। কিন্তু তা যে এ ভাবে হবে তা কখনও ভাবিনি। পুলিশ অফিসার মতিউরের সাহায্যে। তার কার্যালয়ে। আমার বুক উঠানামা করে। হৃৎপিণ্ডের ভেতর ধুক্‌ধুক করে। এই রোগের আরও দুই জন রোগী আমার চেনা। তবু রাশেদের জন্যই আমার সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে। রক্তের বন্ধন। আপন ভাই।

“রাশেদের এই অবস্থা!” আমার মুখ থেকে ক্রন্দন-ভারে সিক্ত কথাগুলি বের হয়ে পড়ে।

ওসি সাহেব আমার দিকে চান। সমব্যথীর দৃষ্টিতে। তারপর আস্তে করে বলেন, “আমিওতো ভাবতে পারছি না।”

“আপনিও কি...” আমি ওসি সাহেবের পানে চাই। আর অস্বস্তিতে আমি তাঁর থেকে চোখ সরিয়ে নিই।

ওসি সাহেব দ্রুত ডানে বামে মাথা নাড়েন। তারপর চোখ তুলে আমার দিকে তাকান। তার দুই গালের উপর কিছুটা বিষণ্নতা, কিছুটা অনুরাগ মাখানো মৃদু আভা। “আপনি?” তিনি বলেন।

আমি এই প্রশ্ন উপেক্ষা করতে পারি না। লজ্জায় আমার কান গরম হয়। গাল গরম হয়। আর গালের মধ্যে রক্ত এমন খোঁচা দেয় মনে হয়ে ভেতর থেকে সুঁইয়ের খোঁচা খাচ্ছি। জ্ঞানীদের একটা কথা আছে। মন ধোঁকা দিতে পারে। দেহ কখনও ধোঁকা দেয় না। মানে হল মন যা বলে তা সত্য নাও হতে পারে। দেহ যা বলে তা সত্য।

মুখ লুকানোর জায়গা নাই। ঠোঁট চেপে আমি লজ্জা কমানোর চেষ্টা করি। ওসি সাহেবের যে এই রোগ নাই, তা অবশ্য আমি এর মধ্যে বুঝে গেছি। আর আমিতো তাঁকে রাতে পরীক্ষাই করেছি।

বত্রিশ

হামিদ, চেয়ারম্যান স্যার, রাশেদ। আমি হিসাব করি। আমার জীবনের তিন পুরুষ। তিন জনের একই রোগ। রাষ্ট্র জানে না। কর্তৃপক্ষ জানে না। আশপাশের কেউ জানে না। জানি শুধু আমরা, যারা এদের সাথে জড়িত। আমি তাদেরকে বিচার করার আগে নিজের কথা এক বার না ভেবে পারি না। আমি হামিদকে সামলেছি। নিজেকে প্রশ্ন না করে আমার উপায় নাই, যদিও নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকার সুযোগ এখন আমার নাই। মনে আসে জহিরের কথা। মতিউরের মতো জহিরেরও এ রোগ ছিল না। জহিরের বরং উল্টো কিছু ছিল। একটা সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য। যা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রথম বারের কথা। আমরা মিলনের পূর্বরাগে ডুবে ছিলাম। কিন্তু চূড়ান্ত মিলন হল না। জহির আমাকে হাত দিয়ে অনুভব করায়। কেন এমন হল? আমি বলি। আলিঙ্গনের প্রভাব। জহিরের মতে যা শুধু আমি সৃষ্টি করতে পারি। জহির আমাকে সে কৃতিত্ব দিল, পৃথিবীর তাবত নারী থেকে তা তুলে নিয়ে। আমাকে সে জগতের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় নারীর আসনে বসাল। স্বীকৃতি দিল। প্রমাণস্বরূপ জহির আমাকে শুধু তার কামনার ভারকেন্দ্রই নয়, তার পিঠের ঘামও অনুভব করাল। অঙ্গবিহীন মিলনে সকল অঙ্গের রাগমোচন, পৃথিবীর পদ্ধতিতে নয়, অলৌকিক পথে, জহির বলেছিল। আমারতো কবর হয়েই গেছে, জহির বলেছিল, আমি পরকালে আছি, সে জন্য বোধ হয়, আমি এমন অলৌকিক সুখ পাই, আর এই দুই সুখের কোনও তুলনাই চলে না, জহির বলেছিল।

আমি জহিরকে বুঝি। আমি জহিরের কবর হয়ে যাওয়ার ঘটনা জানি। তাই আমি জহিরকে বিশ্বাসও করি। আমি জগতের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় নারী, জহির বার বার বলছিল, আর কেমন করে যে আমাকে জড়িয়ে ধরে ছিল, তার অনুভব প্রকাশের সময় এখন নয়। আমি মনে মনে বলেছিলাম, না বুঝে জগতের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় নারী যখন হয়েই গেলাম, তখন বুঝেশুনে এক বার হই। আমি নিজের মধ্যে বোধ ও বিশ্বাস দুই তৈরি করি। আমি জগতের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় নারী। আমি একটা গভীর শ্বাস গ্রহণ করি। জহিরকে আর এক ধাপ আলিঙ্গনের সুখ দেয়ার জন্য তৈরি হই।

আমি জহিরকে সেরা আলিঙ্গনটাই দিতে চেয়েছিলাম। আর তা কাজও করেছিল। বিপরীতভাবে যদিও। আমি এক সেরা আলিঙ্গনে হাজার হাজার সেরা আলিঙ্গনের সুখ বের করে আনি, নিজের ভেতর থেকে, দেবতারা মান্দারা পর্বত দিয়ে মহাসমুদ্রে ঘাই দেয়, অমৃতের উদগীরণ ঘটায়, অমৃতের মহাস্রোত, দেবতারা পান করে আকণ্ঠ, অসূররাও পান করে এক কোশ এক কোশ করে, অমরত্বের আশায়, অলৌকিক সুখ, অপ্রকাশিত কম্পন।

শুধু প্রকাশিত প্রেম। অমৃতের ঝর্নায় অবগাহন। অজানা শুদ্ধতায় ভেসে যাওয়া।

এরপর বহুবার। বহুবার আমি আর জহির অমৃতের নদীতে গোসল করেছি। অজানা শুদ্ধতায় ভেসে গেছি। অঙ্গবিহীন মিলনের সুখ অঙ্গপূর্ণ মিলনের সুখের কাছে তুচ্ছ ছিল। যে সুখের সন্ধান রাশেদ কোনও দিন পায়নি, হামিদ কোনও দিন পায়নি, বেচারা চেয়ারম্যান কোনও দিন পায়নি। রাশেদের থেকে মুক্তি পেতে চাওয়া নুরিয়া নাহার ফন্টি টিভিতে কথা বলে, ইউটিউবে ওর ইন্টারভিউ আছে। সে নম্রভাবে কথা বলে। লেখাতেও সে অনেক নম্র শব্দ ব্যবহার করেছে। তবে কথা বলার সময় ও এত অশুদ্ধ উচ্চারণ করে না, যত অশুদ্ধ বানান সে লিখেছে। ও এখন এক জন বড় নায়িকা।

আমি হলুদ কালি দিয়ে ছাপ দেয়া অংশটুকুর দিকে আর এক বার তাকাই। না, আর পড়ব না। এটুকুও আর পড়ব না। অন্য কোনও অংশও না। মেয়েটা দলিল সাইজের পাতাটা ভরে লিখেছে। আমার মাথায় ওয়াজিফার চিন্তা ঢুকে পড়ে। ছোট্টখাট্ট ওয়াজিফা। ও কি তবে অতিমানবী? নাকি রাশেদ কোনও চিকিৎসা নিয়ে ভাল হয়ে গেছে? ওয়াজিফার বংশে ডাক্তার, উকিল আর জেনারেলের অভাব নাই। যদি রাশেদ ভাল হয়ে যায়, ভাল। কিন্তু ওর আচরণ শুধু যে নিষ্ঠুর তা নয়। অসংলগ্ন এবং অস্বাভাবিক দু'টোই। এক সময় রাশেদের হয়তো টাকার দরকার ছিল। কিন্তু এখন কেন রাশেদের এত টাকা দরকার তার হিসাব আমি মিলাতে পারছি না। আমি রাশেদকে বাড়িঘর, টাকাকড়ি সব কিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত। তবু কেন ও আমাকে মামলায় ফেলল? আর কীভাবেই বা ফেলল। আমার আব্বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। আর আমি? মামলা-মকদ্দমার কিছুই জানি না। রক্তের সম্পর্ক কি রাশেদের মনে একটা ছোট টানও দিল না? আমি কোনও কিছুর হিসাব মিলাতে পারছি না।

আমি ফাইলটা খোলা অবস্থায়ই মতিউরের দিকে ঠেলে দিই। মতিউর মাথা নিচু করে ওটা তুলে নেন আর পাশের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখেন। কিছু সময় মাথা নিচু করে রাখার পর মতিউর মাথা তোলেন। তার সাথে আমার চোখাচোখি হয়। মতিউরের গালে রক্ত চলে আসে। বেচারা রাতে শেভ করা ছিল না। এখন তার ধোয়া আর পরিচ্ছন্ন মুখের পরিবর্তন সহজে ধরা যাচ্ছে। তার চিবুকের উপর হলুদ প্রভা। যা তেলের মতো দেখায়, কিন্তু তেল নয়। সে যে অপ্রতিভ, তা-ও বলা যাবে না। আমার গালের কী পরিবর্তন হয়েছে কে জানে? মতিউর অবশ্য তা দেখছে। রাতে সে আমাকে কিছু সময় হলেও কামনার চোখে দেখেছে। এখন তার চোখে দায়িত্ব আর সমবেদনা ছাড়া কিছু দেখছি না। সমবেদনা মানুষের বড় গুণগুলির একটি। এর মানে হল অন্যের অনুভূতি নিজের মধ্যে অনুভব করা। এর জন্য বিশেষ একটা ক্ষমতা লাগে। যা সপ্রতিভ সচেতনতা থেকে আসে। আমার গালের উপর আমার অনুভূতির প্রকাশে আমি মতিউরের সামনে বিব্রত নই, এটা আমার জন্য একটা আরামের ব্যাপার। রাশেদের ব্যাপারটাতে বারবার ধাক্কা খাচ্ছি। আমার রক্তে উদ্বর্তন হরমোনের মিশ্রণ ঘটছে, তা টের পাচ্ছি। পেটের উপর ঘামও টের পাই। আমি মতিউরের দিকে চাই।

ওর কালো আর ঘুমাতে চাওয়া চোখ দুটি মনোরম। প্রবির মিত্রের চোখের মতো। আমি দেখি আর দেখি। মতিউরের চোখ থেকে আমার ভেতর একটা শীতল আরাম ঢুকে যাচ্ছে। যা আমাকে উদ্বর্তন অবস্থা থেকে সৃজনশীল অবস্থায় ফিরতে সাহায্য করছে। আমি নিঃশ্বাস নিই আর পাঁজরগুলি ছেড়ে দিই। নারীদের পাঁজরের পিঞ্জর এত সুন্দর হয় কেন? বুকের ভারের জন্য বোধ হয়। আমার দেহ শিথিল হয় আর আমি

পেশিতে আরাম অনুভব করি। এত বড় বিপদে এমন আরাম। আমি নিজেকে বুঝতে পারছি কি? এখন মতিউরের উপর আমার আরাম নির্ভরশীল। পরাধীনতার আরাম। তবু ভাল লাগছে। তবে এখন আমার সৃজনশীল থাকাটাই মুখ্য বিষয়। আমি নিজেকে সে সত্য ভুলতে দিই না। যে আরাম আমার ভেতর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে না, আমি জানি সে আরামের উপর নির্ভর করা যায় না। যখন মতিউর সামনে থাকবে না, আমি সপ্রতিভ সচেতনতা দিয়ে নিজের মধ্যে আনন্দ তৈরি করব। আমার এ সক্ষমতা আমার এখন একমাত্র শক্তি। আমি আর মতিউর একে অন্যের দিকে চেয়েই আছি। ঘরটা এখন খালি। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নাই।

“কী বুঝলেন?” মতিউর বলে।

“আপনি কি বুঝলেন?”

মতিউরের চোখের পাতা নড়ে।

“বলবেন না?” আমি বলি। “আপনার কথারইতো দাম বেশি।”

“আমার বয়স কম,” মতিউর বলে। “এখনও আপনার মতো এত জানার সুযোগ পাইনি। অভিজ্ঞতা কম। এমন চলচ্ছক্তি রহিত করা কোনও কেস সরাসরি কখনও ডিল করিনি।”

মতিউরের কান দুটি বেশ খাড়া। ওর মধ্যে ঐকান্তিকতা আছে। যা আমার ভাল লাগে। এমন পুরুষ ভাল সহচর হয়। বহু বছর ধরে আমার কাজকারবার তাদের সাথে যাদের এক বা একাধিক ডক্টরেট ডিগ্রি আছে। তাদের কারও মধ্যে মতিউরের ঐকান্তিকতা দেখিনি। তাদের দেহে ডিগ্রির একটা চাদর জড়ানো। তাদের কণ্ঠনালীতে ডিগ্রির একটা অনুঘটক বসানো। তাদের ভাল কথাগুলিকেও এই অনুঘটকটি বিষাক্ত করে দেয়, আর তাদের কথায় আমরা বিরক্ত হই।

“না, না।”

“আসলে।”

“সব ঠিক আছে, তবে।”

“আরেন্না আরেন্না।”

“উঁ”

“কে বলেছে?”

“এটা আমি করেছি। ওইটাও আমি করেছি। আরে সেইটাওতো আমি করেছি, এর আগে কেউ হাত দেয়নি ওটাতে।”

টেলিফোন ধরে তারা বলে, আমি ডক্টর আক্কাস, আমি ডক্টর মোখলেছ, আমি ডক্টর দিলরুবা, আমি ডক্টর দিলিপ, আমি ডক্টর অনন্ত, আমি ডক্টর সখিনা, আমি ডক্টর তানিয়া, আমি ডক্টর সালাউদ্দিন সালু, আমি ডক্টর নাজিমুল্লা কালু। আমি ডক্টর কর্নেল অব. গলি মোহাম্মদ। আমি ডক্টর খালেদ, পিএইচডি। আমি ইঞ্জিনিয়ার অমুক। আমি প্রকৌশলী তমুক। আমি কবি, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক শল্য শাচ্ছু। আমি ব্যারিস্টার তানহা। আমি ব্যারিস্টার সানা। আমি ডাক্তার আজিমুল্লাহ ওরফে ডাক্তার রানা। হ্যাল্লো। হ্যাল্লো।

আর আমি ডক্টর শিশিরকণা খান, ফ্রাংকফুর্ট। এ ভাবে আমরা আমাদের পরিচয় দিয়ে মানুষকে বিরক্ত করি। আমি অবশ্য তা অনেক দিন ধরে করি না।

মতিউরের মতো জহিরের মধ্যেও একটা ঐকান্তিকতা ছিল। অবশ্য জহিরের সাথে কারও তুলনা বোধ হয় না করাই ভাল। জহির আমাকে মানুষ ভাবতে অক্ষম ছিল। জহির আমাকে বলেছিল আমি ওর মধ্যে যে প্রেম তৈরি করতাম, তা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। জগতের অদ্বিতীয়া, শ্রেষ্ঠা নারী। তবে জহির আমাকে কখনও দেবী বলত না। ও বলত ওটা ক্লিশে। আমি নারী। জগতের অদ্বিতীয় নারী। জহির বিভিন্ন পৌরাণিক দেবিদের পাগলামির কথা বলত। দেবী আফ্রোদিতে আর মানব অ্যানসাইসিজের মধ্যে যে প্রেম, তা ছিল জহিরের কাছে হাস্যকর। আমার কাছে তা ছিল আরও বেশি হাস্যকর। আমি জহিরের যুক্তির কাছে পরাজিত, আর তাতে আমার লাভ ছিল, কোনও কামোন্মাদিনী পৌরাণিক দেবী হওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। তবে আমাদের প্রেম এত সহজে আসলে ব্যাখ্যাও করা যাবে না। জহিরকে হারানো আমার জন্য চূড়ান্ত ক্ষতি, আর তা অপূরণীয়। পরবর্তীতে খারাপ কিছু হত কি না, তা অবশ্য জানারও সুযোগ পেলাম না। মতিউর আমাকে অনেক কিছু ভাবাচ্ছে। আমার ভেতরের সচেতনতা দিয়ে আমি নিজেকে নতুন করে চিনে নিচ্ছি। প্রেম কী? ভালবাসা কী? সম্পর্ক কী? দাম্পত্য কী? কামনা কী? নিষ্কামতা কী? ফ্রয়েড সত্য নাকি কার্ল গুস্তাভ জং? বাদশা সোলায়মান না সন্ন্যাসী গৌতম বৌদ্ধ? সদা উত্থিত জিউস না সদা শান্ত হেইমডাল? আমি আমার বাহু দুটি অনুভব করি। নারীর বাহু। যা চিরকাল বীরদের আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষায় বিভোর। সচেতনতা দিয়ে আমি নিজেকে সংযত করি। নিজেকে জানিয়ে দিই এক সেকেন্ড আগের শিশির এখন নাই। এক সেকেন্ড পরে সে হবে অন্য শিশির। জীবনের প্রতিটা সেকেন্ড নতুন। প্রতিটা বিগত সেকেন্ড আর কখনও ফিরে আসবে না। বর্তমানে বাঁচা। না হলে জীবনকে অবহেলা করা হয়। অমূল্য এই জীবন। আহা।

“কী ভাবছেন?” মতিউর বলে।

“কিছু না।”

মতিউর চোখ নামিয়ে নেয়। আমি বুঝি, কেন। আমার দিকে যাতে তাকে চাইতে না হয়। আমি একটু বিভ্রান্তও হই। আমার রক্তে একটা ঢেউও ওঠে। উদ্বর্তন হরমোন তৈরির লক্ষণ। আমি তা অনুভব করি।

“আপনার মতো এক জন মানুষের সাথে দেখা হল। এটা আমার লাভ,” মতিউর বলে। “আপনি যে এখনও স্বাভাবিক আছেন, এটা দেখতে পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়।”

“তা হলেতো আপনার লাভই হল।”

“জি, অবশ্যই। আপনার ভাই বা আম্মা আমার কাছে অবশ্যই বিস্ময়কর মানুষ। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হলেন আপনি নিজে। গত রাত থেকে আমি একটা কথা ভেবে চলেছি?”

“কী?”

“ভাবছিলাম আপনি কী দিয়ে তৈরী।”

“আগাগোড়া ইস্পাত,” আমি বলি।

মতিউর হেসে ওঠে। ওর দাঁতগুলি বড় বড় আর মাড়ির গঠনও খুব সুন্দর।

“বিশ্বাস হয় না?” আমি বলি।

“ইস্পাততো বটেই। তবে আগাগোড়া নন। হাতকড়া পরানোর সময় আমি আপনার হাত ধরে দেখেছি।”

“ইস্পাত খুঁজে পাননি?”

“না।”

“তা হলে কী? শাকসবজি দিয়ে গড়া টাটকা ত্বক?”

“ঠিক তা-ই।”

“তা হলে আমার হাড্ডিগুলি ইস্পাত।”

“আমার হাতের সাথে আপনার কব্জি লেগেছিল। আপনার হাড় আমাদের আর দশ জনের হাড়ের চেয়ে পৃথক কিছু না।”

“তা হলে আর কি?”

“আপনি ইস্পাতের চেয়েও শক্তিশালী কিছু দিয়ে তৈরি,” মতিউর বলেন। “একটা অদৃশ্য শক্তি। আমি ভাবতাম আমার মা সবচেয়ে শক্ত মহিলা। কিন্তু না। শক্ত হলেন আপনি। আমি আসলে আপনার এই শক্তির কথাটাই বার বার ভেবে চলেছি। কাল রাত থেকে।”

আমি মতিউরের দিকে চেয়ে থাকি। আমার মধ্যে চটুলতা আর কাজ করবে বলে মনে হয় না। আর একটু অস্বস্তিও লাগে। মনের কোমলতা সামলানোর জন্য আমি একটা নিঃশ্বাস চাপা দিই। মতিউর হিরের টুকরা মানুষ। আমি মনে মনেও বলতে পারছি না, জাদু আমার। আমি তোমাকে একটু ভাপ দিলে, একটু ভিজিয়ে দিলে, তোমার এই শক্তির সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা চিরতরের জন্য থেমে যাবে। না এমন কথা মতিউরকে বলা যায় না। তবে আমি জানি এমন সময় কী করতে হয়। জ্ঞানপ্রাপ্ত সিসিফাস কী করত? কামনার আগুন নেভাত? বাসনার রাশ টেনে ধরত? সিসিফাস ভাবত পাথর ঠেলার ঘামে দেহে যে আনন্দ তৈরি হয়, সেটাই একমাত্র তার নিজের স্বাধীন আনন্দ। এত কিছু জেনেও মতিউরকে আমি বাতিল করতে পারি না। তবে আমি সচেতনতা ধরে রাখতে চাই।

“কোনও শক্তি নাই,” আমি বলি। “আমাদের প্রতিটা অবস্থা আমাদের জন্য নতুন নতুন শক্তি তৈরি করে।”

“সবার মধ্যে নতুন নতুন অবস্থা নতুন নতুন শক্তি তৈরি করে কি?”

আমার মাথা নড়ে।

“আপনার শক্তির কাছে আপনার ভাই পরাজিত হয়েছেন। তাই তিনি ওভাবে কাঁদলেন। মোজাম্মেলের কান্নাও উনাকে প্রভাবিত করতে পারে।”

“ও কী ভাল হয়ে গেছে?”

“না, আমি তা মনে করি না। আপনার উপস্থিতি তার জন্য কষ্টকর। এখন উনি যাদের সাথে আছেন, তাদের প্রভাবে উনি ওনার আগের অবস্থায় চলে গেছেন।”

“আপনি কি নিশ্চিত?”

“আমি তা-ই বিশ্বাস করি।”

“আমি ওর জন্য কিছু করতে পারলাম না,” আমি বলি। “ওর ব্যাপারটাতো এর আগে কখনও জানতেও পারিনি। আজকে আপনি যা জানালেন।”

“তা ঠিক। যদি আপনার মতো কেউ তার স্ত্রী হতেন, তা হলে হয়তো তিনি ভাল হয়ে যেতেন।”

মতিউর মাথা নিচু করেন। কথাটা বলে উনি লজ্জা পেয়েছেন। আমিও আমার কপালে উত্তাপ অনুভব করছি। মন দিয়ে আমি আমার সুন্দর নাভি অনুভব করার চেষ্টা করে উত্তাপ কমাই। আর বলি, “আপনি বিব্রত হচ্ছেন কেন? কোনও ছেলে কি বলে না আমি আমার মায়ের মতো একটা মেয়ে বা আমার বোনের মতো একটা মেয়ে চাই? কোনও মেয়ে কি বলে না আমি আমার বাবার মতো বা আমি আমার ভাইয়ের মতো একটা ছেলে চাই? প্রকাশ্যে না বললেও মনে মনেতো বলে নিশ্চয়ই।”

মতিউর মাথা তোলেন। অনুরক্ত গালজোড়া একটুখানি প্রসারিত করে মৃদু হাস্য করেন। তার চোখে কোমল বিষণ্নতা। তিনি বলেন, “আমার মনে হয় ফাইলে আমরা যা দেখলাম তার সাথে আপনার ভাইয়ের আপনার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের একটা সম্পর্ক আছে।”

কথাটা শুনে আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। “আমিও তা-ই মনে করি।”

“আপনার আব্বা আম্মা কী সুখী ছিলেন?” মতিউর বলেন।

“তারা খুব সুখী ছিল।”

মতিউর আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চান। আমিও নিজেকে অবিশ্বাস করতে থাকি। আসলেই কি আমি সব জানি? অবশ্য এই বিষয় নিয়ে কচলাতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমরা কিছুক্ষণ চুপ থাকি। তারপর আমি বলি, “কী ভাবছেন?”

“আমি কিছু মেলাতে পারছি না। বার বার শুধু মাথার মধ্যে আপনিই ঘুরছেন। আর সে জন্য আপনার ভাইও। আপনার আম্মাও আমার চিন্তায় ফিরে ফিরে আসছেন।”

“আমি আপনার হাতে বন্দী,” আমি বলি।

“সে কথাও আমি ভাবছি,” মতিউর বলেন। “আমি আমার চাকরির হাতে বন্দী।”

“আপনার গলায় এত হতাশা কেন?”

“আপনাকে আর কখনও দেখব কি না, জানি না। আপনার কথা কখনও মাথা থেকে নামাতে পারব না। আমি একটা সাধারণ ভীরু ছেলে।”

“আপনার মধ্যে অভিভূত হওয়ার ক্ষমতা আছে,” আমি বলি। “কাজেই আপনি বারবার অভিভূত হবেন। আপনার জীবন অনেক সুন্দর হবে। এটাতো আপনার জন্য খুবই ভাল। আর আমারও এ কথা ভাবতে ভাল লাগছে।”

“সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এত দিন আমার জীবন সুন্দরই ছিল,” মতিউর বলে। “আজকে থেকে তা থাকবে কি না, কে জানে। চাইলেই আমরা অন্যায্য ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি না। এমন ঘটনা যা আমাদের মন ভেঙ্গে দেয়। অথচ আমাদের শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়।”

"দেখুন," আমি বলি। "আমার বা আপনার বিপদে আমাদের পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। পৃথিবী, মানে যেখান থেকে আমরা এসেছি, সেই প্রকৃতির কিছু আসে যায় না। আমরা মানুষ প্রাণি আর বৃক্ষ খেয়ে বেঁচে থাকি। এক প্রাণি অন্য প্রাণি বা বৃক্ষ খেয়ে বেঁচে থাকে। প্রাণ থেকে প্রাণ পুষ্টি গ্রহণ করে। প্রাণভক্ষণপ্রথা যেখানে জীবনপ্রবাহের ভিত্তি, সেখানে ন্যায়ের আশা সর্বজনীন নয়। যুদ্ধের মাঠে সৈনিক যখন হত্যা করে তখন সে ভাবে পাপের দায় সেনাপতির। সেনাপতি ভাবে পাপের দায় রাষ্ট্রপতির। রাষ্ট্রপতি কোনও পাপই বোধ করে না, কারণ খুন সে নিজ হাতে করে না, আর খুন তার সামনেও ঘটে না, ঘটে বহু দূরে, যুদ্ধের ময়দানে। মানুষের সচেতনতা এখনও কত নিচের পর্যায়ে আছে, অপরাধবোধের এই বন্টন তার প্রমাণ। অপরাধের এই বন্টন অপরাধের বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। অপরাধরোধে এর কোনও ভূমিকা নাই। মানুষ ভাল হচ্ছে বিবর্তনের গতিতে। যে দিন সে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে, সে দিন সে দেখবে, সূর্য নিভে যাচ্ছে। সে দিন সে দেখবে, আজ পৃথিবীতে মানুষেরই দিন শেষ।"

ইন্সপেক্টর মতিউর আমার দিকে চায়। তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল আর তর্জনী কোলাকুলি করে।

"এই ব্যাখাতো দেয়া হয়েছে!"

আমি জানি সে কী বলতে চান। একটা অত্যন্ত অন্যায় সমাধান দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, সেই সমাধান আমি গ্রহণ করব না। সে নিজেও বোধ হয় আর তা গ্রহণ করতে পারবে না।

"ব্যাখ্যাটা কি আপনার কাছে ন্যায়সঙ্গত মনে হয়?" আমি বলি।

ইন্সপেক্টর মতিউর কথা বলে না।

"আপনার কাছে ন্যায়সঙ্গত মনে হলেও কোনও সমস্যা নাই," আমি বলি। "সবার কাছেই তা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়?"

"কেন তেমনটা হয়?"

"কারণ তেমন করে শেখানো হয়।"

ইন্সপেক্টর মতিউরের মাথা উপর-নীচ হয়। তা দেখে আমার ভাল লাগে।

"তা হলেতো আপনি আপনার বর্তমান অবস্থা মানতে পারছেন।"

"যা আমি পরিবর্তন করতে পারি না, তা আমি মেনে নিই। সিসিফাসের শিক্ষা।"

"মনে হচ্ছে এ শিক্ষার আমাদের সবার দরকার আছে," মতিউর বলে।

"জি।"

"কিন্তু?" মতিউর বলে।

"কী?"

"কিছু না।" মতিউর মাথা নিচু করে।

আমি মতিউরকে দেখি। দেখি এক জন প্রেমিক হিসাবে। আমার কোনও সমস্যা নাই এই অফিসারের সেবা করতে। কিন্তু পৃথিবী এটাকে মেনে নেবে না। শিশিরকণা পৃথিবীর আগে আগে চলে।

"দেখা যাক," আমি বলি।

মতিউর মাথা তোলে না। ও যে বিব্রত, লজ্জিত, আমি তা বুঝি। কিন্তু কাউকে সুখী করতে দোষ কী? আমার ডাক্তার আফরোজের কথা মনে আসে। কত প্রতিকূল পরিবেশে তাকে খুশি করেছিলাম। এক বিকাল সে জন্য মা আমাকে মেরেছে। তবে এখন এখানে সে রকম কিছু সম্ভব নয়। আমি বন্দী। মতিউর চাকরি করে। রোমাঞ্চের একটা ঢেউই কখনও কখনও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার জন্য যথেষ্ট।

তেত্রিশ

"বাংলাদেশে এখনও কোনও নারীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়নি," ইন্সপেক্টর মতিউর বলেন।

ব্যাপারটা আমিও জানি। আমাদের রাষ্ট্র যে এখনও কোনও নারীকে ফাঁসিতে ঝুলায়নি বিষয়টা ভাবতে আমার ভাল লাগে। খুনি হলেও আমি চাই আমাদের রাষ্ট্র সে পর্যায়ে উন্নতি করুক যেখানে রাষ্ট্র মৃত্যুদণ্ড রহিত করতে পারে। মানুষ সচেতনতার সাথে বর্তমানে বাঁচলে পৃথিবীতে কোনও অপরাধ হওয়ার কথা নয়। মানুষ তা করবে, তেমন সম্ভাবনা এখনও তৈরি হয়নি। অনেকে চাইলেও সচেতন হতে পারবে না। তাদের মস্তিষ্ক অহংকারের চাদরে ঘেরা। বংশের অহংকার, জাতের অহংকার, বিশ্বাসের অহংকার, রক্তের অহংকার, অর্থের অহংকার, লিঙ্গের অহংকার, অজ্ঞতার অহংকার, এবং সবচেয়ে ভয়ানক যেটা, রাষ্ট্রীয় সীমানার অহংকার। সত্যি যদি জেলখানায় যাই, প্রচুর অবসর পাব। তখন মৃত্যুভয় নিয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসব। যে মানুষের মৃত্যুভয় নাই সে মানুষের কাছে মৃত্যু হল মুক্তি। প্রাণের আর একটা অধ্যায় মাত্র। তবে এ সব তত্ত্ব এখনও গ্রহণযোগ্য করে কেউ পরিবেশন করতে পারেনি। পারলে ভাল হত। পরকালের ভয় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মৃত্যুকে মুক্তির দুয়ার মনে হবে না। মৃত্যুভয় জয় করতে পারলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার বিষয়টা মধুর একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিটা নতুন দিনে একটু বেশি সুখী হওয়া যায়, কারণ মৃত্যু আরও এক দিন এগিয়ে এল। মৃত্যু নিয়ে এক সময় আমার একটা কল্পনা ছিল। পৃথিবীতে একশ পঞ্চাশ বছর বাঁচার পর আমি কোনও এক দিন সূর্যাস্তের পর মৃত্যু গ্রহণ করব। তার আগে নিজে গোসল করব। গায়ে সুগন্ধি মাখব। নিজের হাতে রান্না করে খাব। একটা লাল বিছানায় শোব। প্রিয় কোনও পুরুষের সাথে প্রেমের শেষ মিলন করব। সেই পরিণত বয়সে দুই পা মেলে ধরতে কেমন বেগ পেতে হবে, তা-ও ভেবেছি। তারপর শয্যা পরিবর্তন। এবার ধবধবে সাদা বিছানা। আমার চারিদিকে থাকবে পাঁচ-প্রজন্মের শ'খানেক উত্তরাধিকার। ওরা আমার জন্য সুন্দর একটা নাচ গানের আসর করবে। তারপর আমি হাত তুলে সবাইকে বিদায় জানাব। নিজেকে মা মেরি মনে হবে, আর মনে হবে আমি নতুন বাড়ি যাচ্ছি। আমার ওই দিবাস্বপ্নকে আমি অপরিপক্ক কল্পনা বলে মনে করি না। তারপরও এখন জেল আর ফাঁসির আশঙ্কার সামনে বসে আমার মৃত্যু-চিন্তাকে নতুন পরিস্থিতিরি সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে। জন্মতে আমার কোনও হাত ছিল না। মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ অজুহাত খাটে না। যে কোনও পরিস্থিতিতেই আমার মৃত্যুকে আমার নিজের মতো পরিচালিত করতে পারা উচিত। ফাঁসি হলে তা করার জন্য যথেষ্ট সময় পাব কি না কে জানে। দেখি মতিউর কী বলে।

"আপনি যা বলছেন, তা-ই হবে, সেটা কি ঠিক?"

"অনেকটাই," মতিউর বলে।

"জেল, ফাঁসি?"

"ট্রেনিং শেষ করে আমি চার বছর ধরে চাকরিতে আছি," মতিউর বলে। "পরিবারের প্রয়োজনে আমার একটা চাকরির দরকার ছিল। এটা হয়ে গেল। আমি চাকরিতে ঢুকে গেলাম। চার বছর ধরে আমি

মানুষের অপরাধপ্রবণতা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাই। যা দেখলাম তা আমাকে বিষণ্ন করে। মানুষের ভাল হওয়ার বোধ হয় একটা সীমা আছে। কিন্তু অপরাধী হওয়ার কোনও সীমা নাই।"

আমি মাথা নাড়ি। আমি মতিউরের সাথে এক মত নই।

"ব্যাপারটা আমাকে বিচলিত করে," মতিউর বলে।

"আপনার বিচলিত হওয়ার কারণ কী?" আমি বলি।

"মানুষের ভাল হওয়াটা আল্লাহ কঠিন করে দিয়েছেন কারণ তিনি মানুষের পরীক্ষা নিতে চান। এত কঠিন পরীক্ষা সে পাশ করতে পারে না। সেটাই আমার বিচলিত হওয়ার কারণ।"

আমি মতিউরের দ্বন্দ্বটা বুঝে ফেলি। তবে তাকে থামাই না। আমি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনি। মতিউরের আরও সময় লাগবে সত্য বুঝতে। হয়তো আমার মতো অত বেশি সময় লাগবে না। তবে কিছু সময়তো লাগবে। মতিউরের কথা শেষ হলে আমি আমার চোখের উষ্ণতা ঢেলে তার দিকে তাকাই। আমি বলি, সে প্রচলিত ধারণা নিয়ে আছে। জন্মের পর থেকে আমাদের যা কিছু শেখানো হয় তার প্রায় সব কিছুই মিথ্যা, একমাত্র যোগবিয়োগগুনভাগ বা দেশ ও রাজধানীর নাম ছাড়া। আমাদের শিক্ষার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে কুযুক্তি যা আমাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধবিশ্বাসের ফল। ফলে আমরা সত্যের ভেতরের সত্য জানতে পারি না। মতিউর মাথা নেড়ে আমার সাথে একমত হওয়ার চেষ্টা করে। আমি অনুনয় করে বলি:

"মেনে নিলাম আপনি সঠিক। তা হলে বোঝার চেষ্টা করুন। মানুষের অপরাধপ্রবণতা ভাল মানুষ হওয়ার প্রবণতা থেকে কেন অধিকতর শক্তিশালি?"

"আপনি বোঝেন?" মতিউর বলে।

"জি।"

মতিউরের মুখ উজ্জ্বল হয়। সে জানতে আগ্রহী। জহির যেমন ছিল। যুক্তি ও জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী পুরুষ আমার পছন্দের পুরুষ। কিন্তু আমার কথা বলা হয় না। পেছনে কেউ এসেছে। পায়ের নরম আওয়াজ। আমার মনে জোছনার পরশ লাগে। মুহূর্তের মধ্যে। এ কি সত্য হতে পারে? আমি নিজেকে প্রশ্ন করি। কিন্তু এই আওয়াজ আমার চেনা। তা অস্বীকার করি কী করে? আরও দুটি আওয়াজ পেলাম। এখনও কি অবিশ্বাস করব?

তা হলে পাগল আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর যদি তা হয়ে থাকে আমি এখন ঝামেলামুক্ত। পাগল আর আমি বাসায় যাব। কেউ কাউকে খুন করেনি। কেউ মারা যায়নি। কেউ আত্মহত্যা করেনি। বরং মতিউরের সাথে পরিচিতি হলাম। দেখা যাক কী করা যায়। আবার নারী হয়ে উঠতে পারি কি না। আমি তা পারব। এক হাজার বছর বাঁচলেও আমি নারীই থাকতে চাই। যদি আরও এক হাজার বার জন্ম গ্রহণ করি, এক বারের তরেও আমি নারী ছাড়া আর কিছু হতে চাই না। ইহকাল ও পরকালে নারী ছাড়া অন্য কারও জীবন যাপন করতে চাই না। যেখানেই থাকি না কেন। নারী হয়ে আমি তৃপ্ত। এর জন্য আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ প্রকৃতির কাছে। কৃতজ্ঞ যে বা যারা আমাকে নারী রূপে সৃষ্টি করেছে তাদের কাছে। তারাতো আমাকে পুরুষও বানাতে পারতেন। হামিদের মতো, বা চেয়ারম্যান সাহেবের মতো, বা রাশেদের মতো, রাজা বা রাষ্ট্রপতিদের মতো, আর আমি একটা পুতায় বোধবুদ্ধিমস্তিষ্ক ধারণ করে পুতার প্রয়োজনে যুদ্ধ বাধাতাম, যুদ্ধ প্রত্যাহার করতাম, ধর্ম প্রবর্তন করতাম, ধর্ম প্রত্যাহার করতাম, জনমের পর জনম এক পুতার খেদমত

ছাড়া আর কিছুতে মনোযোগ দিতে পারতাম না, এক পুতার আহারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য লক্ষ পুতার আহারের মজুত গড়ে তুলতাম। এমন করুণ জীবন আমি কখনও চাইতে পারি না।

আমার মনের উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ছে কেন? হালকা বুক ভারী হচ্ছে কেন? মাথায় একটা টুপি পরলে যেটুকু চাপ লাগবে করোটির ভেতর ততটুকু চাপ অনুভব করি। আমি তার ফিরে আসাতে বোধ হয় আনন্দ পাচ্ছি না। চলে গেছে তা-ই তো ভাল ছিল। কোথা থেকে আবার চলে এল? দ্রুত আমার ওজন বেড়ে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে আমার ওজন ছয় মন। এমনটা কেন হল? কত দিন পরে হল? পাগলের থেকে মুক্তি পেয়ে আসলে আমি শান্তি পাচ্ছিলাম, আর তা এই মাত্র টের পেলাম, যখন পাগল আমার পেছনে এসে দাঁড়াল। আর বুঝিয়ে দিল তার ভারে আমি কতা ভারাক্রান্ত। নিজের অনুভব নিয়ে আমি গর্ব করতে পারছি না। আবার পাগলের আগমনকেও মেনে নিতে পারছি না।

"মা?"

ইন্সপেক্টর মতিউর ডাকে। আমি বুঝি না অফিসার কেন পাগলকে মা ডাকছে। ভালবেসে? কিংবা সেই করুণায়, যা মনে জাগে রাস্তার উপর চলা অন্ধ বৃদ্ধার প্রতি। মা আপনি কোথায় যাবেন? চলেন, পৌঁছে দিই। না, থাক্ বাবা। নিজের ছেলেই যখন খোঁজ নেয় না, অন্যের ছেলের সাহায্য নিয়ে আর কী হবে? তুমি যাও, বাবা। আমি একাই যাব।

আমি পেছন ফিরে দেখি। একটা মহিলা। হালকা নীল রঙের শাড়ি পরা। প্রায় আমার সমান লম্বা হবে। বয়স পঞ্চাশের উপর হবে।

আমার মনে হয় বেঁচে গেছি। পাগল ফেরেনি। তার মৃত্যু হয়েছে। সে আর ফিরবে না।

আবার বুকে কষ্ট উৎপন্ন হয়। মন জানতে চায় পাগলের ছেড়ে যাওয়া দেহখানা এখন কেমন আছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে তা অনেক ফুলে গেছে। হাসপাতালে যদি নিয়ে যায় তবে ওরা নিশ্চয়ই ফরমালিনে ডুবিয়ে পচন বন্ধ করেছে। নাকি অবহেলায় ফেলে রেখেছে। কী ছিল না তার? যে দিন হামিদকে মারলাম তার আগের দিন পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও পুরুষ তার নাক বা চোখ বা ঠোঁট কম বা বেশি কামনা না করে তার সামনে দিয়ে চলে যেতে পারত না। আমি হামিদকে খুন করলাম। তাকে ওসিডি গ্রাস করল। ওসিডি ধরার আগে পাগল ছিল এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী নারী। আর এখন। তার দেহের কোষগুলি থেকে পানি আলাদা হয়ে যাচ্ছে। মৃতদেহের কোনও মর্যাদা নাই। কৃত্রিমভাবে তাকে কিছু মর্যাদা দেয়া হয়। কবর দেয়া বা পোড়ানোর আগ পর্যন্ত। মৃতদেহ মৃতই। উলঙ্গ করে দেখালেই বোঝা যায় এটা মৃত এবং মর্যাদাহীন। আমরা তা বুঝেও বুঝি না। কাপড়ে ঢেকে, গয়না পরিয়ে, রং মেখে আমরা মৃতদেহের মর্যাদা দিই।

তার জন্য দুঃখ করব না এই পণ করে পুলিশের সাথে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছি। মাঝে মাঝে তার স্খলন হচ্ছে। কী জানি? স্বাধীন হয়ে গেলে আমিও হয়তো রাশেদের মতো হয়ে যাব। আজকে পঞ্চাশ বার ঘোড়ায় চড়ব। কালকে একশ বার।

আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

চৌত্রিশ

ওসি মতিউরের মা। হাতে তিনটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার দিকে তাঁর বিমূঢ় কটাক্ষপাত। আমার যা দশা তাতে অপ্রস্তুত হওয়ার কিছু নাই। তাঁকে দেখে আমি একটা সচেতন এবং

আরামদায়ক শ্বাস গ্রহণ করি। আর তাতে একটা মোলায়েম সুগন্ধ আর বাতাস আর শক্তির বিশুদ্ধরূপ আমার রক্তে প্রবেশ করে। মহিলা আমাকে আকৃষ্ট করেন। আমার চোখ, নাক, মুখের ক্ষুধা অন্য যে কোনও মেয়ের চেয়ে বেশি। আর এখন আমার মধ্যে এসব ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে। আমি তাঁর চোখ দেখি। পুত্রের মতো তাঁর চোখ। আমি তাঁর রং দেখি। পুত্রের মতো তাঁর রং। যে রং আমার ভাল লাগে। আগে কখনও লেগেছে বলে মনে হয় না। এখন লাগছে। বরং আরও বেশি কিছু মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এ রং মানুষের গায়ে খুব মানায়। আমার শ্যামলা রঙের নারী হতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে মতিউরকে হাত বের করে দেখাই, দেখুন, আমাদের রঙে রঙে কত মিল। আমার হাতের পিঠে এ রং নাই। তবে আমার মধ্যে কোথাওতো এর কাছাকাছি একটা রং আছে। ফুলের গঠন। গাঢ় রং। ছড়িয়ে পড়ুক সে রং আমার সারা দেহে। আমি কামনা করি বটে, তবে তাতো আর হবার নয়। আমি মাতা-পুত্রের মিলন দেখি। দেখি ওসিডিবিহীন ভালবাসা। ওরা কত সৌভাগ্যবান।

“রেখে যাও,” মতিউর বলে।

মহিলা বাটিগুলির কলাম টেবিলের উপর রাখেন। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, কখন তিনি বাসায় ফিরবেন। ছেলে উত্তর দেয়, সে বলতে পারছে না, তবে টেলিফোন করে জানাবে। মহিলা নীরবে চলে যান।

বাটি থেকে গরম তরকারির সুবাস আসে। বাটির মুখ বন্ধ থাকতেই আমি সব টের পাই। নতুন চালের ভাত। ডালের ভাপ। নতুন সবজির আলোড়ন। ধনেপাতার সুগন্ধ। আমার চোখের সামনে সবুজ সবজির বাগান ফুটে ওঠে। ফুল কপি, বাঁধা কপি, সিমের লতা, লাউয়ের লতা, মাচার নিচে ঝুলে থাক ছিছিঙ্গা। বেগুন পাতার ছাই রং। বেগুনের রঙের বাহার। বেগুনের পিঠ। মসৃণ। আহা আরও কত ভাল হতো তা যদি বাইন মাছের পিঠের মতো তৈলাক্ত হত। তাজা বাইন মাছের ঝাঁক। চালুনের উপর টগবগে বাইনের পাক খাওয়া। মনে পড়ে আমি দেড় দিন কিছু খাইনি।

“পানি খাব,” আমি বলি।

মতিউর তার সামনে রাখা ভরপুর গেলাসটা আমার দিকে এগিয়ে দেয়। পরিষ্কার পানি আমাকে বুভুক্ষু করে। আমি পানি পান করি। দেহের মধ্যে বাতাস আর পানি। বিশুদ্ধতম উপাদান। সাথে আর কী পান করি, কে জানে। অপূর্ব তৃপ্তি। বুঝতে পারি আমার দেহে এতক্ষণ কোনও শক্তি ছিল না। আমি ডানে বামে ঘাড় ঘুরিয়ে তা টের পাই।

ইন্সপেক্টর মতিউরের অফিস। এক সময় সরকারি অফিসগুলোর টেবিলচেয়ারের দৈন্য দশা দেখে মায়া লাগত। ঘুস খেয়ে অফিসারগুলোর অনেকে ধনী হত, অনেকে হত না, কিন্তু তাদের অফিসগুলোর দরিদ্রভাব কাটত না। পুলিশের নিচের দিকের অফিসাররা এক সময় নিজের চেয়ার নিজে কিনত। সরকারি টাকার বরাদ্দের মধ্যে চেয়ার কেনার টাকা থাকত না। এখন এদের অফিসের অবস্থা বদলে গেছে। মতিউরকে দেখে মনে হয় না ও পকেটের পয়সায় চেয়ার কিনে অফিসে রাখে। ওর চেয়ারটা কালো। পরিপাটি চামড়ার চেয়ার।

“আমি কি এই যুদ্ধে নামব, না নামব না?” মতিউর বলে।

“কী বললেন?”

“না, কিছু না।”

“আপনি কি খাবারগুলি আমার সাথে শেয়ার করবেন?” আমি বলি।

“এখানে দু’জনের খাবার আছে,” মতিউর বলে। “আপনি যখন ওয়াশরুমে গেলেন তখন আমি মাকে ফোন করে বলেছিলাম দু’জনের খাবার আনতে। আপনিতো আমাদের নাস্তা খাননি।”

আমি একটু লজ্জিত হই। আবার খুশিও হই। কত দিন এমন শাকসবজি খাই না। পাগল জীবাণুর ভয়ে শাকসবজি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল অনেক দিন। আমরা দিনের পর দিন সিদ্ধ পাস্তা খেয়েছি। আমার সবজি খাবার লোভ হয়।

“চলেন, খাই,” আমি বলি।

মতিউর সুইস টেপে। একটা বেল বাজে। এক জন অল্প-বয়সী সিপাহী আসে। তার হাতে দু’টি প্লেট। প্লেটগুলি থেকে পানি ঝরে। সিপাহী একটা টিস্যু নিয়ে একটা প্লেটের তলা মোছে তারপর শুকনো প্লেটটা আমার সামনে রাখে। অন্যটা রাখে মতিউরের সামনে। মতিউরের পেছনে একটা আলমারি। সিপাহি ওটা থেকে কয়েকটা চামচ বের করে। মতিউর বাটিগুলির ঢাকনা খোলে। একটা বাটিতে গরম ভাত। আর একটা বাটিতে সিম আলু আর মাছের তরকারি। আর একটা বাটিতে ডাল। আর একটা বাটিতে ফিরনি। আমার হাত নড়ে না। মতিউর আমাকে ভাত তরকারি আর ডাল বেড়ে দেয়। আমার হাত ধোয়াই ছিল। আমি খেতে শুরু করি।

খাবারের নৈকট্যের আনন্দে মনে একটু দুশ্চিন্তা ভর করে। মনে হচ্ছে আমার ফাঁসি হবে। এই দুর্গতি কি আমি নিজে নিজেই ডেকে এনেছি? মার ওসিডি ছিল। আমারও ওসিডি আছে। আইনতো আর ওসিডি বুঝবে না। আইন অবশ্য পাগলকে ফাঁসি দেয় না। কিন্তু ওসিডিতো পাগলামি না। আমার মনে হয় না কোনও পাগল খুন করে। পাগলদের রোগ বোধ হয় সারে না। খুন করে যারা তারা সবাই নিরাময়যোগ্য মানসিক রোগে আক্রান্ত। তাদেরকে দাগী অপরাধী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা হয় না।

মাথার মধ্যে যে চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তা অনুসরণ করি। চিন্তাটা যেন নড়ন চড়ন বন্ধ করে দেয়। আরও তীক্ষ্ণ নজরে চিন্তাটাকে অনুসরণ করি। চিন্তাটা ধোঁয়া হয়। উবে যায়। চিন্তা দিয়ে কিছু হবে না। দেহ দিয়ে হবে। আমি বলি, শিশিরকণা, প্রস্তুত হয়ে যাও।

আমি প্রস্তুত। মতিউরের সাথেই আমার শেষ লৌকিকতা। এর পর একা থাকব। তবে ভয় পাচ্ছি না। সিসিফাসকে অনুকরণ করতে চেয়েছিলাম। একটা বড় পরীক্ষা ছাড়া কী করে বুঝব আমি তাকে ঠিকঠাক অনুকরণ করতে পারছি? কাজেই সামনের দিনগুলিতে সেই পরীক্ষা হলেই ভাল। না হলে আমিও আমার অগ্রগতি ধরতে পারব না। অগ্রগতি জানতে এখন আমাকে মনোযোগ দিয়ে মতিউরের জন্য ওর মার রান্না করা এই সুস্বাদু আহারটা সারতে হবে। আমি নরম একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আহারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি। বিসমিল্লাহ্‌।

আমি ভাত আর মাছের স্বাদ অনুভব করি। একটুখানি মাছ মুখে নিয়ে চুষে ঝোলের স্বাদ নিই। আহা! আসলেই উপাদেয়। জীবনে কত বার আহার করেছি। কিন্তু কখনও মুখের মধ্যে মাছের ঝোলের স্বাদ এমন করে গ্রহণ করিনি। আমি আর এক টুকরা মাছ নিয়ে তা আস্বাদন করি। আমাকে ফিরনিও দেয়া হয়েছে একটা বাটিতে। আমি ফিরনির বাটিটা টেনে নিই। ওটাতে একটা চায়ের চামচ। পুরনো চামচ। রং তাই কিছুটা ধূসর। তবে অনেক পরিষ্কার। আমার মা পরিষ্কার কোনটা বুঝতে পারত না। ওসিডি থাকলে পরিচ্ছন্নতা বোঝা যায় না। আমার ওসিডি সীমার মধ্যে। তাই আমি পরিষ্কার আর অপরিষ্কার এ দু’টির তফাত বুঝি। আমি বাম হাত দিয়ে এক চামচ ফিরনি মুখের মধ্যে তুলে নিই। পরম যত্নে জিব দিয়ে চামচটা থেকে সম্পূর্ণ ফিরনি টেনে নিই। যখন চামচটা আমার মুখ থেকে বের হয় তখন ওটাকে আরও বেশি পরিষ্কার মনে হয়। আমি এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হই না কী কারণে আমি ভাত শেষ না করেই এক চামচ ফিরনি খেতে

চাইলাম। আমি খেতে চাইলাম কারণ আমি জানি আমার পরবর্তী নিঃশ্বাস আমার হাতে নাই। ওটা আল্লাহর হাতে। তাই আমি পরীক্ষাটা করি। নারীর কমনীয় জিভের প্রতিটা কোষ দিয়ে আমি ফিরনির স্বাদ গ্রহণ করি। আমি চোখ বন্ধ করি না। কারণ আমার চোখ বন্ধ করার দরকার পড়ে না। আমি চোখ খোলা রেখেই আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ আমার রসনায় কেন্দ্রীভূত করতে পারি। আমি চালের স্বাদ, চিনির স্বাদ, নারকেলের স্বাদ পাই। আমি আর একটু চেষ্টা করি আর দেখি আমার জিভের শুধু স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা আছে ত নয়, সুগন্ধ গ্রহণেরও ক্ষমতা আছে। আমি এলাচ আর জাফরানের সুগন্ধ গ্রহণ করি। এত বড় হয়ে গেলাম কখনও জিভটাকেই পুরোপুরি ব্যবহার করলাম না। আমার পরীক্ষার এটাই উপসংহার। জিভের, নাকের, ত্বকের, চোখের, কানের যথাযথ ব্যবহার করা হয়নি। হয়তো করেছি। তবে অসচেতনভাবে। জহিরের দিনগুলিতে। জহিরের কথা এখন ভাবতে চাচ্ছি না। কারণ এখন জহির নাই। আমি বরং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ ব্যবহারের কথা ভাবি। তা না করলে আমি সিসিফাস হব কী ভাবে? এক চামচ ফিরনিই শুধু খেলাম না। আমার এই পরীক্ষায় আমি বুঝলাম স্বাধীনতার সীমা অসীম। কিন্তু তা আমার নিজের মধ্যেই খুঁজতে হবে।

ক্ষুধা নিবারণের তৃপ্তি আমার ভেতরের জমিন অধিকার করে নেয়।

ইন্সপেক্টর মতিউরের মুখ ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটিও শুকনা। বেচারা কিছুই খায়নি। আমার দিকে চেয়ে আছে। চেয়ারম্যান স্যার এভাবে তাকালে আমার মনে হত আমি তাঁর সামনে বিবস্ত্র হয়ে বসে আছি। মতিউরের দৃষ্টি মোলায়েম হয়ে আমার ত্বকে লাগে। আমিও তার দিকে তাকাই। তাকে বুঝতে দিই আমার ভাল লাগছে। আমার বুকে শিথিলতার আরাম। উষ্ণতার আরাম। ফিরনির স্বাদ আমার মাথা হালকা করে দিয়ে গেছে। মতিউরের নরম চোখের চাহনি আমার সুখানুভূতি আর এক দফা বৃদ্ধি করে। আমার হৃৎপিণ্ডটা কানায় কানায় ভরে যায়। এমন অনুভূতি জগতের অন্য কোনও সুখ দিয়ে আমি বিনিময় করব না।

"আপনি খাচ্ছেন না," আমি বলি।

"জি?"

মতিউরের রাতের গলার আওয়াজ। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমি বলি, "আপনি খাচ্ছেন না কেন?"

"খেতে খেতে আমি ভাবতে পারি না।"

"কেউই পারে না। আপনি খান," আমি বলি।

"আমি না ভেবে পারছি না।"

"কী ভাবছেন?"

"অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু। আমার কাছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

ইন্সপেক্টর মতিউরের দ্বিধা আমার কৌতূহল বাড়ায়। "আপনাকে বলতেই হবে, এবং এখনই," আমি বলি।

"ভাবছি আপনি কী করে এমন স্বাভাবিক আছেন?" মতিউর বলে।

আমি অন্য কিছু মনে করেছিলাম। রাশেদের কথা বা ওই রকম কিছু। ইন্সপেক্টর আমার কথা ভাবছে, আমার তাতে ভাল লাগে। আমি মতিউরের দিকে তাকাই। আমার মাথা মৃদু দোলন করে। জানি না আমার মুখে সে কোন অভিব্যক্তি দেখল।

আমি স্বাভাবিক ছিলাম না, আমি মনে মনে বলি। ফিরনির স্বাদ আমাকে স্বাভাবিক করেছে। মতিউর, তোমার ভাগ্যে যদি লেখা থাকে আমি তোমার বুকে শুয়ে তোমাকে বর্তমানে বাস করার উপর একটা ছবক দেব, তা হলে আমি তোমাকে সে ছবক দেব। আমি নিজে না শিখতে পারলেও তা তোমাকে শেখাব। তবে মানুষ নিজে যা অনুশীলন করতে পারে না, তা সে অন্যকে শেখাতে পারে না। কথাটা সব সময় ঠিক নয় যদিও। সে তা শেখাতে পারে, যদি সে কারও বুকের উপর শুয়ে শুয়ে তা শেখায়। যেহেতু বেশি মানুষের বুকের উপর শোয়ার কোনও সামাজিক ব্যবস্থা নাই, তাই এ রকম অবস্থায় আমরা কেবল অল্প মানুষকে কিছু শেখাতে পারি, আমরা নিজেরা তা অনুশীলন করতে না পারলেও। মতিউর, তোমার ভাগ্যে যদি তা লেখা না থাকে, তাতেও আমার কোনও আফসোস থাকবে না। বা থাকলেও তা স্থায়ী হবে না। আজ থেকে আমি তোমার বুকে শুই কিংবা জেলখানার মেঝেতে শুই, আমি একই অনুভব পাব। পৃথিবীর সব কিছুই এখন আমার প্রেমিক।

"আপনার কি সমস্যা হচ্ছে?" আমি বলি।

মতিউর হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে। "আপনি বুঝতে পারছেন?"

"জি, স্যার," আমি উত্তর করি।

"আর কিছু মনে করছেন না?"

"জি না, স্যার।"

"এমন এক সময় আমি কিছু কল্পনাও করতে পারছি না।"

"আপনার মতো ছেলের কিছু কল্পনা করার দরকার নাই, জনাব। মা-বোনের ভালবাসা পেয়েছেন। এখন না হয় একটা খুনির ভালোবাসা পেলেন। পরে আরও অনেকের কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পাবেন। রাতের বেলা কোনও মেয়ে বিপদে পড়লে তাকে জেরা করতে থাকবেন। ঠিক পেয়ে যাবেন।"

"আমি এমন অবস্থায় কখনও পড়িনি," মতিউর বলে। "আপনাকে কিছুক্ষণ দেখার পর আমার ভেতর পরিবর্তন চলে আসে। যা আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। ফলে যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমি ডিউটিতে ফিলাম। এখনও আছি। আমি খুব বিব্রত।"

"বিব্রত হওয়ার কিছু নাই," আমি বলি। "বলুন আপনি আমার জন্য ছাদ থেকে লাফ দিবেন। আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে আনবেন। সাগরের বুক থেকে মুক্তা তুলে আনবেন। আমি চাইলে আপনি আজীবন একটা বুড়ো আঙ্গুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকবেন। এ সব বলেন। কিছুটা আনন্দ করি।"

মতিউরের মুখমণ্ডল মৃদু হাসিতে আলোকিত হয়। হাসলে তার প্রনিধানযোগ্য চোখ দুটি ছোট হয়ে আসে আর তাকে নিষ্পাপ মনে। তার মুখটা সেই ছেলের মতো হয়, যে হ্যান্ডেল চালিয়েছে শুধু, তবে এখনও কোনও মেয়ের বুকে হাত দেয়নি। তার মুখ দেখে আমার বুক উষ্ণ হয়। কোমরের যেখানে যত খিল ছিল সব খুলে যায়। বসতে খুব আরাম পাচ্ছি। কোমরের নমনীয়তা নিয়ে প্রেমে অংশগ্রহণ। এটা যে কোনও মেয়ের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। চেয়ারম্যান স্যারের সামনে গেলে তানিয়ার কোমর নিশ্চয়ই কাঠের পাটাতনের মতো শক্ত হয়ে যায়। উল্টোটাও হতে পারে। আমি আমাকে দিয়েতো আর তানিয়াকে বিচার করতে পারি না। মতিউর এক জায়গায় বসে আসে। তার মনোযোগ কোনও কিছুতে নিবদ্ধ। এত সুস্থির হয়ে কোনও মানুষ ভাবনায় ডুবতে পারে তা মতিউরকে না দেখলে আমি বুঝতাম না। মতিউর তাই আমার পরীক্ষারও বিষয়। যেহেতু সুস্থিতি অর্জনের জন্য আমি নিজে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

“কী ভাবছেন?” আমি বলি।

“আপনার কথা,” মতিউর বলে।

আমার একটা নিঃশ্বাস পড়ে যাচ্ছিল। তা কোনও মতে আটকালাম। কিন্তু মতিউর তার নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারল না।

“আপনি আমার চিবুকের কাছে ধরা খেয়েছেন,” আমি বলি।

“তা বলতে পারেন।”

“আমি কী বলতে পারি না?”

“আমি কখনও কোনও মেয়ের সাথে এসব কথা আলোচনা করিনি। কখনও সুযোগই পাইনি। পড়াশোনা করে সময় কাটিয়েছি। বাসায় লাইব্রেরি বানিয়েছি। প্রেম করার কথা না ভাবলেও সম্পর্ক কীভাবে রচনা করতে হয়, কীভাবে তা টেকসই করতে হয়, এগুলো আমি জানতে চেষ্টা করেছি।”

“বাহ্।”

“আমি শুধু ততটুকু অবাক হচ্ছি যা আপনার মতো একজনকে দেখে অবাক হতে হয়। ব্যাপারটা আপনিই কল্পনা করে নিন। আমি সিসিফাসের গল্প জানি।”

আমার চোখ দু'টি মতিউরের মুখমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে।

“কোথায় পেয়েছেন?”

“প্রথমে ঝালমুড়ির ঠোঙ্গায়, তারপর খবরের কাগজে। তারপর অডিসি-তে।”

“আলবেয়ার কামুর নাম শুনেছেন?”

“জি, শুনেছি। তাঁর লেখা সব বইয়ের নাম জানি। তিনি দি মিথ অফ সিসিফাস লিখেছেন। কিন্তু ইংরেজি ভাল করে জানি না বলে পড়তে পারি না।”

এ রকম সহজ করে মানুষ কথা বলে না। মতিউরকে আমার আরও বেশি ভাল লাগে। এ রকম অনুসন্ধিৎসু একটা ছেলের সাথে ঘর করতে পারলে জীবন কখনও নীরস হবে না। আমরা নারী পুরুষ সবাই সম্পূর্ণের অর্ধেক, আর এটা আমাদের বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। কত মানুষ সারা জীবন সন্ধান করেও আর অর্ধেক খুঁজে পায় না। নিশান গাড়িতে টয়োটার পার্টস লাগায়। গাড়ি চলে না। “আপনার এখানে আমাকে কতক্ষণ রাখতে পারবেন?” আমি মতিউরকে জিজ্ঞেস করি।

“কালকে সকাল পর্যন্ত। এর মধ্যে আমাকে রিপোর্ট লিখতে হবে।”

“অনেক সময়,” আমি বলি। “ততক্ষণ।”

“জি?”

“তা হলেতো অনেক সময়। এর পর ধরে নিয়েন আমার ফাঁসি হয়ে গেছে। তবে কাগজ করে বিয়ে করতে যাবেন না। তা হলে পরে আবার করতে গেলে ঝামেলায় পড়বে।”

“আপনি এ সব কথা এত অকপটে বলেন কী করে?”

“আপনিওতো অকপটে অনেক কিছু বলছেন, বলছেন না?”

মতিউর কথা বলে না।

পঁয়ত্রিশ

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে আমার বাড়ি। সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী দুই পারের এই কানাকানি। তাই শুনে যে উদাস হিয়া চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি। কবি বা নবি না হলে সাহসী হওয়া যায় না। নবি হলে নিশ্চিত পেদানি খাব। তাই আমি কবি হয়েছি। আর সে জন্য বুঝি আমি আনন্দ ও নিরাপদ বোধ করছি।

বিচারালয়ের পথে আমার জীবনের নতুন বাঁক। আমি ধীরে ধীরে মায়া দিয়ে ইন্সপেক্টর মতিউরের স্মৃতি মন থেকে সরিয়ে দিচ্ছি। ওর সাথে আমার আর দেখা হবে না। আর যদি দেখা হয়েও যায়, সে হবে এক নতুন মতিউর, আমি হব এক নতুন শিশিরকণা। গ্রিক প্রবাদ: এক নদীতে কেউ দ্বিতীয় বার গোসল করতে পারে না। নদীতে নতুন স্রোত। শিশিরকণাতে নতুন দেহ।

আমাকে বহন করা পুলিশের এই গাড়িটা পুরনো। মতিউর গতকাল একটা ভাল গাড়ির ব্যবস্থা করেছিল। আজকে সে কি তা করতে পারত? নাকি সেও হাত ঝেড়ে ফেলেছে। সেটা হলে আরও ভাল। ও ছোট মানুষ। ওর উপর কোনও কিছুর আছর পড়া ওর জন্য ভাল হত না। তা ছাড়া নতুন গাড়ি থেকে মুক্তিওতো একটা মুক্তি। আরও প্রয়োজন অতীত আর ভবিষ্যৎ থেকে মুক্তি। টেন্টালুসের মুক্তি: ফল আর পানির দিকে তাকিয়ে থাকা। দুটোই এত কাছে তবু টেন্টালুস তাদের নাগাল পায় না। কিংবা লুসিফারের মুক্তি: আগুনে। সজ্ঞানতার মধ্যে। যখন আগুন কারও অনন্ত বাসস্থান, তখন আগুন হয় বাগিচা, মধুর শয্যা, মুক্ত আকাশ। অপরিমেয় ভয় আর ত্রাস: মূর্খ প্রয়োগ করে সার্থক হয় যতক্ষণ শিকার মূর্খ থাকে। যতক্ষণ দুই মূর্খের কেউ জানে না অপরিমেয় ভয় আর ত্রাস কোনও ভয়ই তৈরি করে না, যেমন আল্ট্রাসাউন্ড কোনও সাউন্ড করে না। বুদ্ধিমান বিচারক শাস্তি প্রয়োগ করে উপযুক্ত মাত্রায়। শাস্তি সহনীয় মাত্রার বেশি হলে মস্তিষ্ক তার সাথে বোঝাপড়া করে নেয়। আর এ জন্যই প্রকৃতি মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেছে; অপরিমেয় শাস্তি ও পুরস্কারের বিচারক মানুষের মস্তিষ্কের এই অভিজোযন শক্তির সাথে পরিচিত নয়। আধ্যাত্মিক মস্তিষ্ক অপরিহার্য সন্ত্রাসের সাথে মর্যাদাপূর্ণ সহবাস করে। বর্তমানে মুক্তি লাভ করে। বর্তমান হল ওসিডিমুক্ত।

আমার বর্তমানে এই লক্করঝক্কর বাহন। রেক্সিনের সিট ফেটে মবিল রংয়ের ফোম বের হয়ে আছে। গাড়ির মধ্যে জানালা নাই, শক্ত তারের জাল আছে। জালের তারে ধূলা নাই বলেই মনে হচ্ছে। বাইরে থেকে গাড়িটা সবুজ মনে হয়েছিল। ভেতরের দেয়ালগুলি ধূসর। আবার সিটগুলি সবুজ রং করা। সিট হল দুইটা টুল। দুই দেয়াল ঘেষে পাতা, লোহার পায়ের উপর। আমার দুই পাশে দুই হ্যান্ডেল। লোহার হ্যান্ডেলের সবুজ রং ক্ষয় হয়ে তার উপর কালো মরিচার দাগ পড়েছে। যেন কতগুলি কেঁচো হাতলটাকে বেড় দিয়ে রেখেছে। ভেতরের বাতাস পরিষ্কার। গন্ধ একটা পাচ্ছি বটে। প্রথম মনে হয়েছিল কোনও বন্দী বা কয়েদী সিট ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। এখন দেখি, না। ব্যাপারটা গাড়ির ভেতরের নয়। বাইরের।

গাড়িটা থেমে আছে আর দরজাটা খোলা। নারী কয়েদী। অবলা। লাফ দিয়ে পালাবে না। কিংবা দরজার দুই পাশে যে দুই জন পুলিশ বসে আছে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের গুলি করে মারবে না। চুম্মন কসাই সিনেমায় এমন একটা দৃশ্য ছিল। রাশেদ অবশ্য পুলিশদের বন্দুক দিড়ে বাড়ি দিয়ে অচেতন করে পালিয়েছিল। গুলি করেনি মনে হয় এই জন্য যে কাউকে মারলে সিনেমার নিয়ম হল তার ফাঁসি হতে হবে। চুম্মন কসাইতে অনেক মারামারি আছে, কিন্তু নায়ক চুম্মন কসাই মানে আমার ভাই রাশেদ, যে তখন এক জন

কিশোর, অবশ্য তাকে বিভিন্ন কায়দায় ত্রিশ বছরের যুবক বানানো হয়েছিল, কাউকে খুন করেনি। তাই তারা ছবিটা শেষ করতে পেরেছিল চুম্মন কসাইয়ের মূল পেশাতে ফিরে এসে গোস্তের ঠোঙায় চুম্মনের দৃশ্য দেখানোর মাধ্যমে।

খোলা দরজা দিয়ে আমি অদূরের আবর্জনার স্তূপ দেখি। আমাদের গাড়ি আর ডাস্টবিনের মাঝখানের জায়গাটায় একটা ঢিবি তৈরি হয়েছে। সেখানে সাদা ঘাসও আছে। ওই দ্বীপে কয়েক জন দাঁড়িয়ে ছাড়ছে। বোঝা যায় এরা ঘুম থেকে উঠে এখানে চলে এসেছে হালকা হওয়ার জন্য। তারপর তা চা খাবে। গরম গরম চা না খেলে এক নম্বর চাপে না। এক নম্বর কোথায় সারবে কে জানে? আমাদের পাশ দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে। তার পাশে বস্তির ঘরগুলির সবুজ আর ধূসর রঙের শেওলা পড়া পাতলা ইটের দেয়াল আর পোড়া লাল-মরিচের রঙের মরিচার আবরণযুক্ত টিনের ছাদ। একটা ছোট বাড়ির দেয়াল সাদা, ছাদের টিন চকচকে। দেয়ালে একটা বাহারি কাঠের ফ্রেমে লেখা: মাননীয় কমিশনার মহোদয়ের একান্ত সচিবের সহকারী একান্ত সচিবের কার্যালয়।

ঘরটার সাদা রং দেখে আমার চোখ জুড়ায়। একান্ত সচিবের সহকারী একান্ত সচিব কেন বস্তিতে অফিস খোলে তা আমি জানি। জনপ্রতি পঞ্চাশ টাকা। বাসা-প্রতি দু'শ। মেয়ে থাকলে মাফ। তবে এক ঘন্টার জন্য বাধ্যতামূলক হাজিরা। বড় ভাইরা যার যার ক্ষমতা সাপেক্ষে মেয়েগুলিকে পায় ওদের চেহারা, গায়ের রং, বুকের মাপ ইত্যাদি অনুযায়ী। একান্ত সচিবের সহকারী একান্ত সচিবের কার্যালয়ে। হাজিরা দিয়ে এসে বেশির ভাগ মেয়ে কাটা ছাগলের মতো ছটফট করে। কিছু মেয়ে অবশ্য বেঘোরেও ঘুমায়, যারা করিম চাচার দ্বিতীয় স্ত্রীর জাত। তারা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাবে, আহা জীবন কত আনন্দের। ওদেরকে কেউ বলেনি যে সিসিফাস সুখে আছে, টেন্টালুস সুখে আছে, লুসিফার সুখে আছে। ওরা এমনি এমনি বুঝে যায়, জীবন সুন্দর। ওদের কাছে সুবাস আর কুবাস নাই। প্রতিটা গন্ধই শুধু আর একটা গন্ধ। প্রতি ঘটনা আর একটা অনুভব। আর একটা অভিজ্ঞতা। প্রকৃতি সবার ভেতর ক্ষমতা দিয়েছে উদারভাবে আনন্দ গ্রহণের। তবে এই ক্ষমতা খুঁজে পাওয়ার চেয়ে মহাকাশ যানে চড়ে চাঁদে যাওয়া সহজতর। আবার কিছু মানুষ এই ক্ষমতা নিয়েই বেড়ে ওঠে। ওরা জানে না ওরা ক্ষমতাটার অধিকারী। ওরা শুধু তার ফল ভোগ করে: জীবনের যে কোনও অবস্থায় আনন্দ। ওদের কাছে কোনও কিছু অসুন্দর নয়। ওদের কোনও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাগে না। ওরা প্রতিটা মুহূর্তকে, এক এক করে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক দিয়ে উপভোগ করে। প্রতিটা নতুন মুহূর্ত আসে আর ওরা পূর্বের মুহূর্তটা ভুলে যায়। ভবিষ্যতের কোনও মুহূর্তকে ওরা মস্তিষ্কে ঠাঁই দেয় না।

আমি সুখী মেয়েদের কথা ভাবি আর আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সজাগ করি। তাতে আমার সুখ হয়। নিজেকে তুলার মতো নরম আর মোলায়েম মনে হয়। মতিউরের কাছ থেকে এই সাদা শাড়ি নিয়েছি। ওর বাসায় সাদা শাড়ি ছিল না। মৌচাক থেকে লোক পাঠিয়ে কিনিয়ে এনেছে। সূতির শাড়ি। মতিউরের মা নিজে গিয়েছিল ব্লাউজ আর পেটিকোট বানানোর জন্য। ব্লাউজটা ঢিলা কিন্তু আরামদায়ক। এর সব কিছু আমার ত্বকের উপর আরামদায়ক অনুভূত হচ্ছে। আগে বিধবারা সাদা শাড়ি পড়ে হালকা হত। কিছু দিন পর আর হালকা হওয়ার গুরুত্ব থাকে না। তার পর অলঙ্কারের ঝঙ্কার, ফিরে না আসা যৌবনের দূর থেকে আনাগোনা, শাম্মি কাপুর, ও মেরি ছোনারে ছোনারে, এ-সব মগজে তৈরি করে ডোপামিন এবং অঙ্গে তোলে তরঙ্গ আর পনেরো কেজি ওজনের লাল লেহেঙ্গা। আমি ভারকে ভার মনে করি। আর হালকা হওয়াকে গুরুত্ব দিই।

হালকা শাড়ির আরাম নিয়ে আমি নিজেকে দেখি। ঠোঁট দিয়ে কব্জির স্বাদ নিই। নিখাদ আনন্দে বিলীন সতেজ নারী-ত্বক, সুবাসিত। মতিউর গোসলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আর কখনও গোসল করতে পারব কি না, জানি না। গোসল করে দেহ মন দুই-ই হালকা করেছি। আমার সম্পূর্ণ হালকা হয়ে যাওয়া দরকার। যারা আমাকে মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে গিয়েছিল, আমার মা আর মায়া খালা, এক সময় তাদের জন্য

অনেক দোজখবাস কামনা করেছি। এখন আমি তাদেরকে শেষ বারের মতো ক্ষমা করে দিচ্ছি। মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে তারা আমাকে মুক্তিই দিয়েছে। পৃথিবী আমাকে নিয়ে এসে আর পাঁচ জনের মতো ভারী করতে চেয়েছিল। পাজামা চোর জহিরকে দিয়ে, ডবকা পাছার হামিদকে দিয়ে, ওসিডিতে আক্রান্ত জননীকে দিয়ে। একেক জনের বিদায় আমার জীবনে পেছনে ঢোকার পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়, খোলা রাখে শুধু সামনের মুক্ত পথ। সে পথে আমি এখন। যারা আমাকে মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা না বুঝেই আমার একটা উপকার করে দিয়ে গেছে। ব্যথা যে মনে নাই, তা নয়। আহা আমার ছোট্ট খোকন সোনা। কত বার তোমার মুখ কল্পনা করেছি। ভেবেছিলাম একটা নতুন জহির পৃথিবীতে হবে। অথচ যে মুখ কখনও অঙ্কুরিতই হয়নি। আজ তোমাকেও ভালবাসি। অবারিত ভালবাসা। সন্তান আমার। তোমার মুক্তি আলোয় আলোয়। আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায়। তোমার মুক্তি এই আকাশে। আমার মুক্তি ঘাসে ঘাসে। তোমার মুক্তি উর্ধ্বাকাশে। আমার মুক্তি কঠিন কাজে। আমি মা। সন্তান, তোমাকে ভালবেসে আমার শেষ অনুশোচনাটুকু কেটে যাচ্ছে। আমি স্বাধীন হয়ে যাচ্ছি। মানুষ আমার হাতপা অবশ্য বেঁধে রেখেছে। তবু আমি স্বাধীন। আমার নিজের ভেতর।

যখন তারা জহিরকে মেরে ফেলেছিল তখন আমি ছিলাম এক ক্ষিপ্র বাঘিনী। মাকে কামড় দিয়েছি। রাশেদকে কামড় দিয়েছি। মায়া খালাকে কামড় দিয়েছি। শেখর ভাইকে চড় মেরেছি যেমন কাল শেখর ভাই রাশেদকে চড় মেরেছে। আব্বাকে আমার ছেঁড়া জুতা দিয়ে পিটিয়েছি। আব্বার কণ্ঠমণি, দুই গাল, নাক, দুই চোখ, কপাল থুতুর বন্যায় ভাসিয়েছি। তারপর শান্ত হয়ে পিএইচডি করতে জার্মানি চলে গিয়েছি।

মিউনিখ শহরে আমি হাত-পা ছাড়া এক তরুণী। কিন্তু স্বাধীনতা অনুভব করিনি। বরং জহিরের স্মৃতিতে উড়ে যাচ্ছিলাম। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল ওর আত্মা বুকে ধারণ করে চলব। তবে নিজেকে ফাঁকি দিয়ে আত্মা কথাটা তখন যেভাবে ভাবতাম, এখন আর তার স্বরূপ আমি সে ভাবে দেখি না। আত্মা সম্পর্কে এখন আমার অবস্থান পরিষ্কার: আমি যা খুঁজে পাইনি, যা অনুভব করিনি, তা থাকলেই বা আমার কী? না থাকলেই বা কী? নিঃশ্বাস অবশ্য খুঁজে পেয়েছি। তাই নিঃশ্বাস আমার আত্মা। এ ছাড়া দেহ আর মন এই দুয়ের বাইরে আমি এখনও মনুষ্য-প্রাণের অন্য কোনও অংশ খুঁজে পাইনি। দেহ ছাড়া আর কিছুতো সুখ বা দুঃখ কোনও কিছুই অনুভব করতে পারে না। মনের সুখ কথার কথা। মনের সুখ অবশ্য আছে। মন যখন চিন্তাহীন, সে কষ্টের চিন্তা হোক আর মোহের চিন্তা হোক, তখন আমি মনে সুখ পাই। কিন্তু আমি তা অনুভব করি দেহের মধ্যে। মন আসলে কোথায়? হাত দিয়ে বা ইশারা করে কেউ দেখাক তো? পারবে না। দেহ এত বাস্তব যে এর প্রতিটি পশম গোনা যায়। আমি আমার দেহে মনোযোগ দিই। আমার কাছে সুখ মানে আমার দেহের প্রতিটি কোষ বর্তমানে জাগ্রত, সজীব, আর মন তাদের সাথে সংযুক্ত। আর দুঃখ মানে ভয়, ঘৃণা, আশঙ্কা, উদ্বেগ, এ সব দিয়ে আমার দেহের প্রতিটি কোষ নিষ্পেষিত, সঙ্কুচিত।

মিউনিখ সিটি লাইব্রেরির এক কোনায় এক দিন আচরাফ আর আমি অষ্টম শতাব্দীর ইরাকি রসায়ণবিদ আবু মুসা জাবির ইবন হায়্যানের অমনিবাসের ইংরেজি অনুবাদ জাবিরিয়ান করপাস ঘাঁটাঘাটি করছিলাম। সহসা আচরাফ আমার দুই হাত চেপে ধরে। আচরাফের হাত দু'টি বুঝি সাইবেরিয়ার জলে চুবিয়ে আনা হয়েছে। অবশ্য কালটাও ছিল শীতের, রাস্তায় বরফ ছিল, বরফের ভারে রাস্তায় রাস্তায় গাছের ডাল ভেঙ্গে গেছে, কোথাও কোথাও গাছই ভেঙ্গে গেছে। বাসে চড়ে লাইব্রেরিতে আসার পথে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের সে সব ভেঙ্গে পড়া গাছ আর ডালপালা সরিয়ে নিতে দেখেছি। সবাই এক কোমর বরফে চুবে কাজ করছে। প্রকৃতির শীত রাস্তায় অনুভব করিনি। করলাম লাইব্রেরির উষ্ণ অন্দরে। আচরাফের হাতের চাপে মনে হল আমার বুকের সলতে দুটিতে কেউ বরফ ঘষে দিল। আচরাফ নামটা আমাদের দেশের নাম। শুধু উচ্চারণটা একটু ভিন্ন। তিউনিসিয়ার আচরাফ। আমি ওকে 'না' বলেছিলাম। আচরাফও কিছু মনে করল না। আমার

কাছে ব্যাপারটা ভাল লেগেছিল। তিউনিসিয়ার মুসলামন ছেলে আচরাফ মুষ্কের চাপ হজম করা শিখেছে। যদিও এর পরে আচরাফের সাথে আমার মেলামেশা ঠিক আর জমেনি।

পরের বছর জুলাই মাসে মা এসে আমার সাথে যোগ দেয়। আমরা ইউরোপ ঘুরতে বের হই। ইউরোপ থেকে যাই মিশর, মিশর থেকে ব্রাজিল, চিলি, আর পেরু, সব শেষে যাই আমেরিকা আর কানাডা, যেখানে কোনও পিচ্ছিল পথ নাই, সব পরিষ্কার রাস্তা, বাতাস কৃমিমুক্ত, আর পানি জীবাণুমুক্ত, আর চারিদিকে শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র। ভূমধ্যসাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছলাত ছলাত ঢেউয়ের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে মেখে মেখে আর উলঙ্গ উলঙ্গ মেয়েদের তেনা তেনা আধাচোষা মাইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে আর লম্বা লম্বা বেটাদের লোমহীন মেদহীন পেটের পেশির ভাঁজ দেখে দেখে আর বুড়াবুড়িদের বগলের চিপায় আর পাছার খাঁজে জড়ো হওয়া সোনালী রঙের বালুর লাইন অনুসরণ করে আমার কাছে জহিরের স্মৃতিকে অলীক মনে হয়েছিল। সেই জহির যে ছিল আমার হৃৎপিণ্ডের অলিন্দে, রক্তের শিরায়, অঙ্গরূহের মূলে, বুকের বৃন্তে, আঙ্গুলের আগায়, নিঃশ্বাসের আসা যাওয়ায়। শিশুর মতো জহির। আমার পাজামা চোর জহির আমার গায়ের বাতাসে বেহেশতের সুখ পেত, যা শেষ হতে চাইত না। আর ডবকা পাছার হামিদ, পৃথিবীতে সে সব চাইতে যা বেশি চাইত, সেই রেতপতনেও সে ধপাস ধপাস পতিত হত, আর প্রতি পতনে তার মেজাজ আরও বেশি খিটখিটে হত। জহিরের দেহের প্রতিটা কোষ জাগ্রত ছিল। সে বোধবুদ্ধিবাসনা পুতায় বয়ে বেড়াত না। বাসনার চাপ তার ভেতর কখনও অধৈর্য উৎপাদন করেনি। জহির প্রেমে প্রেমে উড়ে গেছে। পৃথিবীর কোনও কিছু জহিরকে বাঁচাতে পারেনি। না আমার প্রেম। না জহিরের প্রেম।জহির আমার কাছে আসার আগেই মরে গিয়েছিল। হয়তো সে জন্যই আমি এমন একটা জহির পেয়েছিলাম যার দ্বিতীয় পৃথিবীতে আর কখনও হবে না। জহিরের এক অংশ আটলান্টিকে আর এক অংশ প্রশান্ত মহাসাগরে ছেড়ে দিয়েছি। দুটি প্রস্রাবের ধারা দুই মহাসাগর নির্মল করেছে। আর কোনও ঢামালি ছাড়াই আমি মুক্ত হয়েছি।

ছত্রিশ

জীবনে প্রথম পুলিশের সাথে কারবার করি গ্রিসে। এথেন্স শহরের প্লাকা নামক মহল্লায়। মা আর আমার হাত ভরা বাজারের ব্যাগে। মার কাঁধে মার ব্যাগ। মা যেন একটা উষ্ঠা খেল। আমার ঘাড়ের পেছনের ত্রিকোণাকার হাড়ে গরম বাতাসের হলকা লাগে। মা আমাকে পাকড়াও করে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে। তারপর মা আমার এক হাত ধরে দাঁড়ায়। মার চোয়াল দুটি কাঁপে। কেবল তখন আমার খেয়াল হয় মার কাঁধের উপর ব্যাগের বেল্ট দুইটা নাই। আমিও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আর দেখি পাতলা গঠনের এবং কালো শার্ট আর কালো জিন্স পরা একটা কালো ছেলে মার ব্যাগ বুকে ধরে দৌড়াচ্ছে।

এ পর্যন্ত কিন্তু আঁতকে ওঠা যাকে বলে তা আমার ক্ষেত্রে ঘটেনি। আর তা ঘটল এবার। মা বুঝি একটা লাফ দিল। আমার হৃৎপিণ্ড সহসা এক উর্ধ্বমূখী লাফ দেয়। গ্রিক ভাষার বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি? তবুও দুই দিনেই আমি কয়েকটা শব্দ শিখে নিয়েছিলাম: কালিমেরা: সুপ্রভাত; নে, ওচি, পলি কালা: ইয়েস, নো, ভেরি গুড। কিন্তু গ্রিক চিৎকার। তা বোঝার ক্ষমতা মোদের ছিল না। লোহার ডান্ডার মতো শক্ত গলার কর্কশ চিৎকার। দেখলাম আমাদের সামনে দিয়ে দুইটা পুলিশ ছিনতাইকারির পিছু নিয়েছে। এক কণ্ঠের চিৎকার। চারটি বুটের ঢক ঢক শব্দ। আর পুলিশের সে কী দৌড়।

কিছুক্ষণ পর পুলিশ দু'জন ফিরে আসে। ইংরেজ আর আমেরিকানদের মুখের ইংরেজি আমরা না বুঝলেও আমরা দু'জনেই গ্রিক পুলিশের বলা ইংরেজি বুঝতে পারি। পুলিশদ্বয় ফিরেছে খালি হাতে। মনুষ্য ঘামের এত তীব্র গন্ধ আগে কখনও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। তাদের মধ্যে যার চিৎকারে আমাদের

চিতপটাং হওয়ার অবস্থা হয়েছিল তার গলা যে আবার এত নরম হতে পারে, সেটাও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল।

পাশেই থানা ছিল। ওই দুই পুলিশ আমাদের সেখানে নিয়ে যায়।

কাউন্টারের উল্টা দিকে দু'জন মহিলা পুলিশ। আমার আজকের পাহারদারদের মতোই। গ্রিসের মহিলা পুলিশ দুই জন একযোগে আমাদের জন্য কাজ করেছে। মার ব্যাগে তার পাসপোর্ট আর সতেরো কি আঠারোশ ইউরো ছিল। আমাদের কাছে না ছিল ছিনতাই হয়ে যাওয়া পাসাপোর্টের কপি, না আমাদের জানা ছিল পাসপোর্টের নম্বর। শুধু নামধাম উল্লেখ করে অফিসার একটা রিপোর্ট লিখে দেয়। থানা থেকে বের হয়েই আমরা বাংলাদেশ দূতাবাস খুঁজতে বের হই। পাসপোর্ট করার জন্য। যে রাস্তায় আছি সেখানে আমাদের অনেক স্বদেশি ভাই বিভিন্ন জিনিস ফেরি করছে।

আমি কাতর হয়ে এক জনকে বলি, “ভাই, বলেন বাংলাদেশের এম্বাসিটা কোথায়?”

“আফা, রুমে যোগাযোগ করেন। এহানে কোনো ইম্বাসেডর নাই,” এক ভাই আমাদের দিকে না তাকিয়েই বলল।

“বলেন কি ভাই? কোন রুমে?”

“রুমে, রুমে। ওই যে রুমে।”

কোন রুমে কে জানে? আর এক ভাই আঙ্গুল তুলে যে দিক দেখাল সূর্য তার উল্টা দিকে ওঠে। পশ্চিম দিকের কোনও রুম? কোন ঘরে বাংলাদেশের দূতাবাস? কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

“ভাই, আপনি আমার ভাই, আমাদের রুমে নিয়ে যান।”

প্রথম ভাই আমার দিকে চান। একটু আগে তিনি ছিলেন নিস্পৃহ। এখন দেখি তাঁর এক চোখ লুব্ধক আর এক চোখ কালপুরুষের মতো জ্বলছে। “আপা, আপনাদের সব টাকা হারায় গেছে?” ভাই বলে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের চারিদিকে আরও ভাই জড়ো হয়। আমরা রুমে যেতে বদ্ধপরিকর। আমরা দেখি দিশাহীন কয়েক ভাইয়ের অগভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের উত্থানপতন। কয়েক ভাই মুখ মলিন করে পকেটের দিকে চায়। বুঝতে পারি এ আমার কণ্ঠ-ঝরা মধুর প্রভাব। আহা রে। এই বিভ্রান্তির জন্য আমিই দায়ী। বুঝতে পারি মুখ হাঁড়ি হয়ে যাওয়া ভাইগুলির কারও পকেটে আমাদের দুই ঘোটকীকে কোনও রুমে নিয়ে গিয়ে চড়ার মতো টাকা নাই।

“ভাই, আমরাতো রুম চিনি না।” আমি সচেতন হয়ে বলি।

ফোঁশ ফোঁশ করে কয়েকটা বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ে। আর ধীরে ধীরে দুই মিনিটের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

“ভাই, আমাদের একটু রুম পর্যন্ত দিয়ে আসেন,” আমি কাতর হয়ে বলি।

এই বার ভাইয়েরা নড়াচড়া করে। এবার আরও পরিষ্কার হয় আমরা দুই পক্ষ দুই ভিন্ন রুমের কথা বলছি। এক ভাই বলে, “কী যে বলেন, আফা, এহানেই থাকতে পারি না। আবার রুমে যামু।”

এক ভাই এগিয়ে আসে। তার হাতে পসরা: ছাতার গোছা। হলুদ আর মেরুন রঙের ছোট ছোট ছাতা। সাদা আর কালো আর সাদা-কালো ছাতা। চারটা বড় ছাতার হ্যান্ডেল ভাইয়ের বাম কব্জিতে ঝুলছে। বৃষ্টি আসলে ওগুলো পর্যটকরা কিনে নেয়। অনেকে রোদ থেকে বাঁচার জন্যও আমার ভাইয়ের ছাতা কেনে।

"কই যাইবেন, আফা।"

"রুমে।"

"ইম্বাসিডরের কাছে," এক ভাই বলে। "পাসপোট হারাই গেছে।"

"ও আপনারে কেমনে নিয়ে যাবে, আফা। পুলিশের দৌড়ে এখানেই থাকা মুশকিল। ইম্বাসিডরতো রুমে। ইতালিয়াতে।"

এই বার মনে হয় একটু বুঝতে পারলাম।

যা বুঝলাম তা-ই সঠিক। এথেন্স শহরে বাংলাদেশের কোনও দূতাবাস নাই। আমরা তা ধারণা করব কীভাবে? আগের দিন কৌতূহলবশত এথেন্সের বাংলাদেশ বিমানের অফিসে গেলাম। বিমনের ম্যানেজার আমাদের চা খাওয়ালেন। আব্বাকে চিনতে পারলেন। তিনি এথেন্স শহরে ভাল আছেন। আমাদের স্বজাতি ভাইয়েরা, এবং কিছু বোনও, যারা প্রায় সবাই লেবানন থেকে পালিয়ে আসা, মারামারি, বিয়ে, তালাক, পরকিয়া, অপরিশোধিত ঋণ এ-সবের সালিশের জন্য তাঁর কাছে যায়। তিনি যথাসাধ্য ন্যায্য সমাধান দেন। এ সব তাঁর সামাজিক কাজ। তাঁর দাপ্তরিক কাজ বা কাজের অভাব আমাদের বিভ্রান্ত করে ছেড়ে দেয়। যে শহরে বাংলাদেশ বিমানের দূতাবাস আছে, যেই শহরে বাংলাদেশ বিমানের কোনও ফ্লাইট আসে না, আসারও কথা নয়, কারণ তখন আন্তর্জাতিক রুটে চলার মতো মাত্র দুইটা বিমান নিয়ে আমাদের বিমানের বহর, সেই শহরে বাংলাদেশের দূতাবাস থাকবে না, ওটা ভাবার মতো বুদ্ধি আমার বা মার কারও ছিল না।

মা'র পাসপোর্ট করতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আব্বাকে ফোন করলে সব সমস্যার সমাধান এক নিমেষে হবে হয়তো। কিন্তু আমরা আব্বাকে ফোন করতে চাচ্ছিলাম না। দেখা যাক। আমরা মা-মেয়ে বলাবলি করি। আর একটু চেষ্ট করি।

"কী করব, ভাই? আমার মায়ের পাসপোর্ট ছিনতাই হয়ে গেছে।"

ভাইদের সাথে ছিনতাই নিয়ে অনেক কথা হয়। কালো মানুষের শুধু বদনাম আর বদনাম। আমার ভাইদের শুধু সুনাম আর সুনাম।

"কনসুলার অফিসে যান, আফা।"

কোন্ ভাই বলল খেয়াল করিনি। সব ভাই-ই কিছু না কিছু করতে চায় আমাদের জন্য।

"এই অফিসটা কোথায়, ভাই?"

"পেরিয়াতে। ওই যে ওইখানে গিয়ে বাসে উঠেন। তবে পাসপোর্ট পাইতে এক মাস লাগে। আফনি জমা দিবেন। রুম থেকে অফিসার আইসা পাসপোর্ট সই করবে।"

"অফিসার আইছে," এক ভাই বলে, এগিয়ে এসে।

"এক হাজার টাকা অফিসারের হাতে গুঁইজা দিবেন। দশ মিনিটের মধ্যে পাসপোর্ট হাতে আইয়া পরব।"

"দেব ভাই, এক হাজার টাকা দেব।"

"আফা, আপনে কি মনে করছেন এইটা বাংলাদেশের টেহা?" এক নতুন ভাই বলে।

"তো?"

"এহানকার টেহা। এই যে দেহেন এইডা।" আমার এই ভাই একটা পাঁচ ইউরোর নোট আমার চোখের সামনে তুলে ধরে।

আমার মাথা ঝাঁকি খায়। এত টাকা! কী শুনলাম? মনে হল আমিতো সচিবের মেয়ে। দেখা যাক। আমরা হলাম ঘুষ খাওয়া শ্রেণির মানুষ। ঘুষ দেয়ার আগে সচিব সাহেবকে ফোন করতেই হবে।

এথেন্সের উপকণ্ঠ পিরায়াসে বাংলাদেশের অনারারি কনসালের অফিস। এ সব অফিস সম্পর্কে তখন পর্যন্ত আমার কিছু জানা ছিল না। অনারারি কনসাল মানে এক জন বিদেশী যিনি কোনও বেতন পান না কিন্তু তিনি যে দেশের অনারারি কনসাল সে দেশের মানুষের সেবা করেন। অনারারি কনসালের অফিসে গিয়ে জানা গেল আমাদের ভাগ্য সত্যি ভাল। রোম থেকে এক প্রথম সচিব এসেছেন। তবে এক হাজার ইউরোপিয়ান টেহা তাকে আমরা দেব না। আব্বার নাম শুনলে টাকা নাও নিতে পারেন, এই ভরসা আমাদের ছিল। আড্রিয়াটিক সাগরের অন্য পারের দেশ ইতালিতে অবস্থিত দূতাবাস থেকে এ পারে অফিসার এসে পাসপোর্ট সই করে, কারণ অনারারি কনসাল পাসপোর্ট সই করার ক্ষমতা রাখে না। প্রথম সচিব হারুন আল রশিদ। প্রাচীন নাম। ছোট বেলা থেকে এ পর্যন্ত অন্তত পাঁচ জন হারুন পেয়েছিলাম যারা আমাদের ড্রাইভার ছিল, কেউ কয়েক দিনের জন্য, কেউ কয়েক মাস বা বছরের জন্য। এখন এক জন প্রথম সচিব পেলাম। দূতাবাসের পদবী। বোধ হয় সিনিয় সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। হারুন সাহেব মাসে একবার এখানে আসেন। তিন দিন থাকেন। তখন পাসপোর্ট হাতে লেখা হত। তাঁর জন্য সব পাসপোর্ট লিখে প্রস্তুত করে রাখা হত। এথেন্সে এসে তিনি ওগুলোতে সই করেন। আর প্রবাসিরা পাসপোর্ট পায়। আমরা খুব ভাগ্যবান মনে করলাম নিজেদের। আমি অবশ্য অফিসারের সাথে কথা বলিনি। মা তাঁর সাথে কথা বলল। আমাদের ঘন্টাখানেক লাগল নতুন পাসপোর্ট পেতে।

সমস্যা হল বের হয়ে আসার সময়। দুই জন দেশি ভাই আমাদের পথে পিকেটিং শুরু করে। তাদের পেছনে এক বোন, বর্তুলাকার। তার সামনে বেবি-ট্রলিতে একটা বাচ্চা চেঁচাচ্ছে আর হাতপা ছুঁড়ছে। জায়গাটা একটা বড় হল ঘরের মতো। অন্তত পঞ্চাশ জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। "কত টাকা দিয়েছেন, বলেন?" পথ আটকানো এক ভাই, খাড়া নাক ঝুঁকিয়ে, আমাদের প্রশ্ন করে। আমি আর মা একে অপরের দিকে চাই। "আমরা কোনও টাকা দিইনি, শুধু পাসপোর্টের ফিস দিয়েছি," আমি বলি।

"আমরা যে দেখলাম আপনারা কিছুক্ষণ আগে ঢুকলনে। তা হলে এত তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট পেলেন কীভাবে?"

কথাটা বলল আর এক ভাই।

বড় লজ্জায় পড়ে গেলাম। উত্তর দিতে পারছিলাম না।

আমাদের পথ আটকানো দুই ভাইয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন গালাগালি শুরু করে। গালিতেও যে আমরা পৃথিবীর সেরা সে দিন সেটা জানা গেল। বাক্যবাণে আমার ভাইয়েরা প্রথম সচিবের মা বোন বিবির সাথে বুনিয়াদি যৌন মিলন শুরু করে। আমি কল্পনা করি প্রথম সচিবের মা বোন বিবিদের সংখ্যা। পনেরো বিশ জন না হলেতো উত্থিত ভাইয়েরা সবাই এক জন করে পাবে না। এক জন মোবাইল ফোনে কথা বলে।

“আইসা পরো আইসা পরো। ঘেরাও হবে।” আরও কয়েক জন মোবাইল ফোনে লোক জড়ো করার জন্য খবর দিচ্ছে। কী মুশকিল? মার পাসপোর্ট করে আমরা পুরো অফিসটাকে বিপদে ফেললাম। শহরের সব দেশি ভাইদের ডাকা হচ্ছে অনারারি কনস্যুলেট ঘেরাও করার জন্য। উত্তেজনা দেখে আমার গাল গরম হয়। এক জন এক সাংবাদিকের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলে। ঢাকার অমুক পত্রিকার গ্রিস করেসপন্ডেন্ট। শুধু ঘেরাওই হবে না। সাংবাদিকরা আসবে। ঢাকার পত্রিকা আর টিভিতে নিউজ হবে। প্রথম সচিবের পরিবারের নারীদের শ্লিলতাহানি বেড়েই চলেছে। এত ব্যাপকভাবে যে চোখ বন্ধ করে মনে হল আমি আর মা মহামহিম সম্রাট কালিগুলা মহাশয়ের হেরেমে আটকা পড়েছি।

ঘুষখোর অফিসারের চামড়া।

তুলে নিব আমরা।

ঘুষখোর অফিসার।

এই মুহূর্তে আতিনা ছাড়।

ভাইদের ক্ষোভও অস্বীকার করতে পারি না। যারা মিছিল বা রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেনি বা সাময়িক বিরতি নিচ্ছে, তাদের মুখ থেকে তাদের জীবনে দুঃখকষ্টের কথা বের হয়ে আসে। এক রুমে বিশ জনের ঘুমানো, চারতলা, পাঁচতলা চৌকিতে, এক বাথরুমে বিশ জনের গোসল করা, এক টয়লেটের বিশ জনের দেহ খালি করা, যার যার কোনার দিকে ফিরে হাত আর লালা দিয়ে পুতা পেষা, বিশ জোড়া তলা ছেঁড়া জুতার গন্ধের ভার, ফেরি করার সময় পুলিশের তাড়া, পাহাড়পর্বত পাড়ি দিয়ে ইউরোপ আসার পথে ইরানি দালালদের চাবুকের বাড়ি আর তুর্কি দালালদের বুটের লাথি। বাড়ি থেকে আসা মায়ের যক্ষ্মার খবর, বাপের ভগন্দরের খবর, স্ত্রীর পরকিয়ার খবর, কুমারী বোনের গর্ভধারণের খবর, পাণ্ডা ভাইয়ের স্থানীয় মাস্তানদলে যোগদানের খবর, সন্তানের কৃমির খবর, মেম্বার সাহেব কর্তৃক জমির আইল ঠেলার খবর, ছোট ভাই কর্তৃক বিবির পায়খানার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকার খবর। তাদের জীবনের ইত্যাদি কষ্টের ক্ষোভ পৃথিবীকে জানানোর জন্য তারা কনস্যুলেট অফিস ঘেরাও করবে। আমি মনের চোখে দেখি সারি সারি মায়েদের, বিশ বছর ত্রিশ বছর আগে, হবিগঞ্জে, নবিগঞ্জে, হাটহাজারিতে, নোয়াখালিতে, কালকিনিতে, ভূতের কান্দিতে, কুমড়াতলাতে। আমি দেখি জননীগুলির যোনি থেকে মাছের পোনার মতো সারি সারি সন্তানের বের হয়ে আসা। দেখি ঘটনার সাথে জড়িত পুরুষদের। মুষ্কের চাপে অন্ধ পুরুষ। মুষ্কের দোষে যারা পৃথিবীতে আসবে তাদের মুষ্কের কী হবে, এ নিয়ে তাদের কোনও চিন্তা নাই। তারপর ওই শিশুগুলিই আজ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে নিজেরা রাতদিন খেটে নিজেকে পালছে, পালছে বাড়িতে পড়ে থাকা দশ পনেরো জন ভাই বোন, মা বাপ, আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করে পাঁচ-ছয়টা বড় ও ছোট বোনের বেকার, মাদকাসক্ত, বেশ্যালয়মুখী স্বামী। আমি আমার ভাইদের দোষ দিতে পারি না।

সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখে শুধু ঘুষ প্রদানকারীদের পাসপোর্ট দেয়া, তাদের এই অভিযোগ সত্য নয়। কিন্তু বিশ্বাসটা তাদের কষ্ট দেয়। আমি আর মা দুজনেই অপরাধবোধে বিদ্ধ। লাইন ভেঙ্গে পাসপোর্ট পাওয়ার সুবিধা গ্রহণ করার মতো সক্ষমতাকে আমরা উদযাপন করতে অক্ষম। আমাদের ভয় হয় ভাইদের ভারে কনস্যুলেটের মেঝে না ভেঙ্গে পড়ে।

কনস্যুলেট অফিসের গ্রিক নারী সেক্রেটারি পুলিশ ডেকে আনে। পরিস্থিতি নিমেষে শান্ত হয়। ওই চার পাঁচ জন পুলিশের মধ্যেও দুই জন নারী ছিল। তাদের এক জনের দেহটা ঠিক আমার সামনে এখন কয়েদী চলাচলের এই গাড়িতে যে দুই জন বসে আছে তাদের এক জনের মতো। নাদুসনুদুস। তবে গায়ের রং আলাদা। আর ইউনিফর্মের রং? এথেন্সে ছিল নীল। ঢাকায় সবুজ।

সোনিয়ার কথা মনে পড়ে। মেয়েটার জন্য কিছু করতে পারলাম না। আমি সবার জন্যই কিছু করতে চাওয়া মানুষ। তবে এই মেয়েটার জন্য আমি অনেক কিছু করতে চেয়েছিলাম। আমাদের চারিদিকে ছিল এবং থাকবে অসংখ্য সোনিয়া। এক সোনিয়ার জীবন উন্নত হলে সকল সোনিয়ার জীবনে তার প্রভাব পড়ে। এ ধরনের আধ্যাত্মিকতায় আমি বিশ্বাস করি।

আজ আমার পাহারাদার হিসাবে আমার সাথে নারী পুলিশ, না পুরুষ পুলিশ, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সকলের কাছেই আমি নিরাপদ। এটা মুক্তির পথের বোধ। যে পথ মিশে গেছে মহাবিশ্বে, চলে গেছে অসীমে, যে পথের না আছে শেষ, না আছে শুরু। জন্ম, বৃদ্ধি, দুঃখ, সুখ, সংকোচন, জরা, মৃত্যু, এ সব এক-একটা বিন্দু মাত্র, আমার এ চলার পথে। আমি যদি বিচ্ছিন্ন এক শিশিরকণা হই, অত্যাচারির স্পর্শে আমার গায়ে ভয়ের কাঁটা জাগবে। আমি যদি এই মহাবিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হই, আমার উপর হিমালয় ঘুমাবে।

সিসিফাসের মুক্তির শুরু দেবতাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর থেকে। তার আগে সিসিফাসের জীবনে কষ্টদায়ক অনিশ্চয়তা ছিল। তাই রাজা সিসিফাসকে মুক্ত মানুষ বলা চলে না, অথচ পাথরবাহী সিসিফাস নিঃসন্দেহে এক জন মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ। সিসিফাসের শাস্তি আমাদের ঐশ্বরিক চিরশাস্তির ধারনার সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দেয়। সিসিফাসের বোধের উন্মেষ জীবনে হয়নি। পরকালে হয়েছে। আমি শিশিরকণা হয়তো ইহজীবনেই এই বোধ লাভ করব।

ভ্যানের মধ্যে আরও দু'জন আসামী আছে। এক জন ধনুকের মতো বাঁকা। গায়ে পলিমাটি রঙের শার্ট। আর এক জন পরিষ্কার সাদা পাঞ্জাবি পরা। মুখে কালো রঙের দাড়ি। গোঁফের অংশটুকু পরিষ্কার করে কামানো। সুন্নতি দাড়ি এটা। দাড়ির এক একটা চুলের যত্নের দায়িত্বে আছে এক এক জন ফেরেশতা। সুন্নতি দাড়ির মালিক আমার দিকে একবারও তাকায়নি। বিশ্বাসের ভয়ে নিজেকে সংযত রেখেছে। এটা আমার ভাল লাগে। আমার চিন্তা হয় এই মানুষগুলি যাদের দিকে তাকাতে পারে তাদের নিয়ে। শিশুরা। প্রায়ই দেখা যায় এদেরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে থানায় নেয়া হচ্ছে আর পেছনে একটা শিশুর হাত ধরে এক মা কাঁদছে। কোনটা সম্ভব? নদীর পানিকে বাঁধ দিয়ে আটকানো? না পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে বরফকে বাষ্প করে ফেলা? বোধ হয় কোনওটাই না।

সপ্রতিভ আছি। ক্লান্তি নাই। গরম লাগছে। তবে ঘামছি না তেমন। আমি বাসা থেকে কিছু নিয়ে বের হইনি। আমার মনেই হয়নি আমাকে কারাগারে যেতে হবে। মতিউরের মা একটা ব্যাগ দিয়েছে এবং তাতে কিছু কাপড়চোপড় দিয়েছে। কালো রঙের কাপড়ের ব্যাগ। বাসায় আলমারিতে লাখখানেক টাকা ছিল। ব্যাপারটা এ রকম হবে জানলে টাকাটা সাথে নিতাম। জেলখানায় যদিও টাকা সাথে রাখা যায় না। তবে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা রাখা যায়। ভুলে যখন গেছি, তবে ভুলেই থাকি। হাতে কোনও টাকা নাই। এটা যেন আর একটা মুক্তি। এই ব্যাগটা ভ্যানের মধ্যে রেখে গেল কেমন হয়? নিশ্চয়ই আর একটি মুক্তি ঘটবে। দেখা যাক।

আমার দুই সহযাত্রীর কেউ কারও সাথে কথা বলছে না। আমি পেটের গভীরে শ্বাস গ্রহণ করি, কেউ শোনে না, এমন নিভৃতে কাজটা করি, আর পুলক অনুভব করি। আমি মাথার তালু থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে নিচের দিকে যেতে যেতে দুই পায়ের দুই বুড়ো আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত অনুভব করি। দেহের প্রতিটা কোষ যে দিন অনুভব করতে পারব, সে দিন আমার অর্জন পূর্ণতা পাবে। আমার স্বপ্ন সে দিন হাহাকাররত এই পৃথিবীর সব পুরুষকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে বলব, "আপনি আসুন, এবার আপনি। এর পর আপনি। আমি দাতা। আপনার সুখ নিন।"

সাইত্রিশ

আমি দৌড়াচ্ছি, আমার সাথী দুই পুলিশ আপা আমার দুই পাশে দৌড়াচ্ছেন। আমার সেন্ডেলের হিলগুলি মাত্র দুই ইঞ্চি, তবে খানিকটা সরু, তাই দৌড়াতে আমার সমস্যা হচ্ছে। আমাদের দুই পাশে নানাবিধ জনস্রোত নানা দিকে ধাবমান। কারও গতি এ দিকে। কারও গতি ও দিকে। বাতাসে ঘামের বাষ্প, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া, জর্দার থুতু, প্রস্রাবের অ্যামোনিয়া। ভাল করে খেয়াল করলে আরও অনেক কিছু টের পাওয়া সম্ভব। তাড়াহুড়ার জন্য আমি অনেক কিছু অনুভব করতে পারছি না। আর আমি একটু বিব্রত আছি, আমার হিলের ঠকঠক শব্দের জন্য। আমাদের তিন জনের নিঃশ্বাসের মধ্যে ঠোকাঠুকি চলছে। গাধ-গাধ শ্বাস আমার পাঁজরে বাড়ি খায়। চেষ্টা করি দম টেনে তা আরও নিচের দিকে নিতে। যেই ঢুলুঢুলু অঙ্গে গর্ভ ধারণ করেছিলাম তার পিঠ পর্যন্ত। যখন গর্ভ ধারণ করেছিলাম তখন এ ভাবে শ্বাস টেনে নিতাম; যদিও নিঃশ্বাসের বাতাস দিয়ে সন্তানের গায়ে আরাম দেয়ার সুযোগ পাইনি। তখন বসে বসে দম নিতাম। এখন নিচ্ছি দৌড়ে দৌড়ে। কাজটা কঠিন। তারপরও মনে হয় ফল পাচ্ছি। অন্তত এটা জানি যে পড়ে গিয়ে পা মস্কাব না।

এত তাড়া কেন বুঝতে পারছি না। প্রায় তিন ঘন্টা একটা ঘরে বসে ছিলাম। ছোট খন্দ। এই দুই পুলিশ সাথে ছিল। আমরা তিন নারী। আর সাথে ছিল প্রস্রাবের গন্ধ। মনে হয়েছিল ত্রিশ কি চল্লিশ বছর আগে করা প্রস্রাবের বাষ্প কুঠরিটাকে ডুবিয়ে রেখেছে। ওই বাষ্প বাকি সব গন্ধ গিলে খেয়েছে। অ্যামোনিয়ার গন্ধের সাগরে ডুবে নিজের সম্পর্কে একটা জিনিস জানলাম। ওখানে বসে বুঝলাম আজ আমি ভাল গন্ধ মন্দ গন্ধ দুটোকেই সমান ভাবে মেনে নিতে পারি। এই অনুভব আমার বুক প্রসারিত করে। “আপা, জোরে পা চালান,” আমার ডান পাশের পুলিশ ম্যাডাম বলে। আমি তাকে একট মৃদু হাসি উপহার দিই। আমি জোরে জোরে পা চালাতে পারি। গ্রহণের অনুভবে আমার হৃৎপিণ্ড খুলে গেছে। অল্প অক্সিজেনেই দেহের শক্তি জেগে ওঠে।

“নিয়ে যান, আপা,” আমি বলি। “দৌড়াতে আমার কোনও সমস্যা হচ্ছে না।”

কিন্তু পুলিশ আপার সমস্যা হচ্ছে। উনি স্বাস্থ্যবতী। স্বাস্থ্য আর কী। আমাকে বলেছে তার লিভার ভাল কাজ করে না। তাই সে যা খায় তা-ই দেহে মেদ হয়ে জমা হয়। আর তার ঘামের কথা কী বলব। এত মোটা ইউনিফর্মের কাপড়। পুরোটা তার ঘামে চুবে আছে।

মতিউরের উপর যদি আস্থা রাখা যায়, তা হলে বলা চলে, মাসখানেকের মধ্যে ছাড়া পাব। ছাড়া পেয়ে কী করব তা-ও জানি। রাশেদকে খুশি করব। ও যা যা চায় সব ওকে দিয়ে দেব। আমি আমার চাকরিটা ছাড়া আর কিছুই রাখব না। আর অ্যাপার্টমেন্টটা। মা যেটাতে মরেছে। আমি আর সোনিয়া ওটাতে থাকব। মতিউরের যদি মতির পরিবর্তন না ঘটে। দেখা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা কী গল্প বানাবে কে জানে? চেয়ারম্যান স্যার অবশ্য আর আমার কাছে আসবে না। তানিয়া সেই ফাঁক ভরে দিয়েছে।

কাঠগড়ায় উঠে বুঝলাম কেন দৌড়াচ্ছিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাদের আগে চলে এসেছে। এত বড় ব্যত্যয় হওয়ার জন্য ক’জনের চাকরি যাবে কে জানে?

একটু সময় লাগে ঘোর কাটতে। এখন দুই চোখ ভরে আদালত দেখছি। আর দুই কান ভরে শুনতে বাধ্য হচ্ছি। চেঁচামেচিতে কিছু বোঝার উপায় নাই যদিও। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে, এজলাসের নিচে, বিচার কক্ষের অবশিষ্ট অংশ বেশ বড়। ম্যাজিস্ট্রেটের ডানে ও বামে কালো কোট আর উর্দি পরা উকিলরা দাঁড়িয়ে আছেন। কয়েক জন ম্যাজিস্ট্রেটকে লক্ষ করে চোখ তুলে জোরে জোরে কথা বলছেন। আমি অবাক হই। তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটকে শাসাচ্ছেন। এক জন বয়স্ক উকিল ডান হাত তুলে কথা বলেন আর তাঁর মুখ থেকে থুতুর ধোঁয়া বের হয়। তিনি বাম হাতটা একটা লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়েছেন। ক্রোধে তাঁর দেহ কাঁপে। নাকি

বাত, পারকিনসন্স এ সবের কোনও একটা? চারিদিকের শোঁশা, ধুমধাম, খ্রিম, ঢিম আওয়াজ ভেদ করে তাঁর কথা আমার কানে আসে।

"কীসের ম্যাজিস্ট্রেট আপনি? কয়টা আইনের বই পড়েছেন? আইয়ুব খানের আমল থেকে এখানে আছি, জনাব। কত ম্যাজিস্ট্রেট আমার বাড়িতে গিয়ে আমার সাথে আইনের ধারা বুঝে নিয়েছে। জিজ্ঞেস করেছে কাকে জামিন দেয়া যাবে, কাকে জামিন দেয়া যাবে না। আপনি আমার নাতির ঘরের খন্তির বয়সী। আজকে আমার মক্কেলকে জামিন দেবেন। আমরা সবাই জানি এখানে কী হয়। ওই পেশকার আমার কেস না তুলে কোন সচিবের মেয়েকে আগে তুলেছে। তাও মরা সচিবের মেয়ের কেস। জীবিত সচিবের মেয়ের কেস হলে আপনি কী করতেন? দেশটা কি সচিবদের? আমরা কি কিছুই না? আজকে জামিন না পেলে আমি আইন মন্ত্রীর সাথে কথা বলব। আইন মন্ত্রীর সাথে কথা বলে কাজ না হলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলব। প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলে কাজ না হলে প্রধান বিচারপতিকে জানাব। খাগড়াছড়ি ভাল জায়গা। পাহাড়ের উপর থাকবেন। বিশুদ্ধ বাতাস খাবেন। আমি আইয়ুব খানের আমল থেকে আছি, বাবা..."

মনে হয় লোকটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন। ভারত ভাগের আগে বা পরে। চিৎকার করতে গিয়ে তাঁর বাম হাত থেকে লাঠি ফসকে যায়। তিনি পড়ে যান। উকিলদের ভিড়ে ওনার কোমর মাটিতে পৌঁছতে পারে না। কয়েক জন ওনাকে টেনে সোজা করেন। লাঠিটা বুঝি পায়ের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। এক জন তা খুঁজে পান। আর তুলে বৃদ্ধ উকিলের হাতে ধরিয়ে দেন। কালো রঙের লাঠি।

ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখে মনে হয় এমন ঝাড়ি খেয়ে তিনি অভ্যস্ত। আমার আব্বাও কোর্টে বসেছে। তার থেকে অনেক কথা শুনেছি। উকিলদের দাপটের কথাও অনেক শুনেছি। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে এ ধরনের কথা বলা যায়, তা জানতাম না। মনে হয় তখন ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে এ ধরনের আচরণ করা হত না। আব্বার কাছে কোর্টের কথা যতই শুনে থাকি না কেন, কোর্টকাছারির কথা মনে আসলে সব সময় টেলিভিশন বা সিনেমায় দেখা সাজানো আদালতের চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠত। পরিপাটি সাজসজ্জাধারী উকিল। রাশভারী বিচারকের গলায় সাদা ফিতা।

এই বিচারালয়ের সাথে সিনেমায় দেখা বিচারালয়কে মেলানো যাচ্ছে না। এক একটা উকিলের গায়ের রং ও দেহের গঠন এক এক রকম। শুধু মিল আছে তাঁদের অবয়বগুলির ব্যাকুলতার মধ্যে। অনেকের রুজিরোজগার হয়তো আশানুরূপ নয়। তাদের চেহারার ব্যাকুলতা ঘামে ভেজানো। কেউ খুনিকে বাঁচাতে চান। কেউ খুনিকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলাতে চান। দুই পক্ষের চোখেই একই ব্যাকুলতা। তার চেয়েও বেশি ব্যাকুলতা অন্য মানুষগুলির চোখেমুখে, যারা বিচার চান, এবং যারা আসামিদের আত্মীয়স্বজন। হলের মধ্যে অনেকগুলি টুল পাতা আছে। কিন্তু কেউ বসে নেই। আদালত-কক্ষের ভেতরে মানুষের সংখ্যা দু'শর কম হবে না। চিপাচাপা কোনও জায়গা ফাঁকা নাই, যেখানে কেউ দাঁড়িয়ে নেই, বা যেখান থেকে কেউ উঁকি দিচ্ছেন না। আমি মানুষ দেখি। কিছু মহিলাও আছে। সবার হাতে একটা করে পলিথিন। সাদা সাদা পলিথিনের ব্যাগ। গোলাপী আর নীল পলিথনও কিছু দেখতে পেলাম। পলিথিনের ব্যাগে কাগজ, ফাইল। অনেকের হাতে খাবারের প্যাকেট। বিস্কুট, চিরা, মুড়ি। যাওয়ার সময় স্বজন বন্দিদের দিয়ে যাবেন।

আমি রাশেদকে খুঁজছিলাম অনেক সময় ধরে। এখন পেয়ে গেলাম। ও বসেছে আমার থেকে অনেকটুকু দূরে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ডান দিকে। হল ঘরটার ওই কোনায় দ্বিতীয় সারিতে। ওর সাথে একটা অল্প-বয়সী উকিল আছে। রাশেদের পরনে গতকাল সকালের কালো পাজামা পাঞ্জাবি। মনে হয় না এর মধ্যে ও কোনও খানাপিনা করেছে। অথচ আমি ভোরবেলা মতিউরের মা'র দেয়া গরম ভাত, মুরগির ছালন, ডিমের হালুয়া তৃপ্তি সহকারে খেয়েছি। ভাইয়ের জন্য মায়া লাগে। কেন সে আমাকে ফাঁসাতে চায়, আমি বুঝি না। আমিতো ওকে সব দিয়ে দিতে চাই। ও কি তাতে আশ্বস্ত হতে পারছে না? নাকি বাসাটাও চায়। ওতো আমার

সাথে কথা বলে বাসাটাও নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ও আমার সাথে কথা বলে সহজ পথে কিছু নিতে চায় বলে মনে হয় না। ভিন্ন কায়দায় নেয়া। পরিশ্রম করে। মতিউরের কল্যাণে ওর ওসিডি সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে পেরেছি। কিন্তু আমাকে ফাঁসানোর কারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা এখনও করতে পারছি না। নাকি পারছি? অবসর পেলে ভেবে দেখব।

রাশেদের পেছনে বসে আছে লাল জরাজীর্ণ শাড়ি পরা এক মহিলা। শ্যামবর্ণ। চ্যাপ্টা গঠন। নিশ্চয়ই পাঠ ক্ষেতে কাজ করে সে এ গঠন তৈরি করেছে। এ গঠন তৈরি করার জন্য সিনেমার নায়িকা বা রাজকুমারীদের দিনে ছয় ঘন্টা ব্যায়ামাগারে আর সুইমিংপুলে ঘাম ঝরাতে হয়। মহিলার মুখে উৎকণ্ঠা চেপে আছে। বেচারার স্বামী হয়তো জেলে বন্দি আছে। মহিলা সোনাদানাজমিজিরেত বিক্রি করে স্বামীকে জেল থেকে মুক্ত করবে। স্বামী হয়তো বাড়ি গিয়েই তাকে একটা লাত্থি দেবে। না, সাথে সাথে তা করবে না। আগে জেলে জমে জমে তৈরি হওয়া চাপ খুলে ফেলার জন্য মহিলাটাকে ব্যবহার করবে। চাপে অন্ধ স্বামী বনজঙ্গলমরুভূমি কিছুই খেয়াল করবে না। লাত্থিটা দেবে খাবার পর। তরকারিতে লবন কম বা বেশি হওয়ার জন্য। তারপর পরের দিন পাশের বাড়ির চকচকে ত্বকের ভাবির পিছে ঘোরার জন্য বের হয়ে যাবে। এ হল সংসার। সভ্যতার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা অবুঝ অকার্যকর নিয়মকানুন। সবাই জানে। কারও ভাঙ্গার সাহস নাই।

আমি নারী, পুরুষ, শিশু, সবার মুখেই একই ভার দেখি। তবে দু-এক জনের মধ্যে লড়াকু ভাবও দেখি। ওই যে বিবাদীদের অংশে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা শার্ট পরা শিনা উঁচা করে ধরা মানুষটা। মনে হয় এত লোকের মাঝে তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি আজ সকালে গোসল করেছেন। আমি নিজেও গোসল করেছি। গোসল না করলেও এদের অনেকেই রাতে সহবাস করেছে। মামলামকদ্দমার দুশ্চিন্তায় তারা গোসল করতে পারেনি। মনে হয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজেও গোসল করেনি। আব্বার এক বন্ধুর বউ চলে গিয়েছিলেন কারণ আব্বার বন্ধু গোসল করত না। গোসল না করার বিষয়টা অবশ্য আমার ওই চাচির সমস্যা ছিল না। তিনি চাচার বগলের গন্ধ সহ্য করতেও রাজি ছিলেন। তার সমস্যা ছিল চাচার শার্টের কলার আর হাতার ভেতরের অংশে বসে যাওয়া ময়লা নিয়ে, যা চাচিকে ধুতে হত। যার কারণ ছিল চাচার গোসল না করার অভ্যাস। আশা করি এই ম্যাজিস্ট্রেটের বেগম সাহেবা বা বেগম সাহেবাগণ তাকে ছেড়ে চলে যাবে না। অনেকের অবশ্য যাওয়ার জায়গা থাকে না। অনেকের জায়গা থাকলেও লজ্জায় তারা যেতে পারে না। বগলের ঝাঁট আর জামাকাপড়ে বসে যাওয়া ময়লা এক সময় তাদের অভ্যাসস্থল হয়ে যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চোখগুলি দয়ালু। বেশ বড় আর ঘন গোঁফ তাঁর। যেমন কালো আর উজ্জ্বল তার গোঁফ তেমন সাদা আর ফর্সা তিনি। চেহারা দেখে মনে হয় চট্টগ্রামের মানুষ। ঘাড় দুটি ডিম্বাকার। গোলাকার স্ফীত পেট ডিম্বাকার গঠনে একটি সুন্দর সংযোজন। তার সামনে টেবিল থাকার জন্য তার উরুর গঠন আন্দাজ করা যাচ্ছে না। উরু যদি খুব মোটা হয় আর পাতার দিকে পা দুটি ক্রমশ সরু হতে থাকে, তবে এর চেয়ে ডিম্বাকার গঠনের পুরুষ বা নারী আমি কখনও দেখিনি।

শিশিরকণা। আমি আমার নামটা শুনি। আর বুঝতে পারি পেশকার ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে যে ফাইল হস্তান্তর করেছেন তা আমার ফাইল। “আসামী কাঠগড়ায়,” পেশকার মুখটা ম্যাজিস্ট্রেটর দিকে বাড়িয়ে বলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার ফাইল পড়া শুরু করেন। চেহারায় কোনও অভিব্যক্তি নাই। বিচারকার্যের কোনও ফাইলেতো আর ভাল কিছু লেখা থাকে না। পড়ুন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পড়ুন। আমি অপেক্ষা করছি আপনার পড়া শেষ হবার জন্য।

আমি অপেক্ষা করি। মার কথা মনে আসে। আমার চোখ ভিজে যায়। এমনওতো হতে পারে আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি। একটু পরে স্বপ্ন থেকে জাগব আর দেখব মা আছে। আসলেই কি মা আছে? মা আছে মা নাই। ব্যাপারটা কেমন যেন। মুক্তি পাব কমপক্ষে এক মাস পরে। তবু আমি সংসারের লোভে পড়ে আছি। এটা আমার আসল মুক্তির জন্য ভাল লক্ষণ নয়। তবু মন চাইছে দৌড়ে বাড়ি যাই আর রাশেদের সাথে সব মিটমাট করে ফেলি।

আটত্রিশ

“মোসাম্মত শিশিরকণা খান!”

“জি!”

আমি প্রস্তুত ছিলাম বলে জবাবটা আমার মুখ থেকে বের হয়। তবে মনে হয় না ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার জবাব শোনার জন্য আমার নাম উচ্চারণ করেছেন। আর তিনি আমার জবাবটাও শুনেছেন বলে মনে হল। তিনি চোখ টেরা করে আমাকে দেখে নেন। তাঁরা ইচ্ছা ছিল বোধ হয় আমি যেন না বুঝি, যে তিনি আমাকে দেখতে চান।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দ্বিতীয় বার আমার নাম উচ্চারণ করেন। তার সাহেবের কণ্ঠ। চিকন আওয়াজ কিন্তু ধারালো। তার থেকে আমার দূরত্ব দশ হাতের বেশি হবে না। আমার নাম বলে তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকান। বুঝতে পারি তার মধ্যে আমাকে দ্বিতীয় বার দেখার আগ্রহ জন্মেছে। আমিও তার দিকে তাকাই। কে আমার নামের আগে মোসাম্মত যোগ করল কে জানে? ইন্সপেক্টর মতিউরই হয়তো তা যোগ করে দিয়েছে। নাকি আদালতে মেয়েদের নাম লিখতে হলে তার আগে মোসাম্মত যোগ করতে হয়? এটা কি ধর্মীয় প্রথা না আদালতের প্রথা? আমি অবশ্য স্পষ্টভাবে জানি না।

“মোসাম্মত শিশিরকণা খান!” ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তার মাথাটা সামনের দিকে ঠেলে ধরে আবার বলেন। তার গলাটা তেমন লম্বা নয়।

আমি মনে মনে বলি, বলুন, মাননীয় আদালত। আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি কানে বেশি শুনি, চোখে বেশি দেখি। আমার নাকের শক্তি আর দশ জনের চেয়ে বেশি। আমার এক নারীর দেহে একত্রিশ নারীর কামনার শক্তি। কারও হালকা স্পর্শেই আমি লাফ দিয়ে উঠি। আমি ডবকা পাছার হামিদকে সামলেছি। আপনি বলুন। আমি শুনছি। আর দেখছেনতো, আপনি কথা বলাতে সবাই চুপ হয়ে গেছেন। সবাই আপনার কথা শুনতে চান।

“মোসাম্মত শিশিরকণা খান। পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের একটা বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করেছে। পুলিশের রিপোর্টে সব খুঁটিনাটি বলা হয়েছে। রিপোর্ট বলছে, আপনি আপনার মায়ের মৃত্যুর সাথে জড়িত নন। আপনার মা আত্মহত্যা করেছেন।”

“ডিএনএ টেস্ট! ডিএনএ টেস্ট!”

“ডিএনএ টেস্ট! ডিএনএ টেস্ট!”

যেখানে যত লোক বসা ছিল সবাই দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা উপস্থিত জনতা মিছিলের স্থায়ী শুনলাম। অন্তরা কই? অন্তরা কই? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দেহ দোলে, নিশ্চয়ই পায়ের নাচন থেকে। মহামান্যের জন্য যে

দাঁড়ানো শোভন নয়, এ বোধ তাঁর না থাকলে তিনি নিশ্চিত লাফ দিয়ে দাঁড়াতেন। এমনকি রাশেদের দিকে দৌড়ও শুরু করতেন। রাশেদের যেমন গলা, তেমন উচ্চারণ। কিন্তু অন্তরা কই? সঞ্চারী কই?

আমার ভাই রাশেদ! মামলার বাদী। গতকাল থেকে সে ডিএনস টেস্ট নিয়ে আছে।

"ডিএনএ টেস্ট! ডিএনএ টেস্ট!"

দোজখ যখন কারও বাড়ি বনে যায়, সে কালক্রমে ভুলে যায়, দোজখ তার বাড়ি। সে ভাবে বাড়ি তো এমনই হয়। আমার বোধি লাভের পর থেকে এ কথা আমি বিশ্বাস করে এসেছি। এখন আমার তা পরীক্ষা করার একটা ভাল সুযোগ। আমি মতিউরের জন্য চিন্তা করতাম। কিন্তু মতিউর আমাকে বলে রেখেছে, এ ব্যাপারে কোনও চিন্তা না করতে। মতিউরকে আমি বিশ্বাস করেছি। তাই মতিউরের জন্য চিন্তা করছি না।

"ডিএনএ টেস্ট! ডিএনএ টেস্ট!"

মনে হল সবাই যার যার ডিএনএ খুঁজছে। আসলে তো ডিএনএ টেস্ট মানবজাতিকে উলঙ্গ করে ছেড়েছে। এই আবিষ্কারের পর আমাদের কাপড় পড়লেই কী, আর না পড়লেই বা কী? লুকিয়ে করলেই কী, কিংবা প্রকাশ্য দিবালোকে চৌরাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করলেই বা কী? যারা পোশাকের প্রচলন করেছে, যারা সহবাস নিষিদ্ধ করেছে, ডিএনএ তাদের সবাইকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, আর আমাদের সবাইকে করে দিয়েছে নাঙ্গা। দিবারাত্রি চব্বিশ ঘন্টা।

রাশেদ চিল্লাতেই থাকে। ডিএনএ টেস্ট! ডিএনএ টেস্ট! আমি আমার বোধি লাভের পরীক্ষা নিই। এক সময় আমার ভেতর একটা হাসির দমক ওঠে। আমি মুখে তা ফুটতে দিই না, শুধু শরীরের তরঙ্গে তার স্ফূর্তিটা বইতে দিই।

যাদের নিজেদের ডিএনএ খোঁজা হয়ে গেছে, তারা ঘাড় ঘুরিয়ে, মাথা তুলে, কান খাড়া করে রাশেদকে শুনতে চায়। আবার অনেকে ডিএনএ টেস্ট কী জিনিস, তা বোঝে বলে মনে হয় না। রাশেদের ক্লান্তি নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পেছনের দরজা খুলে দৌড়ে একটা লোক ভেতরে ঢোকেন। তার হাতে একটা হাতুড়ি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব টান দিয়ে হাতুড়িটা লোকটার কাছ থেকে নিয়ে টেবিলের দিকে তার চেয়ারটা ঘুরিয়ে টেবিলের এক জায়গায় তিন বার আঘাত করেন। ইস্কুলের ঘন্টা বাজার মতো শব্দ হয়।

সবাই চুপ হয়ে যায়।

"লোকটা পাগল নাকি!" ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হল-ভর্তি মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে বলেন।

"আমি পাগল! আমি পাগল?" রাশেদ যে টুলে বসে ছিল সেই টুলের উপর উঠে যাওয়ার জন্য বাম পা ভাঁজ করে। তার পাশে দাঁড়ানো উকিলটা তাকে হাত ধরে টেনে থামায়। রাশেদ হাত উঁচা করে গলার জোর বাড়ায়। "আমি তোমারও ডিএনএ টেস্ট করাব। এই বিল্ডিংয়ের কত কুঠুরি। কোনটাতে আমার বোনকে তুমি নিয়ে গেছ? কতক্ষণ ছিলে? তুমি বলছ সে খুন করেনি। আমি জোর দাবি জানাচ্ছি ম্যাজিস্ট্রেটের ডিএনএ টেস্ট করা হোক।"

আমি আমার হাঁটু দুটি অনুভব করি। না, আমার হাঁটু কাঁপে না। আমার ঘাড়ে গলায় ঘামও হয় না। নিজেকে আরও একটু বেশি মুক্ত মনে হয়। আমার নারী অঙ্গের বিভিন্ন অংশের শান্তিময় বিশ্রামে কোনও ছেদও পড়েনি। আমি চোখ বন্ধ করে আমার মগজে মনোযোগ দিই। দেখি সব ঠিক আছে। আমি আমার মধ্যে আছি। আমার আনন্দ আরও বাড়ে। রাগ-অনুরাগ-আবেগ থেকে মুক্তির আনন্দ। মতিউর, ম্যাজিস্ট্রেট আর

আমার, এই তিন জনের ডিএনএ টেস্টের উপর যেন রাশেদের বাঁচামরা নির্ভর করছে। ও চেঁচিয়েই চলেছে। ওর জন্য খারাপ লাগে। ডিএনএ ডিএনএ বলতে বলতে ও বুঝি মরেই যাবে।

কম বয়সী উকিল সাহেব রাশেদকে টেনে বসাতে চায়। রাশেদ উকিলকে কনুই দিয়ে গুতা দেয়। তারপরও উকিলটা রাশেদকে টানতে থাকে বসার জন্য। রাশেদ তার হাত ঠেলে সরিয়ে দেয়। উকিলটা রাশেদের চেয়ে লম্বা। অনেকটা ঝুঁকে সে রাশেদের ডান হাত চেপে ধরে, এবার বেশ কড়া করে।

কে জানে? ওরা এখানে মারামারি শুরু করে দেয় কি না।

"কোর্ট পুলিশ!" ম্যাজিস্ট্রেট বলে ওঠেন।

সামনের সারিতে আর ম্যাজিস্ট্রেটের বাম দিকে দাঁড়িয়ে থাকা এক জন পুলিশ হাত তুলে স্যালুট দেন।

"ওই লোকটাকে বের করে দেন," ম্যাজিস্ট্রেট বলেন।

"বাদীকে কি বের করে দেয়া যায়?" রাশেদ চেঁচিয়ে তার পাশে দাঁড়ানো উকিলটাকে জিজ্ঞাসা করে।

উকিলটা রাশেদকে আবার বসার জন্য চাপ দেয়।

"আমি আর কথা বলব না। আমি বসবও না," রাশেদ বলে। "আমাকে বের করে দিতে হবে না।"

সবাই রাশেদের দিকে তাকিয়ে আছেন। সবার চোখে কৌতূহল।

"মোসাম্মত শিশিরকণা খান," ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেন। "যদিও আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার এখতিয়ার আমার নাই। তাই আমি আপনার কেস মাননীয় সেশন জজের আদালতে পাঠাচ্ছি।"

রাশেদ ঝামেলা না করলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঘোষণাটা আগেই দিতে পারতেন। মতিউর আমাকে বলে দিয়েছিলেন, আজ আমাকে পাঁচ মিনিটের বেশি কাঠগড়ায় থাকতে হবে না। আমি কাঠগড়ায় পৌঁছার সাথে সাথে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই ঘোষণা দিয়ে আমাকে আজকের মতো বিদায় করবেন। আমি শ্বাস ফেলে দেহ শিথিল করি। রাশেদ তার উকিলের সাথে ঝগড়া করছে:

"তুমি আমাকে কিছু বুঝিয়ে বলতে পারো না।"

"আমি সব বুঝিয়ে বলেছি। আপনি মন দিয়ে কিছু শুনেন না।"

"আমিতো কোনও কিছুতে মনোযোগ দিতে পারি না," রাশেদ বলে। "তা হলে আমার কী দোষ?"

"তা হলে দোষ কি আমার?" উকিল বলে।

"খালুকে বলব তোমাকে আর আমার সাথে না পাঠাতে।"

"আমিও আপনার সাথে আর আসতে চাই না।"

ম্যাজিস্ট্রেটের গাল থেকে রক্ত চলে গেছে। সাদা চামড়ায় খোসা দেখা যাচ্ছে। এখন আর কোনও সন্দেহ নাই, তিনি এক মাস গোসল করেননি। আমার দুই পাশে দুই পুলিশ আপার পুনরোদয় হয়। আমি ঘুরে দাঁড়াই। তাঁদের সাথেই আমাকে যেতে হবে। কোন জেলে নিয়ে যাবে কে জানে? স্বাস্থ্যবতী পুলিশ আপার হাতে একটা গোলাপি ব্যাগ। এটা আমার ব্যাগ। মতিউরের মার দেয়া ব্যাগটার কথা মনে পড়ে। সত্যি সত্যি

আমি ওটা গাড়ি থেকে নামাতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন ওটা কোথায় আছে কে জানে? পুলিশ আপা গোলাপি ব্যাগটা আমার দিকে বাড়িয়ে দেন। আমি তা গ্রহণ করি।

"আপনার ভাই দিয়েছেন।"

ব্যাগটা একটু ভারী। রাশেদ কী কী পাঠিয়েছে না খুলে বলা যাবে না। রাশেদকে আমি বুঝতে পারছি না। ওর শুধু একটা ওসিডি আছে, তা আমি ভাবি না। রাশেদকে বোঝার আমার ইচ্ছা। রক্তের সম্পর্ক অনেক জটিল। রক্ত-নিরপেক্ষ সম্পর্কের চেয়ে। কেন যেন মনে হচ্ছে কারাগার আমার স্থায়ী নিবাস হতে চলেছে। তখন এ নিয়ে অনেক ভাবা যাবে। আপাতত বর্তমানে থাকি।

উনচল্লিশ

তার পর কী যে হল কোর্ট শুধু কোর্ট।
ফাঁসির মঞ্চ ছাড়া নেই কোনও ভোট।
জেল থেকে আদালত মাসে এক বার।
ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই শুনি বার বার।

আসল ডিবি আসল এসবি করল তদন্ত।
প্রশ্ন তাদের একটাই: তুই শয়তানী না সন্ত?
মরীচিকা মায়াজাল আরও আছে তেজ।
মধ্য রাতের পরী তুই মধ্য দিনের প্রেত।

রক্ত দেখলাম, লালা দেখলাম, অঙ্গরুহের সংখ্যা গুনলাম।
তেরোখানা গন্ধ নিলাম, কোনও আলামত নাহি পেলাম।
সব কিছু ঘেঁটে দেখলাম, সন্দেহ নাই কিছু।
আজান্তার মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকিস, আমরা ভাবি শিশু।

পাদ্রি ডেকে দিলাম ছেড়ে নিতে তোর পিছু।
পাদ্রির জোব্বা লম্বা হল, পাদ্রি বলে, জিশু।
নিষ্কলুষতা তোর মাঝে জলে যেমন চিনি।
মায়া বান্ধব সুখানুভব তোর কাছে সব ঋণী।

বাদী বলে সব সত্য তালগাছ আমার চাই।
আমরা করি তোর কর্ম আইনের পাল্লায় যাচাই।
উকিল বদলায় জজ বদলায় বদলায় না আইন।
হুকুম আসে ধরতে হবে যেমন ধরো বাইন।
শক্ত করে ধরবে কই ছাই যত লাগে।
দিব আমরা নাই চিন্তা ধরো তারে বাগে।

বাগে বাগে ঘুরে ঘুরে আমরা হয়রান।
তুই অবিচল বড় শীতল কোথায় তোর প্রাণ?
ফাঁসিখানা হয়ে গেলে আমরা নিস্তার পাই।
কী করে তা সাধন হবে কুল কিনারা নাই।

রাজদণ্ড ব্যর্থ হল পুংদণ্ড বিনা।
কী করে দোষ প্রমাণ করি কিছু না যায় চেনা।
কোথায় পাই সেই অস্ত্র কে তা বিক্রি করে?
খুঁজি মোরা সারা বাজার সারা দিন ধরে।

হুকুম আসে যে করে হোক চলবে তদন্ত।
তোর ভয়ে কত কর্তা হল যে শান্ত।
কেউ মরল স্বপ্নদোষে হার্ট অ্যাটাকে কেউ।
পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিল কেউ কোথাও জলে উঠল ঢেউ।
কী করুণা করি তোরে তুই নাই কোনও দুঃখে।
ছুরি পিস্তল কাজে লাগত পাইলে তোরে সুখে।
হতাশ মোরা দাড়ি ছিঁড়ি মাথায় দেই হাত।
প্রশ্ন মোদের একটাই, বল্ তুই কোন জাত?

আমি বলি, ওহে বাছা, শোনরে দিয়ে মন।
সত্য কথা তোদের আমি করি যে বর্ণন।
নই সন্ত নই শয়তানী নই আমি ফানুস।
আমার শুধু আছে একটু সবার বেশি হুঁশ।
তোদের চেয়ে, রাজার চেয়ে, রানীর চেয়েতো বটে।
না হলে কি এমন করে যেতিস তোরা খেটে?

আকাশ বাতাস খুঁজে আয় খোঁজ বালু তটে।
থাকব আমি জিশু হয়ে তোদের স্মৃতিপটে।
তেমন করে প্রস্তুত আমি হলাম অনেক ভেবে।
আমার ভার আমি নিলাম তোদেরটা কে নেবে?

মগজ ভারী বুক ভারী মুষ্ক কম যায় কিসে?
ধ্বজ ভারী ভগ ভারী ভার সবই বিষে।
জিহ্বা ভারী কর্ণ ভারী আরও ভারী চোখ।
সকল ভারে সবার জীবন হয়েছে দোজখ।

ভার শত্রু কেউ জানে না চাহে ভারী সোনা।
লিপ্সার জ্বালায় জ্বলে জীবন জানে কয় জনা?
অতীত ভারী ক্ষোভে আর ভবিষ্যৎ ভারী ভয়ে।
বর্তমানে মুক্তি মেলে সবই যে যায় সয়ে।
জানি আমি এ-ই সত্য এ-ই আমার শক্তি।
তোরা থাকিস বেহুঁশ হয়ে নাইকো তোদের মুক্তি।
যুক্তি মোরে জ্ঞান দিল আরও দিল শান্তি।
চোখ খুলে আমায় দেখ মিটবে তোদের ক্লান্তি।

চল্লিশ

আট মাস পর...

আমি লোহার রেলিংয়ের ভূ-সমান্তরাল বিমটা মুঠো করে ধরি। আর হাতের তালু দিয়ে তার শীতল মসৃণতা অনুভব করি। রেলিংটা ইস্পাতেরও হতে পারে। রেলিংয়ের খাড়া ডান্ডাগুলির রঙের সাথে পিতলের রঙের কিছু মিল আছে। পিতলের অনেক দাম। মনে হয় না রেলিংটা পিতলের। ডান্ডাগুলি ইস্পাতের বা লোহার হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। রেলিংটা আমার নাভি পর্যন্ত উঁচু। আমার সুন্দর নাভি। পাজামা চোর জহির বলত ও যদি প্রজাপতি হয়ে আমার নাভির উপর বসে থাকতে পারত, তা হলে ওর জীবনের নির্বাণ লাভ হত। ফাল্গুন মাসের এক দিন ভোর বেলা জহির মিরপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে চায়। এত ভোরে? আমি বলি। আমিও ওর সাথে যেতে চাই। জহির আমাকে নিতে রাজি হয় না। বলে, তোমার বিরক্ত লাগবে। জহির সূর্য ডোবার পর ফিরে আসে। ওর হাতে রুমালে মোড়ানো কতগুলি ফুল আর পাতা। আমাকে দিয়ে বলে, মিলিয়ে দেখো। আটত্রিশটা পাতা আর নয়টা ফুল। ফুলগুলি বেগুনি আর পাতাগুলি গাঢ় সবুজ আর টাটকা। প্রতি ফুল আর প্রতি পাতার সাথে আমার নাভির শতভাগ মিল ছিল। জহির বলল ওর ফুল আর পাতা চিনতে দেরি হয়নি। দেরি হয়েছে ঠিক মাপমতো, গঠনমতো ফুল আর পাতা তুলতে। সাড়ে দশ ঘন্টার কাজ। ওকে হাজার হাজার পাতা আর হাজার হাজার ফুল বাছতে হয়েছে। তাপস জহির। ওর শখ পুরনের কোনও রুহানি পথ থাকলে ও এখন তা পূরণ করতে পারে।

কাঠগড়াটা বেশ বড়। এখানে অনায়াসে বিশ জন আসামীর জায়গা হবে। কোনও কোনও মামলায় অবশ্য এক হাজার পর্যন্ত আসামী থাকে। তবে এক হাজার আসামীকে আদালতে এক সাথে হাজির করা হয়েছে এমনটা কখনও দেখিনি। বিশ থেকে ত্রিশজন আসামীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দৃশ্য নিশ্চয়ই টেলিভিশনে দেখেছি। বা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জন।

এটা জেলা ও দায়রা জজের আদালতকক্ষ যা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত কক্ষের চেয়ে বড়। জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়া এক ভদ্রমহিলা। এই জজরা গুরুতর দেওয়ানি ও ফৌজদারি অপরাধের বিচার করেন। আমার বিচারকের থুতনি কালো হিজাবে ঢাকা। যেটুকু মুখের রং দেখতে পাচ্ছি তা ধূসর আর গোলাপির মাঝামাঝি। আমি জজের ঠোঁটের উপর দৃষ্টি ফেলি। আমার ধারণা ঠিক। উনি ঠোঁটে তাঁর ত্বকের রঙের লিপস্টিকের প্রলেপ দিয়েছেন। এমন রঙের লিপিস্টিক কোথায় পেলেন কে জানে। অনেক খুঁজতে হয়েছে নিশ্চয়ই। স্বামী ছাড়া অন্য কেউ মুসলিম নারীর লিপস্টিক দেখবে, আমাদের ধর্মে সেই অনুমোদন নাই। সে জন্য হয়তো তিনি সাবধানে লিপস্টিকের রং ঠিক করেছেন। তবে বেগানা পুরুষরা শুধু তার ঠোঁট দেখলেও তার অপরিমেয় গুনাহ হয়। সে-ব্যাপারে উনি কেন ছাড় দিলেন কে জানে? অবশ্য সামর্থমতো ধর্মের অনুশাসন মানারও ফজিলত নিশ্চয়ই আছে।

বিচারকের খাড়া আর পুরুষালি নাক। আর বয়স পঞ্চাশের এদিক-ওদিক হতে পারে। চেহারায় মায়া যেমন নাই তেমন বিকর্ষণও নাই। আছে বিষণ্নতা। তাঁর পরনে হালকা কালো প্রিন্টের সাদা শাড়ি। সদ্য বিধবা হয়েছেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। সাধারণত বিধবা হলে এতটা বিষণ্নতা গালের ওপর ভেসে ওঠার কথা নয়। হয়তো অন্য কিছু। হয়তো গেল সপ্তায় তাঁর আট বছর বয়সের দুটি জমজ সন্তান নৌকা থেকে পড়ে বানের জলে ভেসে গেছে। খালা বা নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে। হয়তো এ-সব কিছুই নয়। তাঁর বয়স ঋতু বন্ধ হওয়ার বয়স। সে কারণেও তাঁর মুখের এই ভাব হতে পারে। তিনি অনেক আইন জানেন নিশ্চয়ই। কিন্তু রজনিবৃত্তিঘটিত মানসিক সমস্যা কীভাবে সামলাবেন, তা হয়তো জানেন না। কোথায় যেন পড়েছিলাম নারীর প্রকৃত দেবিত্ব শুরু হয় রক্তের আনাগোনা বন্ধ হওয়ার পরে। সেই দেবি-গুণ অর্জন করতে হয় সচেতনতা দিয়ে। সেটা অর্জন করা কঠিন কারণ আমাদের মধ্যে সেই শিক্ষার প্রচলন নাই। পুরুষ সঙ্গীও বড় সমস্যা।

যদি এই মহোদয়ার স্বামী অনেক টাকার মালিক হয়, আর তার গা মালিশ লাগে, তা হলেতো উনার বিষণ্ন হবারই কথা। হয়তো মহাত্মনার স্বামী সাহেব এখন ব্যাংককে গা মালিশ করাচ্ছেন। জিগিজিগি ক্যাচক্যাচ। ক্যাচক্যাচ ক্যাচক্যাচ। নাম হল গা মালিশ। হা হা হা। এই ম্যাডাম কখনও শিশিরকণা হতে পারবেন, সে আশা নাই। মানুষ আর দশটা অবুঝ প্রাণির চেয়ে পৃথক। তবে তা শুধু ঋণাত্মক দিকে। অন্য প্রাণিরাও বিদ্যুতের ঝলকানির মতো এক একটা সন্তান অঙ্কুরিত করে। কিন্তু তাদের মধ্যে সুখদুঃখ, সহায়ত্বআরঅসহায়ত্ব, এগুলোর প্রচলন নাই। না বিষয় হিসাবে, না ধারণা হিসাবে। বৃক্ষ আর প্রাণির জীবনে মানুষের জীবনের চেয়ে শান্তি বেশি। মানুষের তা বোঝার ক্ষমতা নাই। উপরন্তু নারীর উপর রয়েছে সমাজের অতিরিক্ত চাপ। রান্না করার। হাড়িপাতিল মাজার। গোসলখানা পরিষ্কার করার। সন্তান ধারণ করার। আর লালনপালন করার। গাভিন হও! বিয়াও! না হলে পাগলা চলে যাবে! নারী কবে এ অসহায়ত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার শক্তি অর্জন করবে? তার সম্ভাবনাতো জেলের বাইরে যখন ছিলাম তখনও দেখিনি।

জেলে এসেছিলাম নভেম্বরে। আজ জুলাই মাসের আটাশ তারিখ। সারা দেশ নাকি বন্যায় ডুবে ছিল এক মাস। এখনও আছে। আমাকে জেলখানা থেকে বের করা হয়েছে রাত সাড়ে আটটায়। বিখ্যাত কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে। বন্যার কারণে সড়কে যানবাহনের গতি মন্থর। তাই আমাকে এত আগে বের করা হয়েছে। কারাগারের উঠানে পৌঁছতে কারা-শকটের নয় ঘন্টা লেগেছে। নয় ঘন্টায় এক বার উড়োজাহাজে করে ফ্রাংকফুর্ট থেকে নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম। রাতের ফ্লাইটে। অন্ধকারে কিছু দেখিনি। এই বার আদালতে আসার সময়েও অন্ধকারে কিছু দেখিনি। শুধু শুনেছি। গাড়ির চাকাগুলি ধীরে ধীরে পানি কেটে এগিয়ে যায় আর চাকাগুলির নীচ থেকে থেকে চচ্চড় করে পানি লাফ দিয়ে ওঠে। মনে মনে দেখেছি ছড়ানো পানি কলাপাতার মতো পাখনা মেলে উপরে উঠছে আবার খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে পানিতে মিশে যাচ্ছে। এমন বন্যায় কারও জমজ সন্তান নৌকা থেকে পড়ে মেঘনা বা পদ্মা নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যেতেই পারে। তেমনটা হয়ে থাকলে এই বিচারকের মনের এখন কী দশা তা কল্পনা করা যায়। তবে আমি আশা করব বিচারকের এমন কিছু হয়নি। তিনি ভাল আছেন। ধার্মিক মানুষ। আখেরাতের ভয়ে ভীত। সততার সাথে পরকালের ভয়ে ভীত হলে এই জীবনে প্রসন্ন থাকতে পারার কথা নয়। তবে মস্তিষ্ক বার বার মানুষের মনোযোগ আখেরাত থেকে দুনিয়াতে নিয়ে আসে। মানুষ দুনিয়ার একটা মোমের আগুনের ভয়ে মূর্ছ যায়। আখেরাতের অনন্ত আগুনের শিখা, যার গোড়া পাতালে আর মাথা সপ্তম আকাশে, তার ভয়ে মানুষ খুব একটা কাঁপে না। অথবা কাঁপে, নামাজের পর, মৃত্যুর আগেতো কাঁপেই, যতক্ষণ জ্ঞান থাকে। অনন্ত আগুনের সমস্যা সিসিফাসের মতো প্রজ্ঞা নিয়ে আর কেউ মোকাবেলা করেনি।

মা কি মৃত্যুর আগে মূর্ছা গিয়েছিল? আমার মনে হয় না সে মূর্ছা গেছে। জীবাণু আর মানুষ ছাড়া অন্য কিছুকে সে ভয় করত না। মৃত্যুকেও তার ভয় করার কথা নয়। বিষ গ্রহণ করে আত্মহত্যা করলে ভিন্ন কথা। মার লাশ কবর থেকে দুই বার তোলা হয়েছে। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কোনও রিপোর্টে আত্মহত্যার কথা বলা হয়নি। বিষের কথাতো বলার প্রশ্নই আসে না। আমার অবশ্য দু'একটা রাসায়নিকের নাম মনে আসে আর যায়। মা ডাক্তার ছিল। ওগুলি সম্পর্কে তারও জানাশোনা থাকার কথা। মা কীভাবে মরেছে তা জানার আমার কৌতূহল আছে। মৃত্যুকে সে ভয় পায়নি। এমন মানুষ যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ অচেতন হয় না। মারও যতক্ষণ প্রাণ ছিল ততক্ষণ চেতনা থাকার কথা। কাছে থাকলে অবশ্য সব কিছু চোখে দেখতে পেতাম। এখন নিজের মৃত্যু ছাড়া আর কারও মৃত্যু দেখার সম্ভাবনা আমার নাই বলেই মনে হয়। অবশ্য জেলে যদি কেউ আমার সামনে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, তবে তার মৃত্যু দেখা যেতে পারে। আব্বার মৃত্যুটা খুব শান্তির মৃত্যু ছিল। আব্বা প্রস্তুত ছিল মৃত্যুর জন্য। তবে তারও মৃত্যুর আগেই জ্ঞান চলে যায়। তখন তার ডান হাত আমার চুলের উপর পড়ে থাকে। অজ্ঞান হওয়া, ঘুমের মধ্যে ঢোকা, এগুলো মৃত্যুর শামিল। ঘুম বা অজ্ঞান হওয়ার সময়কাল অসীম হলে আমরা তাকে মৃত্যু বলি। একটা পার্থক্য অবশ্য আছে।

ঘুমালে বা অজ্ঞান হলে দেহ পচে না। মৃত্যু হলে পচে। তাই মৃত্যু মৃত্যুই। আমরা তার যে রূপ রচনা করি, সেটাই মৃত্যুর রূপ। মৃত্যুর রূপের মূল্য যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ। আমাদের কল্পনায়। তারপর শূন্য, সব মহাশূন্য। মহাবিশ্বে। মহাকাশে মহাকাল মাঝে...

আমাকে সকাল সকাল গাড়ি থেকে নামানো হয়েছিল। আদালত প্রাঙ্গনে তখনও ভিড় জমেনি। সিঁড়ি দিয়ে উঠানোর সময় দুই জন আর্দালি ছাড়া কাউকে দেখিনি। আমার এক হাতে হাতকড়া ছিল। আর এক হাত রেলিঙের উপর রেখে আমি চার তলায় উঠি। চারতলার হাজতে আমি অপেক্ষা করি, তিন জন পুরুষ আসামীর সাথে। তারপর আমাকে আবার নিচে নামানো হয়। আর এই আদালত কক্ষে আনা হয়।

আমার পেছনে একটা চেয়ার আছে। মনে হয় আমি বসলে মহামান্য বিচারক কিছু হয়তো মনে করতেন না। আমি বসি না। যদি বাধা দেন। তার চেয়ে না বসাই ভাল। গত আট মাসে শরীরে অনেক শক্তি সঞ্চয় করেছি। আগামী আট মাস দাঁড়িয়ে থাকতে পারব। আমার মগজ বা দেহের অন্য কোথাও কোনও চিন্তা নাই। চিন্তা ওদের যারা সংগ্রাম চালাচ্ছে এই মামলায়। আমি সংগ্রাম চালাচ্ছি না।

বাদী অংশে রাশেদ আছে। ও এখনও সেই কালো পোশাকেই আছে। ওকে দেখে আমি অবাক হইনি। অবাক হয়েছি সোনিয়াকে দেখে। লিকলিকে সোনিয়া এত বড় আর এত লম্বা হল কী করে? মেয়েটার দুধ দুইটা মনে হচ্ছে ইঞ্জেকশন দিয়ে ফুলানো হয়েছে? বোঁটা দুটিও ফুলে আঙ্গুরের মতো হয়ে আছে, লাল কামিজের আড়ালে। ওড়নাটাকে ইচ্ছে করে যেনো সে গলায় মাফলারের মতো পেঁচিয়ে রেখেছে। মেয়েটাকে দেখে আগের মতো মায়া লাগছে না। কেন লাগছে না কে জানে? কী অবস্থার মধ্য দিয়ে গেলে একটা কিশোরী মেয়ে এতটা ফুলে যায়? এ দেশে কত লোক টাকাপয়সা নিয়ে এই ধরনের অসহায় মেয়েদের স্ফীত করার জন্য প্রস্তুত থাকে আর প্রথম সুযোগে তাদের পর্দা ফাটায়? তবে সোনিয়াকে সব সময় যা দেখেছি তাই মনে হচ্ছে। সুখী সোনিয়া। নির্ভীক সোনিয়। আর সোনিয়ার পাশের ঘাটের মরাটা? ওর বাপ নিশ্চয়ই। সোনিয়ার বাপ এখানে কেন? সোনিয়ার মাও আছে বোধ হয়। ওই মহিলাটা। ওদেরকে আমি মেলাতে পারছি বয়সের পার্থক্য দিয়ে। যে রকম সোনিয়া থেকে শুনেছিলাম।

মতিউর বলেছিল আমি যে মাকে খুন করেছি তার চার জন সাক্ষী আছে। এই তিন জন কি ওই চার জনের মধ্যে আছে? এই নামগুলি এত দিন আসেনি। আর মতিউর আমাকে এর বেশি কিছু বলেনি। মতিউর কি তা হলে শুধু শুনেছিল। নামগুলি জানলে মতিউর আমাকে বলত। সে নামগুলি জানত না। হয় তো অন্য কিছু। হয় তো মতিউর একটু বেশি জানত। হতে পারে আমাকে সবটুকু জানানের মতো কঠোর সে হতে পারেনি। এই মামলার প্রথম দিন রাশেদের সাথে একটা বাচ্চা উকিল ছিল। তারপর তার জন্য চার জন উকিল আসা শুরু করে। তাদের নেতা ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মাসুদ। ধারালো চেহারার সীসা রঙের হালকা পাতলা এক মানুষ। বয়স পঞ্চাশও হতে পারে আশিও হতে পারে। বোঝা মুশকিল। যেমন ধারালো চেহারা তেমন ধারালো কণ্ঠ, তেমন তার বাণী, রাশেদের সাথে তার অনেক মিল। ডক্টর মাসুদ গত সেশনে বলেছিলেন তিনি চমক দেখাবেন। আজ সোনিয়া এখানে সপরিবারে উপস্থিত। কিন্তু এত দিন পরে কেন? এদেরকে প্রথমেই কেন আনা হল না? অবশ্য এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। দেখি। কী হয়?

একচল্লিশ

উকিল: “তোমার নাম সোনিয়া?”

সোনিয়া: "জি, অ। আমারে আপনি কইরা বলুইন।"

উকিল: "আপনার নাম সোনিয়া বেগম?"

সোনিয়া: "জি, অ।"

উকিল: "আপনি কী দেখেছেন? সব কিছু খুলে বলুন?"

সোনিয়া: "আমারে ধমক দিবান নাই।"

উকিল: "আমি কি আপনাকে ধমক দিচ্ছি? আমিতো কাউকে ধমক দিই না। কারও সাথে উঁচু গলায় কথা বলাও আমার স্বভাব নয়।"

সোনিয়া: "আপনে আমারে ধমক দিতাছুন। আমি কি রাস্তা তেইকা উইডা আইছি যে আপনে আমারে ধমক দিতাছুন?"

উকিল: "আমার যদি ভুল হয়ে থাকে আমাকে মাফ করবেন, ম্যাডাম।"

সোনিয়া: "অহন ঠিক কইছুইন।"

উকিল: "সোনিয়া ম্যাডাম। বলুন আপনি কী দেখেছেন।"

সোনিয়া: "খালাম্মা নানিরে টোডা পেঁচায় ধরছে। নানি মারা গেছে। খালাম্মা পানি ছাইরা দিছে।"

উকিল: "ম্যাডাম সোনিয়া বেগম, আপনি যে মিথ্যা কথা বলছেন না, তা আমরা কী ভাবে বুঝব? মহামান্য আদালত আপনাকে কেন বিশ্বাস করবেন?"

সোনিয়া: "বিশ্বাস না করুইন। আমার কিসের ঠেকা?"

উকিল: "মহামান্য আদালত। আমি এখন মিস সোনিয়া বেগমের বাবাকে কিছু প্রশ্ন করব।"

বিচারক: "করুন।"

সোনিয়ার বাবা: 'অঅঅ। বাতের বেতা।'

উকিল: 'আপনি সোনিয়ার বাবা জনাব বরকত উল্লা?'

বরকত উল্লা: 'অঅঅ। বাতের বেতা।'

উকিল: 'মাননীয় আদালত। এই নবতিপর বৃদ্ধ সাক্ষী বেদিতে উঠতে অক্ষম। কিন্তু তাঁর কাছে আমার কিছু জানার আছে। আমাদের জানতে হবে তিনি মিথ্যাবাদী না সত্যবাদী। আপনার সম্মুখে যে মিথ্যা বলবে তার জিভ খসে পড়বে। যে সত্য বলবে মহান রাব্বুলআলামিন তাকে কাল কেয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন।'

বিচারক: 'তাকে সাক্ষীর বেদিতে উঠতে হবে না।'

উকিল: 'ধন্যবাদ, মহামান্য আদালত, আপনার অসীম দয়া। জনাব বরকত উল্লা, আপনি আপনার জায়গা থেকে বলুন। চাইলে বসেও বলতে পারেন। পারেন না, মহামান্য আদালত?"

বিচারক: "দাঁড়ালে ভাল হয়। আদালতের ঐতিহ্য। আদালতের মর্যাদা।"

বরকত উল্লা: “দারাইতে পারুম।”

উকিল: “আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ, জনাব বরকত উল্ল্যা। আপনি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ান। আমি আপনাকে বেশি প্রশ্ন করব না। এই যে আপনি দাঁড়ালেন। আপনি অনেক কষ্ট করছেন। ন্যায়বিচারের স্বার্থে আপনি সত্য কথা বললে আইনের শাসনের ইতিহাসে আপনার নাম লেখা থাকবে। আর রোজ হাশরের ময়দানে আপনি আরশের নিচে ছায়া পাবেন।”

বিচারক: “আপনি প্রশ্ন করুন। অযথা কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না।”

উকিল: “মহামহিম, চৌদ্দ পুরুষ ধরে আমাদের ওকালতি পেশা। মানব সেবায় আমার বংশের সব পুরুষ নিবেদিত। এটা আমাদের বংশগত শিল্প। সত্য উদঘাটনের শিল্প। আমি সব সময় ন্যায় বিচারের পক্ষে। আমার বাবা ন্যায় বিচারের পক্ষে ছিলেন। চৌদ্দ জন বিবাদীর বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি সত্য উদঘাটনের মাধ্যমে যদিও তিনি বাদিদের উকিল ছিলেন। ওই চৌদ্দ জন বাদীকে তিনি কোর্ট থেকে গ্রেফতার করিয়েছেন। বংশ পরম্পরায় আমরা ন্যায়বিচারের পক্ষে কাজ করে এসেছি, মহামান্য আদালত, আপনি জানেন।”

বিচারক: “আপনি প্রশ্ন করুন। অযথা কথা বলে সময় ক্ষেপণ করবেন না।”

বরকত উল্লা: “বাতের বেতা। বেশি সময় দাড়াইতে পারুম না। বইসা কইতে অইব। বাতের বেতায় গলায় জোর বারাইয়া দিছে। শুনতে কষ্ট অইব না।”

বিচারক: “আচ্ছা ঠিক আছে। উনি বসে বলতে পারেন।”

উকিল: “মহামান্য আদালত আপনাকে বসে বলার অনুমতি দিয়েছেন। আপনি বসে বসেই আমার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। খুলে বলুন সে দিন কী হয়েছিল। আর মাননীয় আদালত। আপনি এই অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষকে বসে আদালতের সামনে কথা বলার সুযোগ দিয়ে উদারতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। পৃথিবীর আদলতগুলির ইতিহাসে এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।”

বরকত উল্লা: “আমরা সোনিয়ারে নিতে আইছিলাম। তারপর ওইডাই দেখলাম। উনি আমাদের বাসা থেকে বাইর কইরা দিছে। এই দেহেন। এখনওই রাইখা দিসি। এই দুই বান্ডিল টেহা। উনি আমারে এইডা দিয়া বিদায় করছে।’

উকিল: “এখানে কত টাকা আছে?”

বরকত উল্লা: “আমি কেমনে জানমু। আমি গুনি নাই। হারামের টেয়া।”

উকিল: “মহামান্য আদালত। জনাব বরকত উল্লা এই টাকা আদালতে জমা দিতে চান। আপনি পুলিশকে আদেশ করলে তাঁরা টাকাটা জমা নেবেন।”

বিচারক: “আদেশ প্রদান করা হল।”

উকিল: “আপনি সোনিয়ার মা?”

সোনিয়ার মা: “জি। আমার নাম বুলু বেগম।”

উকিল: “আপনি কি জানেন আপনার স্বামী থেকে আপনার বয়সের পার্থক্য কত?”

বুলু বেগম: “উনি এখন আর আমার স্বামী না। বেগানা পুরুষ।”

উকিল: “জনাব বরকত উল্লা কি সোনিয়ার বাবা?”

বুলু বেগম: “এইডারও কি প্রমাণ লাগব?”

উকিল: “মহামান্য আদালতের সামনে প্রমাণ ছাড়া কোনও কথা বললে শাস্তি হয়।”

বুলু বেগম: “সোনিয়ার ভাই দেইখা ফেলাইচে। ওনার আগের ঘরের সন্তান। হে হইল গিয়া প্রমাণ। হে এহানে নাই।”

উকিল: “মহামান্য আদালত। আমি মনে করি না গ্রামে থাকলে কেউ সরল হয়। গ্রামের মানুষ ভিলেজ পলিটিক্স করে। আবার কেউ শহরে থাকলে জটিল মানুষ হয়, তাও আমি বিশ্বাস করি না। আমি প্রত্যেক মানুষকে, যে যেমন, তেমন করে তাকে দেখতে চাই। আমি মনে মনে অগ্রিম কোনও ধারণা পোষণ করে রাখি না। আমার মক্কেল রাশেদ রহমান খান শহরের মানুষ। কিন্তু তিনি এক জন সরল মানুষ। আর আজ ঘটনাচক্রে গ্রামের একটা সহজসরল পরিবারের সাথে আমাদের দেখা হল। এই আদালতে উপস্থিত সবাইকে আজ আমি এ কথা বলে রাখতে চাই। আপনারা যদি জীবনে একট সহজসরল মানুষ দেখতে চান, তা হলে আমাদের এই বোনটাকে দেখুন। আমাদের এই বোন, বুলু বেগম, কোনও প্যাঁচ বোঝেন না। ওনার সারল্যে আমি কাঁদতাম। কিন্তু আমি তা করতে পারছি না। কারণ তিনি আমার মক্কেলের পক্ষের সাক্ষী। সত্য কথা বলার সাক্ষী। আমরা দেখেছি আদালতে যারা সত্য সাক্ষ্য দেন তারাও মারপ্যাচ দিয়ে কথা বলেন। আমাদের বোন বুলু বেগমের সেই ক্ষমতাও নাই। এতক্ষণে শুধু মহামান্য আদালতই নন, আমার বিশ্বাস উপস্থিত সকল মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ, আমাদের স্বাধীন গণমাধ্যমের ভাইবোন, সবাই, আদালতের কর্মকর্তাকর্মচারিবৃন্দ, সবাই, আমার সাথে এক মত হবেন, যে, আমার বোন বুলু বেগমের মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের হবে না। বোন বুলু বেগম, আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনাকে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছি আপনার সততা আর সারল্য প্রমাণের জন্য। আমি প্রথম দিনই বুঝেছিলাম আপনি কতটা সরল মানুষ। এটা আমাদের, মানে উকিলদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদেরকে মাঝে মাঝে কিছু অপ্রিয় সত্য প্রশ্ন করতে হয়, মানুষের প্রকৃতি প্রমাণের জন্য। আমরা তখন বুঝতে পারি সেই ব্যক্তি সরল না কূটিল। বোন বুলু বেগম, আপনি নিশ্চয়ই কাল কেয়ামতের দিন এ জন্য আমাকে সৃষ্টিকর্তার সামনে লজ্জিত করবেন না। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি আমার বোন না হলেও বোনের চেয়ে বড়। আমার বোন বা মা বা স্ত্রী কপটতা আর মিথ্যার আশ্রয় নিতে জানে। আপনি তা জানেন না। আপনার মধ্যে আজ আমরা সকলে এক জন খাঁটি সরল সত্যবাদী মানুষে দেখা পেলাম। বোন বুলু বেগম, এখন আপনি বলুন, কী হয়েছিল সেই রাতে?”

বুলু বেগম: “আমি জানের বয়ে পলাইছি। আর কুনু সময় ঢাহা শহর আইবার চাইনাই। আমাগো কপাল খারাপ। আপনেরা আমাদের ছাইরা দেন।”

উকিল: “বোন বুলু বেগম, আপনি কাঁদছেন কেন?”

বুলু বেগম: “ডর করে, অনেক ডর করে।”

উকিল: “ডরের কিছু নাই, বোন বুলু বেগম। আপনি বলুন। মহামান্য আদালত দেখছেন। তিনি আপনার নিরাপত্তা বিধান করবেন। আমাদের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের কোনও ক্ষমতা নাই বিচারকের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার। আপনি বলুন, আমার প্রিয় বোন।”

বিচারক: “নিরাপত্তাহীনতার কথা কেন আসছে? আসামীতো নিজের জন্য উকিলও নিয়োগ করেনি। সরকারি উকিলও সে গ্রহণ করেনি। তার ভাই তার বিবাদী। ভাইয়ের পক্ষে লোক আছে। আসামীর পক্ষে কেউতো নাই।”

উকিল: "মাননীয় আদালত। এটা ম্যাডাম শিশিরকণা খানের কৌশল। রাজ্জাক শাবানা ববিতা আলমগীর ফেল। মনির-খুকুর কথাও এত আলোচিত হয়নি। পত্রপত্রিকা আর ইন্টারনেট খুললে শিশিরকণা আর শিশিরকণা। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির খবর নাই। শিশিরকণার এত ছবি কোথা থেকে আসে, মহামহিম, কোথা থেকে আসে? তিনি নাকি এই দেশের বিচারব্যবস্থাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। অক্রিয় প্রতিরোধে তিনি নাকি বিশ্বকে জয় করবেন। মহাত্মা গান্ধী নাকি এই পথে যথেষ্ট করতে পারেননি। মহামান্য আদালত, আপনার সুনাম রাবেয়া বসরির চেয়ে বেশি। আপনিই বলুন হাল-অবস্থার কথা। আমি শিশিরকণা খান ম্যাডামের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে চাই না। আমি আদালতে দাঁড়িয়ে কোনওদিন অযৌক্তিক আর কুরুচিপূর্ণ কথা বলি নাই। আর কেনই বা বলব। আমার মক্কেল রাশেদ রহমান চৌধুরী বোনের বিচার চান সত্যি, কিন্তু তিনি সারা রাত ধরে বোনের জন্য কাঁদেন। এই যে দেখুন, তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। আমরা তার বেদনা বোঝার চেষ্টা করি, মহামান্য আদালত। এই মানবিক দৃশ্য আমরা কবে কোথায় দেখেছি? যিনি ন্যায়বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে অটল। আবার বোনের বিপদে পৃথিবীর যে কোনও ভাইয়ের চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। এখানে একটা মানবিক দিক আছে, মহামহিম। মানবিক দিক। তাই আমি শিশিরকণা খানের কৌশলের কথা কিছু বলতে চাই না। তা ছাড়া তিনি এক জন বনেদি পরিবারের মানুষ। তাঁর ভাই রাশেদ চৌধুরী আমাকে সব খুলে বলেছেন কী করে এই পরিবারটা আজ প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। সে সব কথা আমি বলব না। কারণ আমি শিশিরকণা ম্যাডামের বিরুদ্ধে কোনও বিষোদগার করতে চাই না। সেটা আমার পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে নাই। আর আমি জীবনে স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও নারীর হাত ধরিনি। কারও চোখের দিকেও তাকাইনি, মহামান্য আদালত। শিশিরকণা ম্যাডাম একটা উকিল থেকে আর কী পেতে পারতেন? সত্যকেতো আর মিথ্যা বানিয়ে ফেলতে পারতেন না? মহামান্য আদালত, আপনার সামনে কেউ কি কখনও তা পেরেছে? পারেনি। নিজের পক্ষে কোনও উকিল নিয়োগ না দিয়ে শিশিরকণা খান আজ দেশের হিরো বনে গেছেন। রাশেদ সাহেবের পক্ষে আর কয়জন আছে? সারা দেশ এখন শিশিরকণা ম্যাডামের পক্ষে। এ অবস্থায় সাক্ষীদের অনিরাপদ বোধ করা কি স্বাভাবিক নয়? এই দেশে এখনও গ্রামে গ্রামে বাকের ভাইয়ের কুলখানি হয়। বদির কুশপুত্তলিকা জ্বলে। ক্রিকেটের একটা তৃতীয় শ্রেণির টুর্নামেন্ট জিতলে এই দেশের মানুষ রং মারামারি করে শহরে রঙের বন্যা বইয়ে দেয়। প্রতিবার রং মারামারিতে রং গলায় ঢুকে আট দশ জন লোক মারা যায়। আমরা কি জানি না, মহামান্য আদালত, আমাদের এই জাতির আবেগ কত গভীর? আবেগে কি আমরা বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন নই, মহামান্য আদালত? এই আবেগকে যদি পুঁজি করা যায়, তা হলে এ দেশে আর কী লাগে? আর কী লাগে, মহামান্য আদালত, উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য? শিশিরকণা ম্যাডাম কোনও গুণ্ডা নিয়োগ করেননি। তাই সারা দেশ আজ তার পক্ষে আবেগের আগুনে ফুঁসছে। সারা জাতি আজ শিশিরকণা ম্যাডামের গুণ্ডাতে পরিণত হয়েছে। তবু আমি শিশিরকণা ম্যাডামের বিপক্ষে কোনও কথা বলব না। আমি কথা বলব খুনির বিরুদ্ধে। খুনি যদি উকিল না রাখেন, সরকারি উকিলও প্রত্যাখ্যান করেন, আর তা যদি তাঁর ক্ষমা পেয়ে যাওয়ার কৌশল হয়ে যায়, ভবিষ্যতে এই রাষ্ট্রে খুনিদের রাজত্ব চলবে, মহামহিম। আপনি আমার কথা বিবেচনা করে দেখুন। যদি আমার কথায় যুক্তি না থাকে, আপনি আমাকে বের করে দিন। আর আমার কথায় যুক্তি থাকলে একটা কিছু করুন। মহামান্য আদালত, একটা কিছু করুন। রাশেদ সাহেব, এ দেশের সকল মায়ের এক সুপুত্রের প্রতিনিধি। তিনি পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছেন এক জন অভাগা সন্তান তার মায়ের খুনের জন্য কীভাবে দিনের পর দিন বিচার চাইতে পারে। এমনকি সেই শাস্তি আপন বোনের বিরুদ্ধে গেলেও, যে বোনের জন্য তিনি রাতের পর রাত কেঁদে কাটিয়ে দেন। মহামহিম, শুধু এই দেশেই নয়, রাশেদ সাহেব যদি ন্যায়বিচার পান, তা সারা পৃথিবীতে আইনের শাসনের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।"

বুলু বেগম: "উকিল সাবের কতা সইত্য। আমরা রাস্তায় বাইর অইতে পারি না। মাইনশে ডিল মারে। আমাদের পাকা পাইখানা নাই। ছনের পাইখানা। পাইখানায় গেলেও মাইনশে ডিল মারে।"

বরকত উল্লা: "আইলের মইদ্যে মাইনশে ডিল মারে। গাঙের মদ্যে ডিল মারে। চায়ের দোকানে ডিল মারে। আমরা অহন যামু কই?"

বিচারক: "এই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ প্রদান করছি। আদালত পুলিশ আজকেই সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশের কাছে নির্দেশনা পৌঁছে দিবে।"

উকিল: "ভয় নাই ভয় নাই। হবে হবে জয়। আপনাদের আর ভয় নাই। বোন বুলু বেগম, সব কিছু খুলে বলুন। আইন আছে। রাষ্ট্র আছে। আপনাদের কোনও ভয় নাই। জনতা আর আপনাদেরকে আক্রমণ করবে না। মহামান্য আদালত আপনাদের নিরপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমি মহামান্য আদালতকে অনুরোধ করব, এই মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়ার পরও যেন ছয় মাস এই নিরীহ সাক্ষিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে। তারপর নিশ্চয়ই কোনও চিল কোনও না কোনও নাগরিকের কান নিয়ে যাবে। তখন জাতি এই সাক্ষিদের ভুলে চিলের পেছনে দৌড়াবে। তখন এই সত্য কথা বলা পরিবারটির কথা আর কেউ মনে রাখবে না। বোন, বুলু বেগম। এখন আপনি বলুন।"

বুলু বেগম: "আমরা গেরামের মানুষ। সইন্দা রাইতে গুমাইয়া পড়ি। খালাম্মা খানা বেশি দিচিল। খাইয়া আমি গুমাইয়া পড়ি। আমি নরুম বিচানায় গুমাইয়া ছিলাম। দেখি খালাম্মা মাইত্তে মাইত্তে নানিরে বাতরুমে নিয়া যায়। বাতরুমে যেহানে গোছল করে হেয়ানে হোয়াইয়া খালাম্মা নানিরে টোডা চাইপা ধরে। খালাম্মারে নানি লাত্তি দিয়া সরাইতে চায়। খালাম্মা আরও জোরে টোডা চাইপা ধরে। নানি মইরা যায়। খালাম্মা পানি ছাইরা দেয়।"

উকিল: "কোথা থেকে পানি ছাইরা দেয়?"

বুলু বেগম: "ওইহানে তিনডা কল ছিল। খালাম্মা তিনডা কলই ছাইরা দেয়। অহন আমাদের যাইবার দেন।"

উকিল: "মহামান্য আদালত। আমার আর কিছু বলার নাই। তিন বার সুরতহাল হয়েছে এই লাশের। তিনবারই ডাক্তাররা খুনের চিহ্ন পেয়েছেন। আজ এই সাক্ষীদের জবানের পর আমার আর কিছু বলার নাই, মহামান্য আদালত। এই খুনের সত্য উদঘাটনের জন্য আমি অবিরাম পরিশ্রম করেছি। আমি নিজেও প্রথমে বিশ্বাস করিনি, শিশিরকণা ম্যাডাম সত্যি সত্যি তাঁর মাকে খুন করতে পারেন। মহামান্য আদালত, আমাদের প্রতিদিনের জীবনের কোনও কোনও ঘটনা নাটক সিনেমাকে লজ্জা দেয়। এই খুন এমনই একটা ঘটনা। আমি শিশিরকণা ম্যাডামের দুরবস্থার জন্য সমব্যথী। কিন্তু আমিতো খুনের বিচার না চেয়ে পারি না। যদিও বিচার আমি নিজে চাচ্ছি না। আমার মক্কেল বিচার চান। আমি শুধু খুনের ব্যাপারটা প্রমাণ করলাম। এখন সিদ্ধান্ত আপনার, মহামান্য আদালত।"

বিচারক: "শিশিরকণা খান, আপনি কী সাক্ষীদের জেরা করবেন?"

শিশিরকণা: "না ম্যাডাম, আমি কাউকে জেরা করব না।"

উকিল: "মহামান্য আদালত, শিশিরকণা খান ম্যাডাম সাক্ষীদের জেরা করবেন না। এটা একটা ভাল কথা। কিন্তু এটা কৌশল মাত্র। মহামান্য আদালত। তিনি জানেন তিনি জেরা করে সত্য চাপা দিতে পারবেন না। এই আদালতে এখন দুশর উপর সাংবাদিক আর ক্যামেরা আছে। এই ঘটনা পত্রিকা, ফেসবুক, ইউটিউবে যাবে। উনি হিরো হবেন। এ কী কঠিন কৌশল, মহামহিম। আমি ছত্রিশ বছর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করি। এমন কৌশল কাউকে কখনও নিতে দেখিনি। সকল অপরাধী নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চান। নিজেকে

নির্দোষ প্রমাণের এমন কৌশল আমরা কী দিয়ে মোকাবেলা করব, মহামহিম। আপনি সুবিচার করবেন। এটাই আমার নিবেদন। মহামহিম, সারা পৃথিবী আজ আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।”

বিচারক: “আদালত মুলতবি ঘোষণা করা হল। আর কারও কিছু বলার না থাকলে আমি পরবর্তী বৈঠকে রায় ঘোষণা করব। আপনাদের আর কারও কিছু বলার থাকলে এখন বলতে পারেন।”

উকিল: “বিজ্ঞ আদালত। আমার আর কিছু বলার নাই। আমি আমার মক্কেলের পক্ষে সুবিচার প্রার্থনা করছি।”

বেয়াল্লিশ

আমার ছবি আমি দেখি। আর দেখে আমার দুই সহকয়েদী: মালতী আর শিউলি। যিনি এই ছবি তুলেছেন তিনি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কোনওদিন হয়তো এই ছবির প্রদর্শনীও হবে। আমার দাঁতের মজবুত গঠন ছবিটাতে স্পষ্ট। আর আমার থুতনির আকর্ষণ। এ ছাড়া বাকি সব জেলের জীবনের প্রভাবে প্রভাবিত। গাল ডুবানো। কপাল লম্বা হয়ে উপরের দিকে ওঠা। মাথার সামনের দিকের চুল পড়ে যাওয়ার কারণে। নাকটাও চেনা যায়। হাতকড়া পরানো হাত আমি এমনভাবে কোমরের পাশে সরিয়ে রেখেছি যেন আমি তা প্রদর্শন করতে লজ্জা পাচ্ছি। মুখমণ্ডলের সব কিছু নিম্নগামী, শুধু চোখ ছাড়া। চোখ ভেসে উঠেছে। আমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মালতী আর শিউলির চোখে জল। আমার জন্য। ছবিটা দেখে আমিও কাঁদতাম। পত্রিকায় ছবিটা প্রকাশের আগে তার উপর কিছু কারুকাজ করা হয়েছে। আমার মাথার তুলি থেকে রক্ত বেয়ে এসে আমার ডান গাল বেয়ে নিচের দিকে আমার গলার উপর পড়ছে। আলকাতরা রঙের রক্তের নানা রকম পাঁচটা স্রোত। একটা নাকের উপর দিয়ে গেছে। দক্ষ শিল্পীর হাত ছবিটাকে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখে আবেগ আটকানো মুশকিল। আমার রূপান্তর। দশ মাস আগে হামিদের ভূত কল্পনা করতে করতে স্নানঘরে ঢুকে মুরানো দ্বীপপুঞ্জের আদি কারিগরদের তৈরি ভেনিশিয়ান কাচের অষ্টভূজ আয়নায় দেখা শিশিরকণা থেকে পত্রিকার পাতায় দেখা নয় মাস হাজতে বাস করা হাতকড়া পরা শিশিরকণা। আপন আলয়ে চৌষট্টি ফুলের সুবাসের মাঝে স্থাপিত দৃষ্টিনন্দন আকারের আর পাছার মাংসের জন্য আয়েশি করে বানানো সিটের সিরামিক ফিক্সারে বসে বসে অতি আরামে এক সের প্রস্রাব করা শিশিরকণা থেকে হাজতের অরক্ষিত পায়খানায় চৌষট্টি নারীর প্রস্রাবের গন্ধের অস্বস্তি থেকে রক্ষা পেতে ছাল ওঠা ছাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত নাক মুখ খিঁচে দুই ইটের ঠ্যাং চেগিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাকুল্যে আধা ছটাক প্রস্রাব করা শিশিরকণা। রূপান্তর যাই হোক, চোখের জল যাতে তৈরি না হয় তার জন্য আমার মন আমি তৈরি করে রেখেছি। পত্রিকার শিরোণামটা ছোট এবং আশাপ্রদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শিশিরকণা খানের মুক্তি সময়ের ব্যাপার। মানসিক রোগী মায়ের আত্মহত্যার সুযোগ নিয়ে চিত্রনায়ক রাশেদের বোনের বিরুদ্ধে করা হত্যা মামলাটি শেষ পর্যন্ত তামাশায় পরিণত হয়েছে। আদালতে ময়মনসিংহ থেকে একটা পরিবারকে হাজির করা হয় সাক্ষী হিসাবে। অতি উচ্চ মানের ওকালতি পরিচালনায় অতি নিম্নমানের নাটক। আগামী বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণা হবে। ধারণা করা হচ্ছে শিশিরকণা খান বেকসুর খালাস পাবে।

এ পর্যন্ত পড়া শেষ হবার পর মালতী আর শিউলি আমাকে জড়িয়ে ধরে। জেলখানার সুগন্ধযুক্ত নারীর আলিঙ্গন। ওদের ভালবাসায় আমি সুখ পাই। আমিও ওদেরকে আমার বুকে টেনে নিই। আর সুখ পাই। অনেক সুখ।

মালতী হিন্দু, অল্প বয়সী। শিউলি মুসলমান, বেশি বয়সী, তবে আমার থেকে ছোট। দু’জনেই গাভিন হও আর বিয়াও সমস্যার কারণে কারারুদ্ধ। জেলে যা কয়জন নারী দেখলাম তাদের বেশির ভাগের অপরাধ

গাভিন হও আর বিয়াও। এদের দেখে কষ্ট লাগে। নারী আর কোনও অপরাধ করতে জানে না। শুধু একটা অপরাধ সে করে: গাভিন হও, বিয়াও! আমাদের গাভিন হও আর বিয়াও এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত যাতে যত্রতত্র গাভিন হও আর বিয়াও সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হয়। এই সমস্যার জন্য আজ মালতী আর শিউলি জেলে। আমার ক্ষেত্রে আদালত পারলে প্রতিদিন এক বার করে বসে। মালতী আর শিউলির আদালতের খবর নাই। মালতীকে আবার নিতে হয় চট্টগ্রামে। গত এক বছরে এক বার নেয়া হয়েছে।

মালতীর জন্ম সাতকানিয়ায়। করিম চাচার এলাকার মানুষ সে। মালতী ওর দুই বছরের মেয়ে সবিতা আর তিন বছরের মেয়ে ছায়াকে বিষ খাইয়েছিল আর ওর স্বামীকেও বিষ খাইয়েছিল আর তারপর সে নিজে বিষ খেয়েছিল। ছায়া আর সবিতা মারা যায়। মালতী আর তার স্বামী বিদ্যাসাগর বেঁচে যায়। মালতি গরিব। ওর গরিব চাষা স্বামী বিদ্যাসাগর ওর মেয়েদের জন্য দুধ কেনে না, চকলেট কেনে না, কৃমির ওষুধ কেনে না; সে দুধ, চকলেট, ক্রিমির ওষুধ কেনে পাশের বাড়ির ভাবি, পরবাসি ইউনুসের স্ত্রী, তহুরার ছেলের জন্য। বিদ্যাসাগর তহুরাকে আদর করে, তহুরার ছেলেকে কোলে নেয়, তহুরার ছেলেকে কোলে নিয়ে ফটো তুলে সেই ফটো তহুরার স্বামীকে পাঠায়, যে কাতারে থাকে। বিদ্যাসাগর মালতীকে মারে। তার দুই মেয়ে ছায়া আর সবিতাকে মারে। বিদ্যাসাগর তহুরার ছেলে আবদুল মবিনকে আদর করে। বিদ্যাসাগর তহুরার বাল কাটে। আর মালতীর বাল লম্বা হতে হতে ওর হাঁটুর কাছে নামে। মালতী এই দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করতে পারে না। সে বিষের আশ্রয় নেয়।

শিউলি ওর শাশুড়িকে জবাই করেছে। তার আগে সে পাঁচ বার গাভিন হয়েছে এবং পাঁচ বাচ্চা বিইয়েছে। শিউলি গাইবান্ধার মেয়ে। আমার এলাকার মানুষ। বলদা মেয়ে। এক সময় আমরা শেখর ভাইকে ধলা গাই বলতাম। এখন দেখি এই পৃথিবীর আসল ধলা গাই এই বলদা মেয়ে শিউলি। আবাল ধলা গাই। পাগলারে আটকানোর জন্য এক দুই বার গাভিন হলেই সে পারত। পাগলা আব্দুল জলিল মণ্ডল রোডস এন্ড হাইওয়ের প্রকৌশলী ছিল। দশ বছরে সে দুই হাজার কোটি টাকা কামিয়েছে। তারপর চাকরি ছেড়ে তাবলিগ ধরেছে। পাগলা আরও দুই ক্ষুদ্র তাবলিগী হুজুর নিয়ে চিল্লায় যায়। পাগলার মা বিয়ের এক বছরের মাথায় শিউলিকে দোষ দিতে থাকে। পাগলার ওসুখ সারে না কেন? মেট্রিক ফেল ধলা গাই শিউলি পাগলার ওসুখ ধরতে পারে না। বিয়ের পর থেকেই পাগলা শিউলির সাথে শোয় না। কেবল মাঝে মাঝে শিউলির উপর চড়াও হয় শিউলিকে গাভিন করার জন্য। আখেরি নবির উম্মত বাড়ানোর জন্য। এ ছাড়া পাগলা আর আসে না। শিউলি ওটাকে কোনও সমস্যা মনে করে না। সমস্যা মনে করে পাগলার মা। এমন ধলা গাই তার পোলাটারে ঠিক করতে পারে না কেন? এটাই পাগলার মার অভিযোগ। পাগলার বাপ নাই। পাগলার মা পোলারে ইঞ্জিনিয়ার বানাইছে ইত্যাদি ইত্যাদি। পাগলা তাবলিগে গিয়ে দুই বাচ্চা তাবলিগী হুজুর জড়ো করার পর থেকে পাগলার মা অনেক বেশি ক্ষেপে যায়। ধলা গাই কেন তার কালো মানিককে বিছানায় তুলতে পারে না। শিউলি বলে, বিছানায় না উঠলে বাচ্চাগুলি কীভাবে হচ্ছে? পাগলার মা বিশ্বাস করে না। এক দিন পাগলা আসে শিউলিকে গাভিন করতে। শিউলি বলে হবে, এক শর্তে, গাভিন করার কাজ পাগলার মার সামনে করতে হবে। এই কথা শুনে পাগলা উল্টে গিয়ে খাট থেকে পড়ে যায়, তার মাথার খুলি ফেটে মেঝে ভেসে যায়। শিউলি ক্ষতস্থান পরীক্ষার জন্য পাগলার মাথায় হাত দে আর দেখে পাগলা নড়ছে না। শিউলি মনে করে পাগলা মরে গেছে। আসলে পাগলা মরেনি। পাগলা মায়ের সামনে স্ত্রীকে গাভিন করার কথা শুনে মূর্ছা গেছে। এর পর আর পাগলা শিউলিকে গাভিন করতে আসেনি। পাগলার মা'র কথা টিকে যায়। বাচ্চাগুলি পাগলার না। ওগুলি পাগলার বুয়েটের বন্ধুদের বাচ্চা। বেকুব পাগলার সব চতুর বন্ধু। তাবলিগের এক একটা চিল্লা দিয়ে এসে পাগলা তার দুই ক্ষুদ্র তাবলিগী ভ্রাতা নিয়ে এক ঘরে থাকে, মেঝেতে চিকন একটা চাদর পেতে গায়ে গা ঘষে এক জায়গায় শোয়, যা তাদের ভ্রাতৃত্বের নিশানা, তারা এক বাসন থেকে খাবার খায়। তারা

তিন জন তাবলিগের পরবর্তী চিল্লা দিতে চলে গেলে পাগলার মা পাগল হয়ে যায়। সব দোষ ধলা গাই শিউলির। ধলা গাই শিউলি পাগলার মার কটু কথা সহ্য করতে পারে না। সে দশ নম্বরি সুঁই আর শক্ত নায়লনের সূতা জোগাড় করে পাগলার মা'র ঠোঁট সেলাই করার জন্য। ধলা গাই শিউলি ঘুমন্ত কালা গাই আতিয়ার ঠোঁটে দশ নম্বরি সুঁই ঢুকায়। আবাল ধলা গাই শিউলি সাবাল কালা গাই আতিয়ার ঠোঁটের ক্ষতি করতে পারে না। সাবাল কালা গাই আতিয়া আবাল ধলা গাই শিউলির চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। আগে ছিল গালাগালি। এবার আবাল ধলা গাই আর সাবাল কালা গাই চুলাচুলি করে। ভদ্র পাগলা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল জলিল মণ্ডল তার দুই ক্ষুদ্র তাবলিগী ভ্রাতা নিয়ে তাবলিগ থেকে ফিরে আসে। চুলাচুলির খবর শুনে ভদ্র ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল জলিল মণ্ডল খবর দিয়ে আরও দুই তাবলিগী ভ্রাতাকে নিয়ে আসে। তারা পিতা পুত্র, পুত্রের বয়স একুশ। এই পুত্রের সাথে শিউলির বারো বছরের মেয়ের বিয়ে দেয়া হয়। তারপর ভদ্র পাগলা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল জলিল মণ্ডল শিউলির চার ছেলে, যার ছোটটার বয়স চার বছর, ক্ষুদ্র দুই তাবলিগী ভ্রাতা, শিউলির মেয়ে, মেয়ের জামাই এবং শ্বশুর, সবাইকে নিয়ে তাবলিগে চলে যায়। ভদ্র পাগলা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল জলিল মণ্ডল বাড়ি থেকে ছেলে মেয়েদের দ্বিনের পথে নিয়ে যাওয়ার মূল কারণ ছিল চুলাচুলির সময় শিউলির চার ছেলে আর মেয়েটা মায়ের পক্ষ নিত, দাদির চুলে তাতে বেশি টান পড়ত। তারপরও সাবাল গাই আতিয়া তার পাঁচ নাতিনাতনির বাড়ি ছাড়া মানতে পারেনি। সে এই ঘটনার পর আরও বেশি পাগল হয়ে যায়। তার একটাই কথা, যদি আবাল ধলা গাই শিউলি তার কালা মানিককে একবার ঢোকাত, এক ফোঁটা দুধ দিত, তা হলে তার ছেলে কুপথ থেকে ফিরে আসত। আবাল ধলা গাই শিউলির কথা: সাবাল কালা গাই আতিয়ার সমস্যাটা কী? ঢোকাঢুকি না থাকাতে শিউলিরতো কোনও সমস্যা হচ্ছে না। এতে সাবাল কালা গাই আতিয়া চূড়ান্তভাবে ক্ষেপে যায়। ছেলের কুপথে থাকার জন্য যে আবাল ধলা গাই শিউলিই দায়ী, তারা কালা মানিক ইঞ্জিনিয়ার যে একেবারেই দায়ী নয়, তা সাবাল কালা গাই আতিয়ার কাছে পরিষ্কার। তার কথা হল জীবনে যে ছেলে এক বারও ঢোকার আনন্দ পায়নি, সে কুপথে থাকলে তাকে দোষ দেয়ার কোনও সুযোগ নাই। ছেলের জন্য তার মনের কষ্ট এত গভীর যে, আতিয়া বলে, মা না হলে সে নিজেই তারা কালা মানিককে এক বার ঢোকাত, এক ফোঁটা দুধ মুখে তুলে দিত। কিন্তু সে তো মা। এত দেখেশুনে এত বাচবিচার করে এত বেশি ধলা গাই এনেও সে ছেলেকে কুপথ থেকে ফেরাতে পারল না। এই দোষ কার? এই অবস্থায় হয় সে বেঁচে থাকবে না হলে তার ছেলেকে ধ্বংস করা আবাল ধলা গাই শিউলি বেঁচে থাকবে। দুই জন এক সাথে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না। নিজের কালা মানিকের কুপথে থাকা সে আর সহ্য করতে পারছে না। এক দিন সাবাল কালা গাই আতিয়ার দুঃখ যখন সবচেয়ে গভীর সে দিন সে চুল টানা আর কিলঘুষি শেষ করে আবাল ধলা গাই শিউলির টুটি চিপে ধরে। কয়েক দিন টুটি চিপা খেয়ে আবাল ধলা গাই শিউলি মনে করে তার পক্ষে এই পীড়ন আর সহ্য করা সম্ভব নয়। সে সাবাল কালা গাই আতিয়াকে ঘুমের মধ্যে দা দিয়ে জবাই করে। এখন আবাল ধলা গাই শিউলির একটাই কথা, তার স্বামীর দোষ যা-ই থাক, কালা মানিক ভদ্র ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল জলিল মণ্ডলের চেয়ে বেশি নরম স্বরে কথা বলার মানুষ এই পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টা নাই।

মালতীর স্বামী গরিব চাষা বিদ্যাসাগর মালতীর নামে আর শিউলির স্বামী শরিয়া ব্যাংকে দুই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা ব্যবসার লভ্যাংশসহ হালাল আড়াই হাজার কোটি টাকার মালিক ভদ্র তাবলিগী হুজুর অবসরপ্রাপ্ত রোডস এন্ড হাইওয়ের প্রকৌশলী আব্দুল জলিল মণ্ডল শিউলির নামে মামলা করে। এখন আর স্বামীরা সেই মামলার খোঁজ নেয় না। আদালতও খোঁজ নেয় না। কেউ খোঁজ নেয় না। এই হল ওদের মামলা দুইটির বর্তমান অবস্থা।

জেলখানায় লাইব্রেরি আছে। লাইব্রেরিতে পত্রিকা আর বই আছে। মেঝে, বইয়ের তাক, পত্রিকার তাক সব পরিষ্কার। আমরা কয়েদিরা পরিষ্কার করি। আমাদের মাটিতে বসে বই আর খবরের কাগজ পড়তে হয়। সাধারণ কয়েদিরা কেউ বই পড়তে আসে না। ডিভিশনপ্রাপ্ত কয়েদিরা নিজেদের ঘরে বই নিয়ে যায়।

সেখানে তারা বই পড়ে। কেউ কেউ বই লেখেও। বাংলা ভাষার সেরা আত্মজীবনী কারাগারে লেখা হয়েছে। যে লিখেছে সে তা প্রকাশ করেনি। তার মেয়ে প্রকাশ করেছে। নাম: অসমাপ্ত আত্মজীবনী। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালির অসমাপ্ত আত্মজীবনী। তা হলে কী প্রমাণ হল? যে ভাল কিছু করতে পারে, সে ভাল কিছু লিখতেও পারে। দুটোর সাথেই চিন্তার শৃঙ্খলা জড়িত। যে লিখতে পারে না, সে পৃথিবীর কোনও বড় কাজ করতে পারে না। তাই বলে সবাই লেখে, তা নয়। যেমন, আমি লিখি না। আমরা না লিখলেও লিখতে পারতাম, ব্যাপারটা এ রকম আর কি। আমি, মালতী আর শিউলি মেঝেতে পাছা বিছিয়ে দিয়ে পত্রিকার খবরটার বাকি অংশ পড়ি।

আমার কাছে পত্রিকার খবরটি যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়। সোনিয়া আর ওর মা-বাবার সাক্ষীর কথা ভেবে মনে মনে আমিও অনেক হেসেছি। অতি নিম্নমানের নাটক। আমার কাছেও তা-ই মনে হয়েছে। রিপোর্টটা অনেক বড়। শেষের দিকে রাশেদকে মানসিক রোগী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আমার পেছনের জীবনের অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে। আমার জন্মপরিচিতি। আমার দ্বিতীয় স্বামী, আজন্ম হৃদ্‌রোগী, হামিদুল হক চৌধুরীর অকাল মৃত্যু। আমার প্রথম স্বামী জহিরের অন্তর্ধান: যা রিপোর্টে জানা যায় বলে লিখেছে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা। আমার ছাত্রছাত্রীদের মানব বন্ধন। যার নেতৃত্ব দিয়েছেন অধ্যাপক এম. জে. উমর আকবর, যিনি আমাদের চেয়ারম্যান স্যার, আর তাঁর স্ত্রী, সহযোগী অধ্যাপিকা তানিয়া মনসুর। যা হোক। তানিয়া শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছে। চেয়ারম্যান স্যারও নিশ্চয়ই ভাল হয়ে গেছেন। দুজনের জন্য হৃদয়ে শুভেচ্ছা আর প্রীতি আর ভালবাসার একটা ঢেউ খেলে গেল। মানববন্ধনে তাঁরা অনেক শিক্ষক ও ছাত্র একত্র করেছেন।

উক্ত বৃহস্পতিবার মাননীয় বিচারক এজলাসে বসে আমার সামনে তাঁর সংক্ষিপ্ত রায় পড়ে শোনান:

আসামী মোসাম্মত শিশিরকণা খান, পিতা শামসুর রহমান খান, মাতা মরিয়ম বেগম খান, তাঁহার মাতা মরিয়ম বেগম খানকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিয়াছেন বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা এই মামলার বিভিন্ন পর্যায়ে, এবং চূড়ান্তভাবে তিন জন সাক্ষীর জবানিতে, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বন্দি অবস্থায় শিশিরকণা খান ভাল আচরণ করিয়াছেন। তিনি আদালতে নিজের পক্ষ লইতে কোনও অবস্থান গ্রহণ করিয়া থাকেন নাই। তিনি কোনও উকিলের সাহায্যও গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া ছিলেন। এমনকি তিনি অভিযোগ অস্বীকার করিয়াও কোনও জবানবন্দি বা বিবৃতি প্রদান করা হইতে বিরত থাকিয়াছেন। এই বিষয়ের ভাল এবং মন্দ দুইটি দিকই রহিয়াছে। শিশিরকণা খান অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী আচরণের মধ্যে অনুকম্পা পাইবার উপযুক্ত অনেক উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে। তথাপিও হত্যার শিকার মরিয়ম বেগম খান এক জন মানসিক রোগী ছিলেন বিধায় এ খুনের সংঘটনকারী মোসাম্মত শিশিরকণা খানের জন্য সেই সকল অনুকম্পা প্রদর্শণ এই আদালতের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। অত্র আদালত আসামী শিশিরকণা খানকে কার্যবিধি ৩০২ ধারা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিতেছে। আদালত তাহাকে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া রাখিয়া মৃতুদণ্ড কার্যকর করিবার নিমিত্তে নির্দেশ প্রদান করিতেছে। মামলাটির ডেথ রেফারেন্স কেইস হিসাবে শুনানীর জন্য মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনে প্রেরণ করা হইতেছে। আসামী মোসাম্মত শিশিরকণা খান যথারীতি এই রায়ের বিরুদ্ধে আইন ও বিধি অনুযায়ী আপিল করিবার সকল সুযোগ ও অধিকার প্রাপ্য হইবেন।

তেতাল্লিশ

সূর্য ডোবার কিছু পরে এক জন মহিলা ও দুই জন পুরুষ পুলিশ আমাকে মৃত্যু-কক্ষে নিয়ে আসেন। আমার সাথে কক্ষের ভেতর শুধু মহিলা পুলিশটা ঢোকেন। তিনি আমার চোখে চোখ রাখেন। লজ্জায় আমি একটু কাঁপি। তারপর তার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে আমি পেছনের দিকে দেখি, খুঁজি বসার জন্য কিছু আছে কি না। এ ভুল করা আমার কথা নয়। আমি দশ মাস জেলে আছি। তবু আশৈশব অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারিনি। না, ফাঁসির সেলে মেঝে ছাড়া আমার জন্য বসার আর কোনও ব্যবস্থা নাই। পুলিশ ম্যাডাম নরম করে আমার হাত ধরেন। তারপর যত্ন করে আমার বাম হাত থেকে হাতকড়াটা খোলেন। আমার হাতে লাল দাগ পড়ে গেছে। তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে তা হালকা করে ডলে দেন। থালাবাসন ধোয়ার সাবানের অত্যাচারে রুক্ষ আঙ্গুল। ডলাটায় দাগে আরাম না পেলেও মনে আরাম পেলাম। বুঝতে পারি পুরুষ দুই জন বাইরে অপেক্ষা করছেন। মহিলাটা মেঝে থেকে তুলে আমার হাতে একটা পলিথিনের প্যাকেট দেন। পাঁচ-ছয়টা ট্যাপের টুকরা দিয়ে ওটার মুখ আঁটকানো। তিনি প্যাকেটটা আমার হাত থেকে নেন, যত্ন করে একটা ট্যাপ আলগা করেন, আর একটা ট্যাপ আলগা করার চেষ্টা করেন, তারপর তিনি দুই হাত দিয়ে দুই দিকে টেনে প্যাকেটটার মুখ ছিঁড়ে ফেলেন। তিনি ছেঁড়া প্যাকেটের ভেতর থেকে ভাঁজ করা দুটো কাপড় বের করে দুই হাতে তাদের আলাদা করে ধরে আমার দিকে বাড়িয়ে দেন। শাড়ি, তিনি বলেন।

“আপা, আমি চলে গেলেও পরতে পারেন,” তিনি বলেন। “রাতের মধ্যে পরলেই হল।”

“একটু বসুন,” আমি বলি। আমার চোখ যায় মেঝের উপর। তারপর আমি বলি, “একটু অপেক্ষা করুন।”

আমার পরনের শাড়িটা রাশেদ আমাকে দিয়েছিল, সে দিন, যে দিন প্রথম আদালতে আসি। এক টান, দুই টান, তিন টানে আমি শাড়িটা খুলে ফেলি, আর দুই হাত থেকে তা মেঝেতে ছেড়ে দিই। সায়া আর ব্লাউজও যে খুলতে হবে তা বুঝি। তারপর নিজ দেহের অবস্থা বিবেচনা করে পুলিশটার উপস্থিতি আমাকে আড়ষ্ট করে। নারী পুলিশ বলেন আগামী কাল জেলখানার সায়া ব্লাউজ পাওয়া যাবে। তিনি নিজে তার বন্দোবস্ত করবেন। আমার সমস্যা নাই, আমি বলি। আমি শুধু শাড়িটা পরে থাকতে পারি। সায়া আর ব্লাউজ ছাড়াই। কিন্তু ওগুলি খুলব কী করে? অস্বস্তির জ্বালায় পুলিশকে তিন গোছা চুল দেখাতে আমি অক্ষম।

“আপনি যান,” আমি বলি। “আমি পরে নেব। আপনি আমার শাড়িটা নিয়ে যান।”

“শাড়িটা রাখতে পারেন, আপা,” পুলিশ বলেন। “শুধু না পরলেই হল।”

“ঠিক আছে,” আমি বলি।

“খানা যে বিলি হয়ে গেছে,” পুলিশ বলেন।

“গাড়িতে আমাকে খাবার দেয়া হয়েছে, আপা,” আমি বলি। “আমার রাতে আর খাবার লাগবে না।”

আদালত থেকে আসার পথে পুলিশ ভ্যানে আমি আর আমার পাহারাদার পাঁচ পুলিশ ও পুলিশ ড্রাইভার সবাই দুইটা করে সাগর কলা আর দুইটা করে বনরুটি খেয়েছি। আধা-পাকা সাগর কলা খেয়ে গলা চুলকেছে। সেই চুলকানি হয়তো সেরেও গেছে। হয়তো সারে নাই। না সারারই কথা। তবে এই অবস্থায় তা ধরতে পারছি না।

পুলিশটা দাঁড়িয়ে থাকেন। বুঝতে পারি আমার জন্য তার মায়া লাগছে। কিছু কথা বলে তার মন হালকা করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু আমার কথা বলার মতো মন নাই। আমি তাকে উষ্ণ দৃষ্টি উপহার দেয়ার চেষ্টা করি। তিনি উল্টো দিকে ঘোরেন। কৃতজ্ঞতার সাথে আমি তার পিঠ দেখি। দেখি সবুজ

ইউনিফর্ম। কালো বেল্ট। শার্টের ভেতর মোটা ফিতা তার পাঁজর চেপে ধরে রেখেছে। নারীর বুকের অ্যালবাট্রস। এই চাপ গিয়ে ফুসফুসে লাগে যদিও ফুসফুসের মালিক তা তেমন খেয়াল করে না। আমার ফুসফুস এখন এই চাপ থেকে মুক্ত।

নারী পুলিশ, এক কদম এক কদম করে, কোনও শব্দ না করে, ধীর পদক্ষেপে মৃত্যুকক্ষ থেকে বের হয়ে যায়।

আমি কিছু সময় মেঝের উপর বসে থাকি। দুই হাতের তালু দিয়ে মেঝেটা পরীক্ষা করি, অনুভব করি। ঠাণ্ডা মেঝে। তবে পরিষ্কার। আমি উঠে দাঁড়াই। সায়া আর ব্লাউজ খুলি। তারপর নীল ডোরাকাটা সাদা কাপড়টা গায়ে জড়াই। মাড় দেয়া নতুন কাপড়। চামড়ায় খোঁচা দেয়। কিছু সময় সামনের অংশটা সুন্নত করানো ছেলেদের লুঙ্গির মতো টেনে ধরে রাখি। তারপর তাকটার দিকে হাত বাড়াই। এক খণ্ড কাঠ দেয়ালে গেঁথে তাক বানানো হয়েছে। ওটাতে দুটি কম্বল আছে। বালিশ নাই।

আমি একটা কম্বল টেনে নামাই আর তা মেঝেতে বিছিয়ে দিই। আমার তলপেটে কোনও চাপ নাই। আদালতে জলবিয়োগের কাজ সেরে এসেছি। আমি বিছানো কম্বলের উপর শুয়ে পড়ি।

প্রকোষ্ঠটিতে ঢুকেই মনে হয়েছিল আমি ফাঁসির মঞ্চে আরোহন করেছি। এখন, আমি যখন একা, মনে হচ্ছে মৃত্যুর ভারী বাতাস আমার গায়ে বাড়ি দিচ্ছে। বাইরে থেকে পাহারাদারের পায়ের আওয়াজ পাই। তারপর লোহার কপাটের খটখট শব্দ অনুজ্জ্বল বারান্দা জুড়ে প্রতিধ্বনি তোলে। শব্দগুলি আমার হৃৎপিণ্ডকে বাড়ি দিয়ে দিয়ে আমার হৃৎস্পন্দনকে আন্দোলিত করে। মৃত্যুর বাতাসে দেয়ালগুলির আর্দ্রতা আর ক্ষয়ের গন্ধের সাথে মিশে আছে ডেটল আর হারপিকের গন্ধ। আরও কিছু গন্ধ বাতাসে আছে। ওগুলি নিয়ে এখন মাথা না ঘামাই। এক সময় সেগুলো মেনে নেয়ার সময় আসবে। ততক্ষণ তা মনের বাইরে রাখতে চাই।

এই কক্ষে আসার আগে এর অনুভব বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কল্পনা করা কঠিন ছিল মৃত্যুর শূন্য আর নির্মম প্রকোষ্ঠ আমার জন্য উলঙ্গ বাস্তবতা নিয়ে অপেক্ষ করে ছিল। অসহায়ভাবে লক্ষ করি এর ঠাণ্ডা আর নির্জীব দেয়ালগুলি আমার দিকে অগ্রসর হয়। আমি কম্বলটার দুই মাথা দিয়ে আমাকে ঢাকার চেষ্টা করি। কিন্তু তা নারীর আবরণ হয় না। আমাদের পরিবারে নারীর পোশাকের বোতাম আর চেইন সব কিছু পেছনে থাকে। সামনেও কিছু আছে। কিন্তু আমি নিজেই বোতাম আর চেইন খোলা আর বন্ধ করা ইত্যাদি সব পিঠের উপর করতে অভ্যস্ত। তাই একটু অস্বস্তি লাগছে। আমি তা কাটিয়ে ওঠার জন্য নিজেকে বলি, কম্বলটা এখন আমার আপন। আগেও কারও না কারও আপন ছিল। তাদের কারও না কারও প্রাণ হয়তো ফাঁসিতে কাটা পড়েছে। আমার বুকের উপর সিলিংয়ে লটকানো ঢাকনাবিহীন বিদ্যুৎ বাল্ব। তার মিটিমিটি করে জ্বলা আলোর ছায়া চল্লা ওঠা দেয়ালগুলির উপর ঢেউয়ের মতো নাচে। একটা কন্ডেম সেলের ভেতরটা বাহির থেকে যে পরিমাণ বিচ্ছিন্ন, এই চরাচরে আর কোনও দুটি জিনিস একে অপর থেকে এত বিচ্ছিন্ন নয়।

ঘরটার নিস্তব্ধতা আমার কানে তালা ঝুলিয়ে রেখেছে। নীরবতা কাকে বলে জীবনে আগে কখনও বুঝতেই পারিনি। কানের কাছে শোঁশা কিছু বাজেনি এমন সময় আমি কখনও পার করিনি। জেলখানার সাধারণ সেলগুলিতেতো নয়ই। আমি এই নীরবতার সাথে পরিচিত ছিলাম না। এই ঘন নীরবতা আমার ভেতরে সাগর কিনারের বড় বড় পাথরের মতো জড়ো হয়, আর আমার দেহের রক্ত সাগরের পানির মতো তাদের শক্ত কাঠামোয় জোরে জোরে আছাড় খায়। সময় টিক টিক করে ঝরে, খেজুর গাছের রসের মতো, আমার বুকের ঢিপ-ঢিপ আওয়াজের মতো। আমার এত দিনের এত আধ্যাত্মিক চর্চা কোনও কাজে লাগছে না। বাধ্য হয়ে আমি ভয়কে স্বীকার করি। নিজেকে আবার শিশু মনে হয়, যার পাছায় চিমটি পড়েনি, যার বুক

ভাইবেরাদর খামচে ধরেনি, যার আপন পথে কেউ আঙ্গুল ঢুকানোর চেষ্টা করেনি; মনে হয় আমি কুমারী, যার বিবাহদেবতা অক্ষত, ছিনালিপনা এখনও যার আচরণ কলুষিত করেনি, যে স্ট্রোক করা স্বামীর নাকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেনি, যে মা'র লাশ টেনে বিছানায় আনেনি, যে শৈশবে ছোট ভাইয়ের সাথে স্বামী-স্ত্রী খেলা খেলেনি, যে এই প্রকোষ্ঠে ঢোকার আগে কুকুরের ডাক শুনেনি, সাপেড় গড়ানি দেখেনি, আগুনে পতঙ্গের উড়ন দেখেনি, টিভিতে ইন্দিরা গান্ধীর মুখাগ্নি দেখেনি, যে পত্রিকায় রাজিব গান্ধির দুই টুকরা ছবি দেখেনি, যে আগুন লাগা রথ থেকে ছিটকে পড়া জ্বলন্ত মানুষ দেখেনি, যে ঢাকার জনতার ছিনতাইকারিকে পিটিয়ে মেরে ফেলা দেখেনি, যে ধান ক্ষেতে লাফ দেয়া বাস থেকে বের করা বত্রিশটা লাশের সারি দেখেনি, যে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিট ভ্রমণ করেনি, যে হাঙরের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনেনি, যে কুমিরের চোয়াল দেখেনি, যার চোখের সাথে বাঘের চোখের মিলন ঘটেনি।

বাতাসের ওজনে হতাশা আর ভয়ের উপাদান। যা আমার বুককে সে ভাবে শক্ত করে রাখে যে ভাবে প্রসূতির বুক শক্ত করে রাখে তার জন্মদানপথে আটকে যাওয়া আসন্ন নবজাতক। অনুভব করি আমার কপালের উপর জড়ো হওয়া ঘামের ফোঁটা, তারা ফুলতে থাকে, আর ফেটে ফেটে কপালের দুই দিকের দুই রগ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। নিস্তব্ধ কক্ষের ওজন আমার উপর যত চেপে বসে তত পীড়নের আঘাত পাই। যে পীড়ন শুধু নারীকে করা সম্ভব। মৃত্যু-প্রকোষ্ঠের পীড়নের সাথে পুরুষের পীড়ন তুলনা করে লাভ নেই। এই পীড়ন শুধু এক অঙ্গে চালানো নিষ্পেষণ নয়, এ হল প্রতি রোমকূপে হুল ফোটানো, প্রতি কোষে পিস্টনের আঘাত, ত্বকের বাহির থেকে হৃদয়ের কেন্দ্র পর্যন্ত, এ হল প্রতি রোমকূপ থেকে উপচে বের হয়ে আসা বমনোদ্রেককর কামরসের সাগরে ডুবতে থাকা।

তারপরও কান্নাতে আমার লজ্জা। পত্রিকার ওই ছবিটা, সেই শিশিরকণার, যে দাঁড়িয়ে মুতে। সেই ছবি দেখে যখন কাঁদিনি, আজ আর একটু চেষ্টা করলে অবশ্যই আরও বড় অমর্যাদাকর কান্নার হাত থেকে রেহাই পাব। না। আমি কাঁদতে চাই না। আমি সব হজম করতে চাই। আমি বাইরের দিকে কান দিই। রাতপোকার কর্কশ গালি শুনি, দূরে পাহারাদারদের কথাবার্তা শুনি, বন্দিদের কান্নার ডাক শুনি, আল্লাহর দিকে তাক করা ডাক, ভয়ের ডাক। কেউ কবরে যেত চায় না। অথচ যেতে তাদের হবেই। এমন হতাশার কান্না। যেন ফাঁসির আদেশ না হলে কেউ অনন্তকাল বেঁচে থাকে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের কান্নার রোল আমার হৃৎপিণ্ডের ভেতর রক্তের ঘাই হয়ে আঘাত করে। আমার জিভে অনুশোচনার স্বাদ। আমি জানি না আমি কী কারণে অনুশোচনা করছি। রাশেদের মতো ভাইয়ের বোন হওয়ার জন্য? আমি যেমন রাশেদও তেমন। আমরা দুজনেই আমাদের পিতামাতার গাভিন করো গাভিন হও বিয়াও বিয়ানো দেখো এই সূত্রের ফল। এর বেশি কিছু নয়। তবু আমার জিভে উদ্বেগের ধাতব অনুভবের লেপন। অনেক দিন পর আবার আমার শ্বাস অগভীর হয়ে বুকে না পৌঁছে গলায় আছাড় খায়। মৃত্যু-কোঠরের ষড়যন্ত্রে মনে হয় বাতাস থেকে অম্লজান কেটে পড়েছে। পৃথিবীর ভার আমার বুকে চড়ে বসে, পীড়ন-মথিত কোষের সমাহার এই আমিকে দুর্বল মানহীন শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট দেয়।

আমি চালাকি করি আর নির্জীবের মতো পড়ে থাকি। এতে ক্ষণে ক্ষণে বোধের উদয় হয়, আবার ক্ষণে ক্ষণে তা মিলিয়ে যায়। আমি নিঃশ্বাসের উপর মনোযোগ আনার চেষ্টা করি। মনোযোগ ছুটে যায়। তবু তাকে আবার নিঃশ্বাসের উপর টেনে আনি। মন ঘুরে রাশেদের উপর যায়, আমি মনকে নিঃশ্বাসের উপর ফিরিয়ে আনি; মন ঘুরে মায়ের লাশের উপর যায়, আমি মনকে নিঃশ্বাসের উপর ফিরিয়ে আনি; মন ঘুরে আব্বার হেঁচকি ওঠা বুকের উপর যায়, আমি মনকে নিঃশ্বাসের উপর ফিরিয়ে আনি; মন ঘুরে হামিদের গড়াগড়ির উপর যায়, আমি মনকে নিঃশ্বাসের উপর ফিরিয়ে আনি; মন এবার চাতুর্যের আশ্রয় নেয়, সে জহিরের জিভে ভেজানো আঙ্গুলের উপর যায়, আমি তাকে ঘাড়ে ধরে আমার নিঃশ্বাসের উপর ফিরিয়ে আনি।

কয়েক ঘন্টা চেষ্টা করার পর আমি শ্বাসপ্রশ্বাসের পুরো একটি প্রক্রিয়ায় আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করতে সমর্থ হই। তারপর প্রথমে আমার কাঁধের গিটে শিথিলতা অনুভব করি। তারপর বুকের পেশিতে। তারপর পেটে, তারপর দুই পা জুড়ে। মাথায় যখন শিথিলতা অনুভব করি তখন বুঝতে পারি আমার বিজয় হতে চলেছে। একটি মনোযোগপূর্ণ নিঃশ্বাসের চেয়ে শক্তিশালী কিছু হতে পারে না। নতুন করে তা জানতে পারা আমাকে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়। এবার ভেতরের শক্তি আমাকে শান্ত রাখবে। মানুষ যে অল্প অক্সিজেনেও বেঁচে থাকতে পাওে, সে কথা মনে আসে। যখন মানুষের স্নায়ু শান্ত থাকে তখন তার বেশি অক্সিজেন লাগে না। দেহ আমাদের জীবনের মন্দির। দেহ আমাদের সম্পদ। এ সব কথা মনে চলে আসে। মনে আসে দেহ থেকে প্রাণ মহাবিশ্বের সাথে মিলিত হয়। আমি তা বিশ্বাস করি। আমার জীবনের স্বপ্ন মৃত্যুকে ধ্যান করতে করতে মৃত্যুবরণ করব, তা-ও পূরণ হওয়া সম্ভব। প্রয়োজন শুধু বর্তমানে বাস করা। আমি আমার সারা দেহকে অনুভব করি। মাথার তুলি থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। সাফল্যের সাথে।

আমি চোখ বন্ধ করি। আর ভাবি: এ ঘর আমার বর্তমান। এ ঘরে কী আছে যা নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে? কই, কিছুতো নাই। চেয়ার টেবিল নাই, যা মুছতে হবে। খাট নাই, কাজেই উষ্টা খেয়ে আঙ্গুল ভাঙ্গারও সম্ভাবনা নাই। টয়লেট একটা আছে জানি। কিন্তু সে দিকে এখন নজর দিতে চাই না। যখন প্রয়োজন হবে তখন অবশ্যই নজর দেব। এখন প্রয়োজন নাই। নজর দেয়ারও দরকার নাই। ঘরের দেয়ালগুলি তো আমার উদ্বেগের বিষয় নয়। কর্তৃপক্ষ তা দেখবে। আর আছে শূন্যতা। আমি শূন্যতায় মনোযোগ দিই। শূন্যতা আমার উদ্বেগের কারণ নয়। শূন্যতা আমাকে আরও শান্ত করে। শূন্যতাকে মেরামত করার কিছু নাই। শূন্যতা আমার আপন। যা কিছু কিনতে হয় না, যা কিছু হারানোর ভয় নাই, তারা সব আমার আপন। আমি আপনের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করি, পরিপূর্ণ সচেতনতা দিয়ে, আমাকে যারা গ্রহণ করছে তাদের কোনও দোষত্রুটি না ধরে। শূন্যতায় মনোযোগ দিই।

আমার মন চিন্তাশূন্য হয়। আমি আরাম অনুভব করা শুরু করি। সেই আরাম যা দেহ ভেতর থেকে তৈরি করে। নিজে নিজে। যেই আরামের জন্য ঘোড়ায় চড়তে হয় না। আমি বুঝতে পারি মৃত্যু-প্রকোষ্ঠের দেয়ালের ভেতর আমার মধ্যে চলতে থাকা আত্মসমর্পণ আর বিদ্রোহের যুদ্ধের অবসান হয়েছে। আমার আত্মসমর্পণ জয়যুক্ত হয়েছে।

এখন দেয়ালগুলি আমার কাছাকাছি অবস্থান করে। আমার আপন দেয়াল। আমি আরও বেশি শান্তি পাই। আমার দেহের ভেতর। শ্বাসপ্রশ্বাসের শান্ত হয়ে আসা গতিতে আমি সুখটা প্রাণভরে অনুভব করি। যত অনুভব করি, তত দেহে সুখ ছড়িয়ে পড়ে।

এখন আমার দেহ হালকা। মন হালকা। অনুভব প্রখর। আমার নাকের অনুভূতি, চোখের অনুভূতি, কানের অনুভূতি, জিভের অনুভূতি, ত্বকের অনুভূতি আগে কখনও এত সজাগ হয়নি। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে গেছে মনে হয়। আমার অজান্তেই তা ঘটে গেছে। অনুভব করি আমার অঙ্কুরের অনুভূতির পশ্চাদগমন, তার শক্তির রূপান্তর, যা শান্তি হয়ে আমার নাকের অনুভব, চোখের অনুভব, কানের অনুভব, ত্বকের অনুভব, জিভের অনুভবে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদির মোটা পোশাকে হাত ঢুকাই। আঙ্গুল দিয়ে সঠিক অঙ্গ স্পর্শ করি। আমি নিশ্চিত হই। আমি আমার আঙ্গুলের গন্ধ নিই, নাই। স্বাদ নিই, নাই। দৈবযোগে প্রাপ্ত সংবাদ। ক্ষয়ের শক্তি গঠনের শান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। স্মিতহাসিতে আমার মুখ প্রসারিত হয়, আমি তা টের পাই। শিশিরকণা, আমি নিজেকে ডাকি। অতি নরম আমার শ্বাসপ্রশ্বাস। সারা জীবন যা অর্জন করতে পারিনি, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পেয়ে আজ তা অর্জন করলাম। শান্ত আলোতে আমার দেহ ভরে ওঠে। মোটা কাপড়ের পরশ আর মোটা লাগে না। আমি হাতপা ছেড়ে দিই। আহারে শান্তি। যা চেয়েছিলাম। জহিরকে যে জায়গায় জড়ো করেছিলাম আজ সেই জায়গা থেকে সে সরে

গেছে। আমার মুক্তির জন্য। মুক্তি আমার মহাবিশ্বে। মহাকাশে মহাকাল মাঝে। মুক্তি আমার আলোয় আলোয়। যেখানে জহির অনেক আগেই চলে গেছে। আমার কামনার কুঁড়ি থেকে আজ জহিরকে ছেড়ে দিলাম। আজ জহিরও হাওয়া। আমিও হাওয়া। আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। এই আকাশে।

আমি হাত পা ছেড়ে দিই। দুই হাত তুলে ধরি। জীবনের সুখতম মিলনের জন্য। মহাবিশ্বের সাথে।

মহামিলন আমাকে ঘুমের দেশে নিয়ে যায়। আমি মহাকাশে মেঘের মতো মহাসুখে ভাসতে থাকি।

চুয়াল্লিশ

তেরো বছর আগে...

কোন বিছানায় আছি, কোন ঘরে আছি, কোন শহরে সে ঘর, কিছুই আমার মাথায় নাই। জহির ছাড়া। সেই ঘরে ঢুকে জহিরকে বুকে নিয়ে কত সময় ছিলাম, তা-ও আমি জানি না। জহির আমার পুরুষ। আমি তাকে অনুভব করি। আমি বোধহীন হয়ে যাওয়া থামাতে চাই। বোধের মধ্যে পরশের সুখ। তখনও আমি নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সচেতনতা ফিরিয়ে আনার কৌশল শিখিনি। আর তখন তার দরকারও ছিল না। কারণ সচেতনতা তখন আমার মধ্যে এমনিতেই ছিল। জহিরকে আমি আরও দৃঢ়ভাবে অনুভব করি। অঙ্গপূর্ণ আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরি। সে আলিঙ্গনে আমাদের প্রতি কোষ অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি কোষ শক্তি তৈরি করে। সেই শক্তিতে ভর করে আমরা অনেক সময় পার করে দিয়েছি। অনেকগুলি ঘন্টাতো হবেই। তাতে আমাদের পায়ে বা হাঁটুতে কোনও ব্যথা হয়নি। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।

"আলো জ্বালাই?" জহির বলে।

আমি মাথা উপর-নীচ করি। আমার কপাল জহিরের বুকে মৃদু মৃদু বাড়ি খায়।

জহিরের বাম হাত আমার পিঠ থেকে উঠে যায়। খট করে একটা শব্দ হয়। ঘর আলোকিত হয়। জহিরের হাত আবার আমার পিঠের দিকের পাঁজরের একটা হাড়কে আলিঙ্গন করে।

আমি ঘরের দৈর্ঘ-প্রস্থ দেখি। আওয়াজটা কোথা থেকে এল তা দেখার চেষ্টা করি। আমার চোখ পড়ে একটা কালো সুইচের উপর, যা হাতের নাগালে, যার হাতল একটা শক্ত স্তনবৃন্তের মতো, যা জাদুঘরে পোড়ামাটির তৈরি উমা দেবীর বুকে দেখেছিলাম।

"খাবে না?" জহির বলে।

"তুমি খাও," আমি বলি।

আমি জানি না, জহির কী খাবে? কোথায় খাবার আছে? কোথায় রান্নাঘর। আলিঙ্গন ছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

"তুমি?" জহির বলে।

"না না, আমার খেতে হবে না," বলে আমি জহিরকে আরও দৃঢ় ভাবে বুকে চেপে ধরি।

পাশেই খাট। একের ভেতর দুই। আমরা খাটে চলে যাই। জীবনে কখনও এত কর্কশ বিছানায় শুইনি। তবু মনে হল বেহেশতে শুয়ে পড়লাম, যেখানে অনন্ত কাল পার করে দিতে চাই। জহির আমার বুকে। সারা রাত জহিরকে আলিঙ্গনে রেখেছি। চার দিন আমরা পালিয়ে বেড়িয়েছি। চার দিন আমরা ফুটপাতের দোকান থেকে, লঞ্চ ঘাটের দোকান থেকে, গ্রামের চা দোকান থেকে, শহরের ভাতের হোটেল থেকে, ভাত আর মাছ আর মাংস, যেখানে যা পেয়েছি, তা খেয়েছি। চার দিন, কোন কোন পরিস্থিতিতে, কোথায় কোথায়, আর কতটুকু শারীরিক পরিচ্ছন্নতা সাধন করতে পেরেছি, তা আমরা ভুলে গেছি। জহির আমার বুকে নাক ডুবায়। আমি ওকে ক্ষুধার কথা মনে করিয়ে দিই। ও বলে ও ক্ষুধা ভুলে গেছে। আমি বলি ওর পুষ্টির দরকার। ও বলে দরকার নাই। অক্সিজেন খাচ্ছি। জহির মুখ দিয়ে নাক দিয়ে অক্সিজেন খায়। দেখলাম আমি ভুল। আমি অক্সিজেন খেয়ে হয়তো কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারি। জহির চব্বিশ ঘন্টা অক্সিজেনের উপর ছিল। আমি তখন খুশি খাই। জহির খায় অক্সিজেন। জহির চব্বিশ ঘন্টা পানি পান করেনি, খাবার গ্রহণ করেনি, বাথরুমেও যায়নি। চব্বিশ ঘন্টা সে আমাকে সুযোগ দিয়েছে তাকে আলিঙ্গন করার। আর আমি তাকে সুযোগ দিয়েছি অক্সিজেন খাওয়ার।

“আমরা জলশুন্যতায় মরে যাব,” আমি বলি।

“মরব না,” জহির বলে।

জহির উঠে গিয়ে আমার জন্য পানি আনে। আমাকে শুইয়ে রেখে ও একটু একটু করে আমাকে পানি পান করায়। পানির গেলাশটা ছিল পিতলের। শীতল গেলাশ। জহির ওটা রেখে আসে। আমি বলি জহির তুমি পানি খাও। জহির বলে, না, অক্সিজেন। এক দিন চলে গিয়ে আর এক রাত এসে গেছে। যে বাতি জহির জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তা সে আবার নিভিয়ে দিয়েছে। জহির আরও দুই ঘন্টা অক্সিজেন খায়। অন্ধকার ঘরে। আমার বুক থেকে মুখ তুলে জহির বলে। চারদিকে তাকাও।

“জানালা খোলা? চাঁদের আলো?” আমি বলি আর বাকরুদ্ধ হয়ে যাই।

জহির বলে, “না, জানালা বন্ধ। আর খুললেও তা দিয়ে কোনও আলো আসবে না।”

“তা হলে আলো কিসের? তোমারতো একটা লাইট। সেটা অফ। কীসের আলো?”

“মোমবাতির,” জহির বলে।

“তামাসা কোরো না,” আমি বলি। “বলো কীসের আলো?”

“সেটা দেখার জন্যইতো তোমাকে ডাকলাম,” জহির বলে।

“কী জ্বালিয়ে রেখেছো, বলো?” আমি অধৈর্য হয়ে বলি।

জহির নরম করে আমার মাথার পেছনের অংশ ওর দুই হাতে নেয়। ওর হাতের নম্রতায় আমার ঘাড় নরম হয়। চাইলে আমি তখন তা একশো আশি ডিগ্রি ঘুরাতে পারি। নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত সামনের দিকে মাথাটা আসার পর জহির তা আরও নরম করে ধরে, যেন আমি ঘাড়ে ব্যথা পাব ও নরম করে না ধরলে, আসলে আমিতো ঘাড়ে ব্যথা পাব না।

“দেখো,” জহির বলে।

লজ্জায় আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। না আবেশে কে জানে? আর আমি তো খুব একটা লাজুক ছিলাম না। আর আমার কৌতূহল খুব বেশি ছিল। আমার চোখ খুলতে তাই দেরি হয়নি।

“অবিশ্বাস্য,” আমি বলি। “তুমি আমাকে হিপনোটাইজড করেছো।”

“আমি হিপনোটাইজেশনের হ-ও জানি না,” জহির বলে।

“তা হলে?”

“তোমার আলো। আমি বের করে এনেছি।”

“কিন্তু কী ভাবে?” আমি বলি। “আমিতো কোনও ছোঁয়াই পাইনি।”

“শুধু ঠোঁটের বাতাসে।”

আমার বুকে জাগ্রত দুটি লাল কন্টকগুল্মফল থেকে বের হওয়া শান্ত গোলাপি আলোতে ঘর ভরে গেছে। আমি আর জহিরকে অবিশ্বাস করতে পারি না। সে প্রমাণ দেখিয়েছে। আমি মুগ্ধ হয়ে টাটকা সাইবেরিয়ান রাসবেরি দুটির দিকে তাকিয়ে থাকে। এ কি সত্যিই আলো? না মরীচিকা? না বিভ্রম? আমি জহিরকে জিজ্ঞেস করি। জহির ওর দুই তালু দিয়ে রাসবেরি দুটি ঢেকে দেয়। ঘর অন্ধকার হয়ে যায়। শুধু জহিরের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যায়।

“এ বার বলো,” জহির বলে। “বিশ্বাস হল?”

জহির তার দুই হাত তুলে নেয়। আবার আলোয় ঘর ভরে। বিদ্যুতের আলো নয়। শান্ত গোলাপি আলো। চাঁদের আলোর চেয়ে মৃদু। জহিরের দুই গালে রাসবেরির আলো প্রতিফলিত হয়। জহির এমন ভাবে তাকায়, ওর দুটি চোখ আর আমার দুটি রাসবেরি ফল মুখোমুখি। কে বেশি উজ্জ্বল, জহিরের চোখ না আমার রাসবেরি? কার দ্যুতি বেশি তা দেখাতে তারা যেন প্রতিযোগিতা করছে। আমার শুধু মনে হল, আহা, দুটি রাসবেরি দিয়ে আমি সারা পৃথিবীর সব পুরুষ পালতে পারি। খুশিতে জহিরের সারা দেহ স্মিত হাসি হাসে। খুশিতে আমার চোখ ভিজে ওঠে।

পঁয়তাল্লিশ

আমি মিলনের আকুলতা প্রকাশ করি। তার আগে জহির আমাকে একটা জিনিস দেখাতে চায়। জহির আমাকে কষ্ট দেয়। আবার ওর দেখানোর আগ্রহ আমাকে আবিষ্ট করে। কী দেখাবে জহির? ভয় নয় তো? আমি একটু কেঁপে উঠি। তারপর আমি নয়ছয় ভাবি। জহির বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

আমি বাথরুমের শব্দ পাই। আধা ঘন্টা আমি শুয়ে শুয়ে জহিরের কথা ভাবি। আধা ঘন্টা পরে জহির সেজেগুজে আমার সামনে আসে। জহির আমার জন্য গোসল করেছে, শেভও করেছে। ব্যাপারটা আমার কাছে ভাল লাগে। জহির লাল পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরেছে। আমার জন্য। আমাকে সে এটা দেখাতে চেয়েছিল। সাধারণ বিষয়। সাধারণ বিষয় বলেই তা বেশি ভাল লাগে। অসাধারণ যা দেখানোর সে তা আগেই দেখিয়ে ফেলেছে। জহিরের সাধারণ জিনিসগুলি দেখলেই আমার ভাল লাগবে। এখন আমি আর কোনও অসাধারণ কিছু দেখতে চাই না। আমি জহিরকে কাছে ডাকি। জহির আসে না। দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি বাম কাত হয়ে শুয়ে জহিরের থেমে যাওয়া দেখি। এতেই আমার ভাল লাগে।

জহির ওর পরনের লাল পাঞ্জাবি খোলার জন্য দুই পকেটের পাশের দুই অংশ টেনে ধরে। টকটকে রঙহীন আলোর এই খুপড়িতে জহিরের পাঞ্জাবির লাল কেমন যেন লাগে। এই লাল পুকুর পাড়ে রোদের আলোয় কালোমেঘের আড়ালে মানাত। তখন আমাদের অনেক শঙ্কা। আমি ভাবছিলাম, আমরা দুজন পুকুর পাড়ে রোদের আলোয় কালোমেঘের কাছে কবে মুক্তভাবে নির্ভয়ে যেতে পারব? আর জহির বুক টান করে দাঁড়ায়। পাঞ্জাবি খুলে ভাতের পাত সামনে নিতে বা বিছানায় ধপাস করে পড়তে কাউকে না কাউকে দেখেছি। কাউকে না কাউকে হাতমুখ ধোয়ার আগে পাঞ্জাবি খুলতেও দেখেছি। পাঞ্জাবি খুলতে গিয়ে এমন মুখভঙ্গি করতে কাউকে দেখিনি। জহিরের দুই গাল লাল। নাকের পাটা ফুলে যায়।

জহির পাঞ্জাবিটা খুলে বিছানার উপর রাখে। ওটা ভাঁজ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। সে দিকে জহিরের খেয়াল নাই। জহিরের পরনে তখন হাফ-হাতার সাদা গেঞ্জি, যেমন গেঞ্জি আমার আব্বা পরত। জহির গলার কাছে ডান হাত এনে ওর গেঞ্জির ভেতর ঢোকায়। আমি ওর কাণ্ড দেখে শক্ত হয়ে যাই। কী করতে যাচ্ছে জহির? আমার চোখ নড়ে না। জহির ওর ডান হাতটা ধীরে ধীরে ওর গলার দিকে টানে। আমার হাতের তালু ভিজে যায়।

জহির ওর ডান হাত আর একটু তোলে। আমি চোখে হাত দিই। আমি ওর কাণ্ডকারখানা দেখতে চাই না। তারও আট বছর আগে চট্টগ্রামে গিয়ে জহির যদি আমাকে ওইভাবে অবাক করতে পারে! এখন, সাত বছর পর, সে কী না করতে পারে? জহিরের সাহস বলতে কিছু নাই। ওটা জহির জানে। তাই প্রেমের জন্য কিছু একটা করে আমার কাছে হিরো হয়ে থাকতে চায়, পাছে দ্রুত ওকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়। আমার আর জহিরের পেছনে যা লেগে আছে তা মূর্খতার শক্তি। মেনে নাও, না হলে কল্লা দাও। এই শক্তিকে মানুষ এক দিন ধ্বংস করে দেবে। কল্লা কেন দিতে হবে মানুষ তার উত্তর চাইবে। উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হলে কল্লাপ্রত্যাশীর কল্লা যাবে। তত দিন আমরা অসহায়। তাই বুঝি জহির এভাবে শেষ হয়ে যেতে চেয়েছিল, যেহেতু ও জানে পৃথিবীতে ওর টেকার রাস্তা নাই। হামিদ ওর পেছনে লেগেছে। টাকা রোজগার করার সক্ষমতা জহিরের নাই। হামিদের দৈনিক আয় পঞ্চাশ লাখ টাকা। টাকা ছাড়া আমি আর জহির ঢাকা শহরে টিকে থাকতে পারি না। জহিরের হাতটা গেঞ্জির ভেতর থেকে আস্তে আস্তে বের হতে থাকে।

আমি ভাবি আমার দুনিয়া শেষ। কেউ যদি তার হৃৎপিণ্ড ওভাবে বের করে আনে, সে কি আর বেঁচে থাকবে?

জহির প্রেমের জন্য সব পারে। তারপরও এমন কাজ করা! জহির কী করে নিজের হৃৎপিণ্ড খুলে আনবে? ও নিশ্চয়ই কাউকে দিয়ে ওটা করিয়েছে। কাকে দিয়ে জহির হাড্ডিমাংস কাটিয়ে সিলাই করিয়ে এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে? এমন ব্যবস্থা করা কি সম্ভব? আমার মাথা কাজ করছিল না। কী করব আমি? চিৎকার করব, না পালাব? কিন্তু কোথায় চিৎকার করব? আমার চার দিকে চারটি দেয়াল। কোথায় পালাব? পালিয়েইতো জহিরের সাথে এখানে এসেছি। ভয়ে কোনও কাজী অফিসেও যেতে পারিনি। বিয়েতো বহু দূরের ব্যাপার। মরে কি আর মরা যায়? আমি আট ফুট বাই আট ফুট কক্ষে আমার চৌহদ্দি সীমিত করেছি। আমিতো জহিরকে সেই চিটাগঙের দিন থেকে চিনে এসেছি। তারপর ওর আর কী প্রমাণ করার দরকার ছিল? না আমি তা চেয়েছি? আমার কাছে আসার জন্য ও তো অডিসিয়াসের চেয়ে বেশি কষ্ট করেছে। তা হলে হৃৎপিণ্ড বের করে আমাকে দিতে হবে কেন? আমি কেঁদে ফেলি।

“চোখ খোলো,” জহির বলে।

আমার সম্বিত ফিরে আসে। তবে আতঙ্ক কাটে না। আমি কাঁপতে থাকি।

জহির আমার হাতে একটা জিনিস ধরিয়ে দেয়। ল্যামিনেটিড করা এক টুকরা কাগজ।

আমি কাগজটা দেখি। আমার কব্জির শিরাউপশিরায় পারদের মতো শিহরণ গড়াগড়ি খায়।

আমার অবস্থা হয় তখন উল্টা। মন চায় ওকে গুলি করে মারি। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আমি উঠে গিয়ে জহিরের বাম গালে থাপ্পড় দিই। হাতে যত শক্তি ছিল সবটুকু প্রয়োগ করি। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার মতো একটা আওয়াজ হয়।

তখন আমার রাগ কমে। আমি দেখি জহিরের চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গেছে। ওর মুখে কোনও সৌন্দর্য নাই, বসে যাওয়া একটা মুখ, ভেজা পাউরুটি যেমন বসে যায়। তারপরও কেমন ভাল লাগল তা বলে বুঝাতে পারব না।

জহিরের স্বাভাবিক হতে ত্রিশ সেকেন্ডও লাগে না। তখন সে স্মিত হাসি হাসে। যেন সে যুদ্ধ জয় করা বীর। আর আমারও রাগ কমে। আর অঙ্গে অঙ্গে জাগে বীরের জন্য শিহরণ।

জিনিসটা ছিল আমার ক্লাশ টেনের একটা খাতার পাতার ছেঁড়া একটা অংশ, ব্যাংকের চেক বইয়ের সমান। আমি আমার হাতের লেখা চিনতে পারি। *যেই সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।* আর কিছু কাটাকাটি। ওটাতে গন্ধ নাই, কোমল স্পর্শ নাই। একটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়া কাগজ মাত্র। শক্ত প্লাস্টিকে মোড়ানো।

আমি খাপবদ্ধ কাগজটা নেড়েচেয়ে দেখি। আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আমি কাগজটা নাকের কাছে ধরি।

“কোনও গন্ধ নাই,” আমি বলি।

“গন্ধ আছে,” জহির বলে। “লেমিনেশনে ঢাকা। তোমার আঙ্গুলের ত্বকের।”

“তা হলে বাঁধাই করলে কেন?”

“সংরক্ষণ করার জন্য।”

আমি জহিরের দিকে চাই। আমি নিশ্চিত আমার চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। কারণ আমি আট বছর আগের লজ্জাটাই পাচ্ছিলাম। জহির আমার দিকে ওর নিরস্ত্র হাসিটা মেলে ধরে। ওর বড় বড় দাঁত দেখা যায়। ও বুঝতে পেরেছে আমার অবস্থা। আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্য সে বলে,

“কাগজের গন্ধ যথেষ্ট ছিল না। অচেনা শহর। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাইনি।”

“জানি,” আমি অস্ফুটে বলি।

আট বছর আগের লজ্জা এখন আর নাই। জহির এমন কাজ করেছিল আট বছর আগে। লজ্জার আগুন আমার সারা দেহে জ্বালিয়েছিল। দুঃসাহসী খেয়াল ওর। আর কখনও কোনও ছেলে এমন করেছিল কি না, আমি জানি না। জহিরকে প্রেমের পথ থেকে টেনে বের করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ তা পারেনি। বাংলা সিনেমার সব কৌশল এর মধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। জহির কোনও নায়কের মতো যুদ্ধ করেনি। কৌশল করেছে। কৌশলে সে জিতে গেছে। জহির আমাকে বাড়ির বার করে ছেড়েছে।

ছেচল্লিশ

আট বছর আগের সেই শীতকাল। রাস্তার দুই পাশে নিম আর জারুল গাছের সারি। ধূসর পথ, ধূসর গাছের কাণ্ড, ধূসর জারুলের শাখা। ধূসর পথের দুই ধারের ঘাস। নিম গাছে পাতা আছে। তারাও ধূসর। চট্টগ্রামে আমার প্রথম শীত। কলেজে রোজিনার সাথে পরিচয়। বড় লোকের মেয়ে। রোজিনার বাবা বন্দরের ব্যবসায়ী, সওদাগর যাদের সাধারণ নাম। আমি দুপুরে বাসা থেকে পেট ভরে খেয়ে গেছি। তারপরও রোজিনার মা আমার পাতে কাতলা মাছের মাথা তুলে দেয়। চওড়া থালায় বসানো ওই মাথার প্রকাণ্ডতায় মনে হয়েছিল, আমি এক ফুট লম্বা সুখকাঠিধারী সুপাত্র। রোজিনার ভাই মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। জাহাজে উঠেছে। পাত্রীর বাজারে আমার কী চাহিদা। পরে জেনেছি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদের জন্য বন্দরে বন্দরে ব্যবস্থা থাকে। জাহাজ থেকে নেমে তাদের সুযোগ থাকে সিলিকন তেলে নরম করা সুখপথে সমুদ্রে পুষ্টিহীন টিনজাত গরুর মাংস খেয়ে তৈরি করা সুখরস পাতলা তাপ সঞ্চালক বর্ষাতির ভেতর ঢেলে দেয়ার। দিনে এক জনের পথে বিশ জন নাবিকের মুষ্ক চাপ নিবারণ। রোজিনার ভাইকে আমার তেমন ছেলে মনে হয়নি। ছেলেটা তখনও পুতুলের মতো ছিল, ঘি-মাখন খাওয়া আর মায়ের বিছানায় ঘুমানো ছেলে, রাশেদের মতো, আর সমুদ্রের রোদে তখনও তার চামড়া পোড়েনি। রোজিনার বাড়িতে আর কখনও যাইনি। আব্বা চাইত না আমরা গাড়িতে বেশি চলাফেরা করি। মানুষ লুজ টক করে। লাটসাহেবদের সন্তানেরা। গাড়ি ছাড়া এক পা নড়ে না। আমার আব্বার এ সব সচেতনতা আমার ভাল লাগত। রোজিনার বাসা থেকে বাড়ি ফিরছি। বাতাসের শীতলতা থেকে কাঠের ধোঁয়া আর তেজপাতা আর এলাচের গন্ধ এসে আমার নাকে লাগে। আমি বাড়ি থেকে দুশ গজ দূরে। এমন সময় নিম গাছের আড়ালে একটা লিকলিকে শরীরের আগায় একটা মাথা হাতে ধরা একটা পলিথিনে ঢোকে, তারপর মাথাটা পলিথিনের থলেটা থেকে বের হয়, তারপর মাথাটা আমার দিকে ঘোরে। আমি আরও কাছে যেতে লিকলিকে শরীরটা গাছের আড়াল থেকে বের হয়। আর আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে:

“আমি জহির।”

“আমি কি করব?” আমি বলি।

আমি ভাবি টাকা দিই। ক্ষুধার্ত বলে হয়তো পলিথিনের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে এক গাল মুরি বা চানাচুর বা কটকটি খেয়ে নিয়েছে। নিশ্চয়ই গিলে ফেলেছে। কারণ তাকে কোনও কিছু চিবাতে দেখছি না। শীতের মধ্যে গায়ে সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট আর পায়ে এক জোড়া বাটা কোম্পানির সেন্ডেল। আর আছে হাতের ওই পলিথিনের ব্যাগ। এ ছাড়া তার কাছে কিছু নাই। আমি সাদা পলিথিনটার দিকে দেখি। মনে হয় ওটার ভেতরে হাওয়াইমিঠাই। মুড়ি, চিরা বা কটকটি নয়। আমি তার গালে হাওয়াইমিঠাইর কণা খুঁজি। একটাও পাই না। কী করে এ ভাবে পলিথিনের ব্যাগটায় মাথা ঢোকানোর পরেও গালে এক কণা হাওয়াইমিঠাই লাগল না, তা ভেবে পাই না। হাওয়াইমিঠাইয়ের পোটলায় মুখ দিয়েতো সরাসরি মঞ্চে ওঠা যায়, আর কোনও মেকআপ না লাগিয়েই। অথচ এই ছেলেকে গাল মুছতেও দেখলাম না। হতে পারে সে বেশ পরিপাটি। সে জানে কী করে হাওয়াইওমিঠাইর ঠোঙ্গায় মুখ ডুবিয়ে গালে হাওয়াইমিঠাইর কণা না লাগিয়ে শুধু মুখ দিয়ে হাওয়াইমিঠাই টেনে নেয়া যায়। এমন শীতে হাওয়াইমিঠাই ছাড়া তার আর কিছু নাই, সোয়েটার নাই, গলায় মাফলার নাই। আমার কাছে টাকা নাই। দুনিয়াব্যাপী নারীর কপাট, বুক আর চুলের প্রতীক হিসাবে হাতব্যাগ বহনের যে ব্যবস্থা, তা তখনও আমার নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়নি। আর আমাদের মেয়েদের যে পোশাক, সালোয়াল আর কামিজ, ওগুলোতে কোনও পকেট নাই। আমার গায়ে সোয়েটার ছিল। সেটাতেও পকেট ছিল না।

“চিনতে পারেননি?”

এক ধাক্কায় আমার পড়ে যাবার অবস্থা। আর তখন আমার কিছুটা আন্দাজ হতে থাকে। আস্তে আস্তে আমার কৌতূহল জাগে। কৌতূহল বাড়তে বাড়তে এক সময় আমি বুঝতে পারি আমার চোখ ব্যথা করছে।

ব্যাপারটা মাথায় ধীরে ধীরে আসছে, কিন্তু মনের মধ্যে আসে নাই। আর আমিও বেশি ভাবার সুযোগ পাই না। লিকলিকে, গায়ে ধূলার আবরণ পড়া ছেলেটা পলিথিন থেকে বের করে আমাকে হাওয়াইমিঠাই দেখায়।

কমলা রঙের একটা লিলেনের সালোয়ার। কদম ফুলের প্রিন্ট, যার রঙ তেজপাতার মতো, যেন শুকানো রক্তের ছাপ। ছেলেটার হাতে ওটা দেখে আমার যা হয় তাকে ওই ঘটনার আগে 'গা ঘিনঘিন করা' বলতাম। সালোয়ারটা আমি খুলনায় পরতাম, যখন আব্বা খুলনার বিভাগীয় কমিশনার ছিল। জিনিসটা যে হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়ে গেছে, এটাই আমি কোনও দিন টের পাইনি। আর তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথাও ছিল না। মাথা ব্যথা হয় জিনিসটা ছেলেটার হাতে দেখে।

আমার মাথায় সত্যি সত্যি ব্যথা শুরু হয়। আর ব্যাপারটা কী যে জঘন্য লাগছিল তখন। নিজেকে আমার নির্যাতিতা নারী মনে হয়। মনে হয় আমি উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর ছেলেটা আমার সালোয়ারটা খুলে ওর বুকের কাছে ধরে আছে। আমার চোখ আপনাআপনি নিচের দিকে নামে। ভাল করে নিজের নিচের অংশ নিজে দেখি। দেখি আমার সবুজ সালোয়ার আমার পরনেই আছে। তারপরও গা ঘিনঘিন যাকে বলি, তা যায় না।

"বের করলাম, যদি আমাকে না চিনতে পারেন?" ছেলেটা বলে।

"ওটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়েছিলে কেন?"

"নিশ্চিত হওয়ার জন্য।"

"কী নিশ্চিত হওয়ার জন্য।"

"এই পথেই আপনি আসা যাওয়া করেন কি না?"

আমার আরও মাথা গরম হয়।

"ওটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে কি আমার আসাযাওয়া দেখা যায়?"

ছেলেটা আমার দিকে তার মলিন মুখ তুলে ধরে। তবে তার মুখে তেমন জড়তা নাই।

"না," ছেলেটা বলে।

আমার মাথা আবার গরম হয়। সে যা করেছে তার জন্য তার গর্দান যাওয়া উচিত, আমার তখন এটাই রায়। আমি চেঁচিয়ে বলি, "তা হলে ওটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে রেখেছিলে কেন?"

"এত বড় শহর," ছেলেটা বলে।

আমি তাকে কথা বলতে দিই না। "এবার কি বলবা এটার মধ্যে মাথা ঢুকালে শহর দেখা যায়?"

"না, গন্ধ পাওয়া যায়।"

আমার মাথা আর ঠিক থাকে না। আমার অপমান বোধ হয়। মনে হয় আমি মুক্তিসংগ্রামে নির্যাতিতা কিশোরী। এর কম কিছু হলে আমি হইচই করার মেয়ে ছিলাম না। ছেলেরা মেয়েদের পিছে শক্ত পুতা নিয়ে ঘুরঘুর করবে, মেয়েদের নখের কোনা, পাছার চিপা, বুকের খাঁজ, বগলের তলা চোখ দিয়ে গেলা থেকে কোনও ছেলেকে পৃথিবীর কোনও শক্তি নিবৃত্ত করতে পারবে না, এগুলি আমি বুঝে গেছি, মেনেও নিয়েছি। কাজেই আমার ধৈর্য ছিল। কিন্তু এই ছেলে আমার ধৈর্যের বাঁধ উপড়ে ফেলেছে। নির্যাতিত বোধ না করলে আমি কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ভাবতাম না। আমাকে তখন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবতে হচ্ছিল। কিন্তু এই মরা ছেলের বিরুদ্ধে আমি কী ব্যবস্থা নেব? আমি নিজে গিয়ে একটা চড় দিলেই সে মাটিতে লুটিয়ে

পড়বে। আমি তা-ই করি। কাছে গিয়ে হাত তুলে সজোরে ছেলেটার গালে থাপ্পড় দিই। ছেলেটা মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

“আর এক মুহূর্ত যদি এখানে তোকে দেখি, তোকে আমি মেরে ফেলার ব্যবস্থা করব।”

সে আমার কথার তেজ বোঝে। আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি না। বাড়ির গেটে থেমে আমি পেছনের দিকে দেখি। ইবলিশের ছানাটা চলে গেছে।

গা ঘিনঘিনরত অবস্থায় আমি গোসলখানায় ঢুকি।

সাতচল্লিশ

কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমি বাড়ির বার বেশি কখনওই হই না। আর কখনও বাড়ির বার হই, অথচ কোনও কোনা-কানা থেকে বের হয়ে ছেলেটা আমার সামনে এসে পড়ে না, এমন কখনও হয় না। কলেজে আসাযাওয়া করি গাড়িতে। তাতে কী? আমি গাড়িতে চড়তে চড়তে তাকে বাড়ির কাছের পথে আম, কাঁঠাল, জামরুল, কড়াই, শিরিষ, কোনও না কোনও গাছের আড়ালে দেখি। আবার গাড়ি থেকে স্কুলের গেটে নামার পর তাকে আমি স্কুলের কোনায় নারকেল গাছের আড়ালে দেখি। শুধু আমি দেখি। আর কেউ দেখে না। জীবনে আমি কখনও জিন-ভূত দেখিনি। তাই এখন দেখছি, তা-ও ভাবতে পারছিলাম না। তাই আমি ছেলেটাকে জিনভূত মনে করার সুযোগ পাইনি। ছেলেটা বাস্তব। তবে এক সময় আমি বুঝি, আমিও চাই না এই জিনভূতকে আর কেউ দেখুক। নিজের লজ্জা নিজে সামলাই। তার হাতে হাওয়াইমিঠাই এক বারই দেখেছিলাম, দ্বিতীয়বার দেখিনি। এ ব্যাপারটাও আমাকে ভাবায়। হাওয়াইমিঠাই না দেখাতে গা ঘিনঘিন করার অজুহাতও আমার গা আর পায়নি।

এক দিন বিকালে আমি বাসা থেকে বের হই। এর মধ্যে দুই-একবার বৃষ্টি হয়ে গেছে। শহরের মধ্যে বইমেলা চলছে। মার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি। বলেছি আমি বইমেলায় যাব। বের হওয়ার সময় আব্বা বাসায়, মা ক্লিনিকে। আব্বা টেলিভিশনে খবর দেখছিল। আমি আব্বাকে বলেছি আমি বইমেলায় যাচ্ছি। আর যার জন্য বাড়ির বার হচ্ছি তাকে যে পাওয়া যাবে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কারণ এর মধ্যে বাড়ির বার হয়ে তাকে দেখিনি, এমন এক দিনও যায় নি। কী করে এই ছেলে? কোথায় থাকে? কোথায় খায়? এ সব জানি না। শুধু জানি বাড়ির বার হলেই তাকে পাওয়া যাবে। আমি গেটের বার হয়েই দাঁড়িয়ে যাই। বুঝি সে এখনই আমার সামনে এসে হাজির হবে।

না, সে আসে না। কতক্ষণ দাঁড়ানোর পর আমি মনে মনে বলি, কোন জমিদারের বাচ্চা সে? যে সে এল না! আমি এ-দিক ও-দিক তাকাই, এমনকি পেছনেও তাকাই। আমার মাথা গরম হতে থাকে। তারপর থপথপ করে আমি সামনের দিকে হাঁটি। উদ্দেশ্য বইমেলা। রিক্সায় চড়ে যাব। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমার পাজামা ভিজে গেছে সেন্ডেলের ছিটানো কাদায়। আমি কখনও এমন করে হাঁটিনি। রাস্তায় যত কাদা হোক আমার হাঁটায় সেন্ডেলের বাড়িতে পাজামায় কাদা লাগে না। তখন আমার মাথার তুলির গরম নেমে দুই গালে ছড়িয়ে পড়েছে। তখনতো কী করে মানসম্পন্ন নিঃশ্বাস নিতে হয়, তা জানতামই না, নিঃশ্বাসে মনোযোগ দিয়ে বুকের ধুকধুকানি নিয়ন্ত্রণে আনা, সে তো অনেক অনুশীলনের ব্যাপার। তারপরও আমি খেয়াল করি নিঃশ্বাসে আমার বুকের ওঠানামা। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। বান্ধবিদের নিয়ে বইমেলায় ঘুরব? না কয়েক জনের চুল ছিঁড়ব?

আমার মাথায় রাগ অনেক। তবে তখনও আমাদের সরকারি বাংলো থেকে খুব বেশি দূর যাইনি। আধা কিলোমিটার হবে কি না তাও সন্দেহ। আমার দাঁত খিঁচে আসে। হতাশায় আমি দাঁড়িয়ে যাই। হাতের মুঠ এত শক্ত হয়ে বন্ধ হয়, কয়েকটা গিরা ভাঙ্গার শব্দ কানে আসে। ওই অবস্থায় আমি ঘুরে উল্টা দিকে হাঁটা ধরি। নিঃশ্বাস তখন আরও ঘন ঘন পড়ে। কোনও দিকে না তাকিয়ে আমি জোরে জোরে হাঁটি। বুঝতে পারি সেন্ডেলের বাড়িতে রাস্তার কাদা মাথার চুলে বাড়ি খাচ্ছে। আমি আরও জোরে জোরে কাদাযুক্ত পথে পদাঘাত করি। পদাঘাত করতে করতে সেই জারুল গাছের নিচে আসি, যে গাছের নিচে সে প্রথম উদয় হয়েছিল। মনে আশা, যদি সে এই গাছের আড়ালে থাকে। না, ওখানে কেউ নাই। আমি শোঁশোঁ করে সামনের দিকে এগোই। তবে আর বেশি যেতে হয় না। আচমকা আমি আমার গতি থামাতে বাধ্য হই। আমাকে এত সহসা থামতে হয় যে শক্তিশালী ভারসাম্যের অধিকারিনী না হলে, আমি পেছনের দিকে পড়ে যেতাম। আমি পড়িনি।

কড়ই গাছের আড়াল থেকে সে আমার সামনে বের হয়ে আসে। তখন আমার নিঃশ্বাস আরও ঘন হয়। বুক আরও জোরে ওঠানামা করে। কুমারীর ভরাট বুক। নতুন জাগা চরের মতো সজীব বুক। রাগের সাথে আসে লজ্জা। গাল গরম হয়। কানের লতি গরম হয়। কানের গোড়া গরম হয়। কোথায় আমার ওড়না? কোথায় আমার সোয়েটারের বোতাম? সে তখন এতটা আমার মুখোমুখি যে, তখন যা যেমনি ছিল তেমনি রাখার চেয়ে ঢাকার চেষ্টায় লজ্জা আরও বেশি হত। আমি সে চেষ্টা করি না।

“আমি সব দেখছিলাম,” সে বলে।

কী শুনলাম? রাগে আমার কান্না চলে আসে। কেউ দেখে ফেলবে এই ভয়ে আমি থামি। না হলে তার উপর চড়ে বসতাম। দেখতাম সে কোন আস্তাবলের ঘোড়া? আসলেতো সে এক রুগ্ন কৃষকায়া উট ছাড়া আর কিছুই নয়। এত কৃষকায়া যে, প্রথম যে দিন তাকে খেয়াল করি, সে দিন হেসে ফেলেছিলাম। এখন গরম অশ্রু চোখ জ্বালাচ্ছে। মনে তখন এই প্রশ্ন আসেনি যে, রুগ্ন আর কৃষকায়া ঘোড়া কী ওর মতো অসাধ্য সাধন করতে পারত? উত্তর ছিল পারত না। কিন্তু আমার মনে তখন সেই প্রশ্ন আসেনি।

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে কলা বাগানের দিকে হাঁটা শুরু করি। সে বুঝে ফেলেছে আমি কী চাইছিলাম। রাস্তায় নয়, তার সাথে আমি কলা বাগানে বোঝাপড়া করতে চাইছিলাম। কলা বাগান বেশি দূরে নয়। তবে তা এক নিভৃত জায়গা। বৃষ্টিতে মরা কলাগাছের মরা আঁশ কাদা তৈরি করেছে। তা আর এমন কী? এর মধ্যে আমার পাজামায় অনেক কাদা লেগেছে।

“আমি সব দেখছিলাম,” সে বলে।

আমার আবার কাঁপন ওঠে।

“আমি সাহস পাইনি।” সে ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করে।

নিশ্চয়ই সে বুঝে গেছে আমি ব্যাখ্যা চাচ্ছি। তার কথার জবাব দেয়ার মতো অবস্থা আমার নাই।

“গেটের অত কাছে যাওয়ার মতো সাহস আমার নাই,” সে বলে। “তারপর আপনি যখন রাস্তা দিয়ে গেলেন, এত রেগে রেগে যাচ্ছিলেন, তখনও আমি গাছের আড়াল থেকে বের হতে সাহস পাইনি। তারপর যখন আপনি আবার ফিরছিলেন, তখন আমি সাহস করে বের হলাম।”

আমার কাঁপন কমে। আমরা অবশ্য কলা বাগানে ঢুকিনি।

গলার মধ্যে বার বার হাওয়াইমিঠাই কথাটা ঘোরে। চোখের সামনে তাতে তার মুখ ডুবানোর দৃশ্যটা স্থিরভাবে ভেসে আছে। আমি হাওয়াইমিঠাই কথাটা কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছিলাম না। তাই

আসল কথা বের হতে সময় লাগে। অনেক কষ্টে আমি গা ঘিনঘিন করা বিষ গলায় ঢেলে, কাঁপতে কাঁপতে, বলি, “আমার সালোয়ার কই?”

সে তার কালো প্যান্টের পার্শ্বজেবে হাত ঢোকায়। আমি তা পর্যবেক্ষণ করি। সে যত্ন করে মুঠিতে নিয়ে ধীরে ধীরে আমার সালোয়ার বের করে। লিলেন কাপড়। সিল্ক হলে আরও ভাল হত। সবচেয়ে ভাল হত মসলিন হলে। বোঝাই যাচ্ছিল না যে সে পকেটে আস্ত একটা সালোয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি এটা আশাও করিনি। আমি শুধু এমনি-এমনি কৌতূহলবশত জিনিসটার খোঁজ নিতে চেয়েছিলাম। কারণ আমি তা জব্দ করতে চাই। এখন বুঝলাম সে এটা পকেটে নিয়েই ঘুরে বেড়ায়। আমার আবার রাগে হাত-পা কাঁপে। রাগের চেয়ে বেশি ওঠে লজ্জা। যেন আমার জীবনের সব লজ্জা ওই সালোয়ারটায় লুকানো। যেমন লুকানো রাক্ষসদের প্রাণ দিঘির পাতালে লুকিয়ে রাখা সিন্দুকে। আমি আর থাকতে পারি না। লাফ দিয়ে তার উপর পড়ি। আমার সালোয়ার উদ্ধারের অভিযানে।

আমি ব্যর্থ হই। আমি তার হাত ধরতে পেরেছিলাম। কিন্তু সে বুঝে ফেলে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলা বাগানের ভেতর দিয়ে তার পালিয়ে যাওয়া দেখি।

আটচল্লিশ

কিছু দিন হাওয়াইমিঠাই চোরের দেখা নাই। আমারও ঘুম নাই। বলতে গেলে জাগরণও নাই। আছে শুধু হাওয়াইমিঠাই চোর। মাথার ভেতরে। চোখের সামনে। চোখের পেছনে। সে আসুক বা না আসুক, তাতে এখন আর কী আসে যায়? সে ঢেউ হয়ে আমাকে আঘাত করেছে, আমাকে টেনে মাঝ-সমুদ্রে নিয়ে গেছে, আমার পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে দিয়েছে। তারপর সে সরে গেছে। যেন এটা একটা তামাসা। আমি তা মানতে পারি না।

কিছু দিন পর রাতে ঝড় হয়। সকালে রোদ ওঠে। আমি আর রাশেদ আমাদের বাংলোর সীমানার ভেতর আম-কাঁঠালের বাগানে হাঁটাহাঁটি করি। উঠানে, বাগানে, সব জায়গায় পাতা আর পাতা। ছোট ছোট কচি ডাল। পাকা নারকেল। বক পাখির বাসা। হাওয়াইমিঠাইওয়ালা যদি উদয় না হত তা হলে এ আমার স্বর্গ হত, এই ঝড় পরবর্তী সকালের পৃথিবী। এখন আমি তাতে মনোযোগ দিতে পারি না। উঠান আর বাগান পরিষ্কার করার জন্য চার জন লোক চলে এসেছে আমরা বিছানা ছাড়ার আগেই। তারা কাজ করছে। খয়ের চাচা তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। ইঁয়েনে রাখেন। হিঁয়েনে যান। ইয়েন কিয়? চইদ্দানা অইচে। ভালা করি করেন। মইলা উড়াইয়েন্না। বিড়ি টানিয়েন্না। আমাদের ভাইবোনের কাজ শুধু দেখা। সবুজ আমের বিছানা। মাটিতে লুটানো নিমের ডাল। রাশেদ ওটার ওপর ওঠে। লুটানো ডালটাকে ঝাঁকুনি দেয়। আমরা আতা গাছের নিচে যাই। ধূসর-সবুজ আতা ফল ধরে দেখি। আমরা সামনের উঠানে আসি। গেটের বার হই। আমাদের সামনে পৃথিবী উন্মুক্ত হয়। কই সে হাওয়াইমিঠাই চোর? আমি কাছে-দূরে চোখ ফেলি। তারপর সামনের দিকে চলি।

কচি পাতার আর লেবুর সুবাস বাতাসে। রাস্তার দুই ধারে যত গাছ ছিল সব অক্ষত। রাস্তায় সবুজ পাতা আর কচি ডালের বিছানা। আমরা তা মাড়িয়ে হাঁটি। কোথাও কোনও বড় অঘটন নাই। শুধু সামনের বড় কড়ই গাছটা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে, যার আড়ালে মাঝে মাঝে হাওয়াইমিঠাইওয়ালা আশ্রয় নিত। রাস্তায় পড়ে থাকা গাছটার মোটা কাণ্ড গাড়ি চলা বন্ধ করে দিয়েছে। গাড়ি অবশ্য যা চলে তা সবই কমিশনার সাহেবের বাসার আর দাপ্তরিক কাজের জন্য। এর বাইরের কোনও গাড়ি এখানে সাধারণত আসে না। যদি না কমিশনার সাহেবের সাথে কেউ দেখা করতে আসে। কয়েক জন লোক এ দিক সে দিক ঘোরাঘোরি করে। পা

দিয়ে পৃথিবীকে আঘাত করে। পারলে তারা কাঁধে করে কড়ই গাছটা সরিয়ে নিত। করাত মিস্ত্রি কই? কমিশনার সাহেবের বাড়ির রাস্তা বন্ধ। করাত মিস্ত্রি কই?

আমি আর রাশেদ লুটানো কড়ই গাছ দেখি। রাশেদ নাইনে পড়ে। ওর হুজুর আসবে। তার আগে রাশেদকে দুধভাত খেতে হবে। এক মিনিট পর রাশেদ পেছনের দিকে হাঁটা ধরে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

আমি শুয়ে থাকা কড়ই গাছের সামনে। গজগজানো লোকগুলি আমার সামনে থেকে সরে যায়। আমি পড়ে যাওয়া কড়ই গাছ দেখি। মনোযোগ দিয়ে দেখি। কাণ্ডটা ধরে দেখি। খসখসে। সব কিছু দূর থেকে দেখতে সুন্দর। কাছে গেলে সুন্দর এমন আছে তিন জন পৃথিবীতে। আব্বা, মা আর রাশেদ। মায়া খালাও কাছে থেকে ততটা সুন্দর নয়। আমার মনে হয় সব কিছুকে তিন থেকে সাত হাত দূর থেকে দেখা ভাল।

আমি আর রাশেদ কমিশনার সাহেবের বাড়ির সীমানা আর বাইরের সীমানা দুটোর একচ্ছত্র অধিপতি। সবাই জানে আমরা কে? আমাদের অবাধ স্বাধীনতা এই সরকারি জমিগুলিতে। এক হাওয়াইমিঠাইওয়ালা আমার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। সে যখন খুশি তখন আসত। কেউ কিছু মনে করেনি। আমারতো মনে হয় তাকে কেউ দেখেইনি। আর দেখলেও কেউ তাকে কাঠবিড়ালী ভিন্ন অন্য কিছু মনে করেনি। তাই সে কারও ভ্রূকুটির কারণ হয়নি। সে যা ঘটিয়ে দিল তার জন্য আমি না ছিলাম প্রস্তুত, না আমি তা পছন্দ করেছি। আমি কড়ই গাছের কাণ্ড দেখি। গাছটা গোড়া দিয়ে ভেঙ্গেছে। মূল মাটিতে গাঁথা আছে। কিন্তু গাছটা আর দাঁড়ানো নাই। শাখাপ্রশাখা সব মাটিতে লুটানো। একটা টিনের চাল ছিল যেখানে কেউ থাকত না। টিনের চালসমেত কড়ই গাছ ভূপতিত। কড়ই গাছের শাখার নিচে একটা টিনের চাল লুকিয়ে আছে। অথচ তা শুধু আমরা যারা এই টিনের চালের অস্তিত্বের কথা জানি তারা বুঝতে পারছি।

“মা জননী, আন্নে ইঁয়ানে কিয়া করেন?”

খয়ের চাচা, আমাদের মালি। খয়ের চাচার সাদা দাড়ি ভিউকার্ডে আঁকা হার্ট-আকারে নিচের দিকে নেমে গেছে। খয়ের চাচার খালি বুকে একটা হার্ট-আকৃতির গঠন পাওয়া যায়। তার কাঁধ দুটির মধ্যেও আমি হার্ট-শেপ দেখতে পাই। তার পরনে একটা খাকি রঙের প্যান্ট, যার পাড় হাঁটুর একটু নিচে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। আমি খয়ের চাচার আলোকিত স্মিত-হাসি গ্রহণ করি। খয়ের চাচার বাড়ি মাইজদী। ওনার ছেলে ঢাকা মেডিকেলে পড়ে। খয়ের চাচা মনে মনে স্বপ্ন দেখে আমি তার ছেলের বউ। আমার তাতে কোনও অসুবিধা নাই। মানে খয়ের চাচার ছেলের বউ হতে। খয়ের চাচার মনে কোনও কামনা নাই। চাচি বাড়িতে থাকে। চাচার ছেলে মেডিকেলে পড়ে। চাচার তিনটা মেয়ে আছে, তাদের সবাই যার যার স্বামীর সংসার করে। পৃথিবীতে খয়ের চাচার চেয়ে বেশি সুখী তখন খুব বেশি মানুষ ছিল না।

“অনঅ নাস্তা কইত্তেন্ন?” খয়ের চাচা বলে।

“চাচা!”

আমার মুখ থেকে অস্ফুটে বের হয়ে যায় শব্দটা। আমি কাঁপি। চাচা দেখেন। খয়ের চাচার এক হৃদয়ে অনেক হৃদয়। খয়ের চাচা আমার চোখের দিকে দেখেন আবার মাটিতে শোয়া কড়ই কাণ্ড দেখেন।

“আঁআঁরে? আঁর মা জননীর মনে কত মায়া! গাছেল্লাই মায়া! মাছেল্লাই মায়া! বিলাইল্লাই মায়া!”

খয়ের চাচার মায়াময় চোখ আমার দিকে চায়। আমি যে অস্থির আছি তা আর কাউকে দেখাইনি। আব্বার সাথে খানা খাই। মার সাথে গোসল করি। রাশেদকে দুধভাত মেখে দিই। হাওয়াইমিঠাইওয়ালার তিরোধানের পর আরও যত্ন করে রাশেদের জন্য দুধভাত মাখি। বান্দরবানের পাকা চিনিচম্পা কলা আর দুধ

আর চিকন চালের সাদা ভাত। আমার অবস্থা কেউ কিচ্ছু জানে না। খয়ের চাচাও জানে না। কিন্তু আমি আর খয়ের চাচা চোখাচোখি করি। খয়ের চাচার কাছে আমার লজ্জা লাগে না। খয়ের চাচা আমার জন্য কিছু একটা করতে চান। খয়ের চাচা কোমরে হাত রাখেন, তাঁর চোখে আদর আর উষ্ণতা, তিনি বলেন:

"মা জননী, আঁন্নের বিলাইর কবর চাইবেন্নে?"

আমি ডানে-বামে মাথ দোলাই। খয়ের চাচার গলায় মধু। খয়ের চাচার হৃদয়ে আসল মায়া।

"আঁন্নে এঁক্কেনা মন শান্ত করেন, মা জননী।" খয়ের চাচা বলেন। "কিছু লাইগলে আঁরে বোলাইয়েন। আঁন্নেল্লাই বড্ডা বড্ডা কোগা আম রাইখছি।"

আমি মাথা ঝাঁকাই। সদা ব্যস্ত খয়ের চাচা পেছনের দিকে চলে যান।

আমি শুয়ে থাকা কড়ই গাছের মূল, কাণ্ড, আর শাখা দেখি। আমার শরীর কয়েকটা শক্ত ঝাঁকুনি খায়। আমি স্বীকার করে নিই হাওয়াইমিঠাই চোর আমাকে উপড়ে ফেলেছে। যে ঝড়ে কোনও গাছ পড়েনি সেই ঝড়ে সবচেয়ে শক্ত গাছটা পড়ে গেছে। হাওয়াইমিঠাই চোর আমাকে আমার মূল, আমার পরিবার, আমার জীবন থেকে আমাকে উপড়ে ফেলেছে। আমি এখন এক জন পোড় খাওয়া নারী। আমার মন সহসা পৃথিবীর এক মাথা দিয়ে ঢোকে এবং আর এক মাথা দিয়ে বের হয়। অবাক হবার কী আছে? আমি নিজেকে বলি। এটাতো সাধারণ ঘটনা। সবার জীবনে ঘটে। এত স্বাভাবিক চিন্তা করার পরও আমার মনে হয় আমি অল্প বয়সে রাস্তায় সন্তান প্রসব করছি, সেই সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে, মন্দাকিনির মতো, রাস্তার পাশে চায়ের টংয়ে চা বানাচ্ছি। বখাটে খদ্দেরদের জন্য। আর হাওয়াইমিঠাইওয়ালা চায়ের মাচার নিচে হাওয়াইমিঠাইয়ে মুখ গুজে ঘুমাচ্ছে। আমার মাথা চক্কর দেয়। হাওয়াইমিঠাইওয়ালা অন্যায় করেছে। কিন্তু আমি উপড়ে পড়ে গেছি। আর এটা যে একটা অভিজ্ঞতা, এই উপড়ে পড়ে যাওয়া, তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। যেন এটা জীবনের চূড়ান্ত অধ্যায়।

হাওয়াইমিঠাই চোর আমার সামনে আসে। পৃথিবীর নীরবতম কাঠবিড়ালীর চেয়ে কম শব্দ করে। তার চুলে তেল, আঁচড়ানো চুল। পরিষ্কার গলা। গায়ের সাদা শার্ট পরিষ্কার। পরনের কালো প্যান্টও পরিষ্কার। বাটার সেন্ডেলটা চকচকে, পুরনো সেন্ডেল। পালিশ করানো হয়েছে। পায়ের নখ পরিষ্কার। সিনেমার গানে যেমন ঠোঁট নড়ে, তেমন করে তার ঠোঁট নড়ে। একটুও বেশি বা কম নড়ে না। সে কথা বলে। শুধু আমি শুনি। যদিও আসে পাশে কেউ নাই। গজগজানো মানুষগুলি কোথায় গেল? কোথায় গেল আমার প্রাণপ্রিয় খয়ের চাচা। সবাই বুঝি এই হাওয়াইমিঠাইওয়ালার সাথে সন্ধি করে বসে আছে। কিন্তু তা কী করে হয়? আর কেউ যদি পাশে থাকতও, তবু তারা হাওয়াইমিঠাইওয়ালার গলা শুনতে পেত না। তার স্বর নিচু।

সে বলে, সে রাশেদের চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার ঠোঁট খোলে, দাঁত দেখা যায়, আর তার চোখের বাইরের কোনা থেকে নীরব হাসি বের হয়।

"কেন হাসছেন আপনি?"

"আপনার চোখ লাল," সে বলে।

আমি কলাবাগানের দিকে হাঁটা ধরি।

"আমি এখানে কথা বলব না," হাওয়াইমিঠাইওয়ালা বলে। "আমি ভয় পাই।"

"কথা বলতে হবে," আমি ঘাড় ঘুরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলি।

“আমি আপনার কলেজের বাইরে কথা বলব, কারণ এখানে আমি ভয় পাই।”

“এখনই কথা বলতে হবে? আমি কলেজের বাইরে যাব না।”

“তা হলে বলতে হবে না। আমার কথা বলার দরকার নাই।”

আমি চেঁচানো আটকাতে আমার কণ্ঠমণি চেপে ধরি। “আমার দরকার আছে,” আমি বলি।

“এখানে ছাড়া অন্য যে কোনও জায়গায়,” হাওয়াইমিঠাইওয়ালা বলে।

তারপর উধাও হয়ে যায়।

উনপঞ্চাশ

হাওয়াইমিঠাইওয়ালার সাথে কথা বলার জন্য তখন আমার এক সেকেন্ড অপেক্ষা করার জন্য ধৈর্য ছিল না। অথচ নয় দিন লাগে সেই আয়োজন করতে। ওই নয় দিন আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল মানুষ ছিলাম। আমার জীবনে আমি নয় দিন নামাজ পড়েছি। আর তা ছিল ওই নয় দিন। দশম দিন আমি কলেজে গিয়ে এক ঘন্টা পর বের হয়ে যাই। জীবনে প্রথম স্কুল-কলেজ চুরি। ধরা পড়লে কী বিপদ হবে জানি না। বিপদের জন্য আমি অবশ্য প্রতিনিয়ত অপেক্ষা করে আছি। ছোটখাট কোনও বিপদ নয়। মহাবিপদ। ঢেউ আছাড় দিয়ে কাউকে মাঝ-সমুদ্রে নিয়ে গেলে যে বিপদ হয়, তেমন বিপদ। বরং তা তাড়াতাড়ি আসলে আমার অপেক্ষার শেষ হয়।

আমি স্বপ্নচরের মতো হেঁটে অনেক দূর গিয়ে একটা রিক্সায় উঠে গল্ফ কোর্সের দিকে রওয়ানা দিই। রিক্সাওয়ালাকে অনুরোধ করার আগেই সে রিক্সার খাঁচাটা আমার মাথার উপর তুলে দেয়। বোঝা গেল তিনি মেয়েদের গল্ফ কোর্সের দিকে নিয়মিত নিয়ে যান। আমি ধরা খেতে চাই। তাই হঠকারী হওয়া আমার জন্য সহজ হয়। আমি ঘামি, আমার রিক্সা আছাড় দিয়ে দিয়ে আমাকে গল্ফকোর্সের দিকে নিয়ে যায়। আকাশে হালকা মেঘ। প্রেমের জন্য উপযুক্ত মেঘ। তবু মনে হয় তা কালবৈশাখীর পূর্বাভাস। কালবৈশাখী আসে না। রিক্সাটা কোনও দুর্ঘটনায় কবলিত হয় না। পেছন থেকে কেউ আমার ওড়না টেনে ধরে না। সামনে পরিচিত কাউকে দেখি না। পাশ থেকে কেউ আমাকে ডাকে না। জীবনে প্রথম রাস্তার পাশ থেকে কারও শিস্ধ্বনি শুনলাম না। রিক্সা নিরাপদে চলে। সব কিছু ঠিকঠাক। তবু আমার মনে হয় সাগরের তলদেশ কেটে কেটে আমার রিক্সা গল্ফকোর্সের দিকে যাচ্ছে।

গল্ফকোর্সে আগে কখনও আসিনি। এসে ভাল লাগে। আমাকে লুকানোর মতো অনেক ছোট ছোট গাছ আছে। হাওয়াইমিঠাইওয়ালা বলে দিয়েছে রিক্সা থেকে নেমে ডান দিকে হাঁটতে। আমি রিক্সা থেকে নেমে ডান দিকে হাঁটি। আমার বামে খাকি রঙের দেয়াল। দেয়ালের উল্টা দিকে গাছের সারি। গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গা মাটির পথ। আমার মন ভুলায় না।

হাওয়াইমিঠাইওয়ালার উদয় হয়। তার পরনে সেই একই কালো প্যান্ট আর সাদা শার্ট। তবু পরিষ্কার। তাকেও দেখে কলেজের ছাত্র মনে হয়। সে কি এখন আর পড়ে? নিশ্চয়ই না। কোনও কথা না বলে আমি হাওয়াইমিঠাইওয়ালার পেছনে পেছনে চলি। মন চাইছিল চলতে চলতে রাঙ্গামাটি কিংবা বান্দরবানের পাহাড়ে চলে যাই। রোমাঞ্চের জন্য নয়। লুকানোর জন্য। এবং আর কখনও ফিরে না আসি।

আমরা একটা সোনালু গাছের বনে এসে লুকাই। জায়গাটায় নিজেকে তেমন বেআব্রু মনে হয় না। মেঘও চলে গেছে। মাথার উপর বৈশাখ মাসের রোদ আর হলুদ সোনালু ফুল। বাতাসে গ্রিষ্মের গ্রামের ভাপ আর ধান গাছের সুবাস। আমরা মুখোমুখি দাঁড়াই।

"আমার সালোয়ার দাও," আমি বলি।

হাওয়াইমিঠাইওয়ালার মুখ কালো হয়ে যায়। গাল যায় বসে। আমি তার কালো প্যান্টের পার্শ্বজেব দেখি। দেখে বুঝি আমার সালোয়ার তার পকেটে। আমি সে দিকে তাকাই। হাওয়াইমিঠাইওয়ালা তার জেবের মুখ খামচে ধরে। কী আছে ওই সালোয়ারে?

আমি আমার মুখে যতটা গাম্ভীর্য আনা সম্ভব তার সবটুকু এনে বলি, "জহির, এই সালোয়ারটার জন্য আমি মরে যেতে পারি। আমাকে আমার সালোয়ার ফেরত দাও। আর তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানে চলে যাও।"

জহির এত মৃদু মাথা নাড়ে যে ওকে স্থিরই মনে হয়।

"পাগলামি কোরো না, জহির," আমি বলি।

জহির স্মিতহাসি হাসে। আর আমার কথা আমার কানে বেমানান লাগে। তারপরও আমি সিদ্ধান্ত নিই আমি থামব না। আমারতো এই গরিব ছেলেটির জন্য কিছু দায়িত্ব আছে। আর আমি সব বুঝি। আমি চাই সেও বুঝুক।

"জহির, তুমি একটা দরিদ্র ছেলে। তোমার আব্বা পানবিড়ি বেচে। আমার আব্বা কমিশনার। আমার মা ডাক্তার। তারা আমাকে এক জন কমিশনারের বা এক জন ব্যবসায়ীর ছেলের সাথে বিয়ে দেবে। এমনকি আমার শাশুড়িও ডাক্তার বা সচিব হতে পারে। পাগলামি কোরো না, জহির।"

জহিরের স্মিত হাসি লোপ পায়। কিন্তু তা আমার সালোয়ার হারানোর ভয়ে যে ভাবে চুপসে গিয়েছিল সে ভাবে চুপসে যায় না।

"এই কথাগুলিই আমার আব্বা আমাকে বলেছে," জহির বলে।

"তোমার আব্বা ঠিক কথা বলেছে, জহির। তোমাকে তার কথা শুনতে হবে।"

"আমি শুনিনি।"

"এখন শোনো। আর চলে যাও। আমার কাছে টাকা আছে। এই টাকা নিয়ে তুমি চলে যাও।"

"আব্বা আমাকে ধরে রাখতে চেয়েছে। তারপরও আমি চলে এসেছি।"

"এখন চলে যাও।"

"আমাকে চলে যেতে হবে না," জহির বলে।

আমি তার দিকে তাকাই। হতাশায় আমার শরীর কাঁপে।

"আব্বা আমাকে গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে বেত দিয়ে মেরেছে," জহির বলে। "চার মাস আমাকে বেঁধে রেখেছিল। শুধু এক শর্তে আমাকে ছাড়তে রাজি ছিল। যদি আমি কলেজে ভর্তি হই।"

"তুমি কলেজে ভর্তি হওনি?"

“না।”

জহিরের সাথে আমার দেখা হয় খুলনাতে। তখন আব্বা খুলনার বিভাগীয় কমিশনার। আমরা এক সাথে ক্লাশ নাইন আর টেনে পড়েছি। খুলনা জেলা স্কুলে। জহিরকে আমি প্রথম খেয়াল করি সেই বছর বর্ষকালে, স্কুলের পুকুর পাড়ের কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে। লিকলিকে জহিরের দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পায়, ওর পাতলা গঠনের জন্য। আমার হাসি শুনে জহির সিঁড়ির উপর আছাড় খায়। আমার হাসি আরও বাড়ে। আমরা এক সাথে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। তারপর আব্বা বদলি হয়ে চলে আসে চট্টগ্রামে। বিভাগীয় কমিশনার হিসাবে। এসএসসি পরীক্ষায় আমি পাই ৭৫১ নম্বর। জহির পায় ৮০১। জহির খুলনা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে ত্রয়োদশ স্থান পায়। মেট্রিক পাশ করে আমি আব্বার সাথে চট্টগ্রাম আসি, চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হই। পানবিড়ি বিক্রেতার ছেলে জহির কলেজে ভর্তি হয়নি। সেও চট্টগ্রামে চলে এসেছে। জহির কলেজে ভর্তি হয়নি, কথাটা মানতে কষ্ট হচ্ছিল। কষ্টে আমার বুক ধুকধুক করে আর ওঠানামা করে। কষ্টের বিষ আমার পেটে কামড় দেয়।

“তুমি আর পড়বে না, জহির?” আমি নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করি।

“না।”

“তাতে তোমার কী লাভ হবে? আমার পরিবার আমাকে একটা বড়লোক ছেলের সাথে বিয়ে দেবে? না পড়লে তোমার কী লাভ হবে, জহির?”

“এ সব আমি বাঁধা থাকা অবস্থায় ভেবে ফেলেছি,” জহির বলে।

“সত্যিই তোমাকে চার মাস বেঁধে রেখেছিল?”

“কয়েক দিন বেশি,” জহির বলে। “দিনে এক বার আব্বা আমাকে গোসলখানায় নিয়ে যেত। সেখান থেকে বের করে এনে আবার বেঁধে রাখত। যাতে আমি পালাতে না পারি।”

“এখন তোমার আব্বা তোমাকে খুঁজতে চলে আসবে। আবার তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে,” আমি বলি।

“আসবে না,” জহির বলে।

“আসবে, জহির, আসবে।”

“আসবে না।”

জহিরের গলায় দৃঢ়তা। আমি ওর মুখের দিকে চাই। আমি তার চোয়ালে রোমের আভাস দেখি। থুতনিতে দাড়ির আভাস যা এখনও ঝুলে পড়েনি, যা থুতনি আঁকড়ে ধরে আছে। চোখের উপর ঘন ভ্রূজোড়া। মনে হয় না এ বাপের মার খাওয়া ছেলে। আমি সরাসরি জহিরের চোখের দিকে তাকাই।

“কেন আসবে না?” আমি বলি। “আমারতো মনে হয় আসবে।”

“আসতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি বলেছি, ‘হবে না।’”

আমি জহিরের কথা শুনি আর আমার বুক চিপে। মনে হয় না এটা স্বাভাবিক কোনও ঘটনা।

“তোমার আব্বাও কি তোমার মতো পাগল?” আমি বলি।

"সেও পাগল। সে প্রতি রাতে আমার কাছে এসে জানতে চাইত আমার সর্বশেষ অবস্থা কী? আমি বলতাম আমার অবস্থার কোনও পরিবর্তন নাই। আর হবেও না। তার চাইতে আমাকে ছেড়ে দেয়া হোক। আমি আমার পথ দেখি। আমার আম্মা আমার আব্বাকে বলে আমাকে ছেড়ে দিতে। আব্বা রাজি হয় না। আমি বলি, সমস্যা নাই। আমাকে শিশিরকণার বিয়ের আগে ছেড়ে দিলেই হবে। যাতে আমি তার বিয়ে আটকাতে পারি। আর শিশিরকণার বিয়েতো তাড়াতাড়ি হবে না। কারণ সে কমিশনারের মেয়ে। অন্তত আরও তিন বছর তোমরা আমাকে আটকে রাখতে পারো। কিন্তু এখন ছেড়ে দিলে ভাল হয়। যদি সব ঠিক করতে পারি তবে আমি আবার পড়াশোনা শুরু করব। আম্মা আব্বাকে বলে আমাকে ছেড়ে দিতে। আব্বা বলে আমাকে কমিশনার সাহেব গুলি করে মারবে। লাশ গুম করবে। এ ছাড়া আর কিছু হবে না। আমি বলি, আমাকে কমিশনার মারুক, তাতে আমার আপত্তি নাই। তবু আমি যেতে চাই। শেষ সতেরো রাত আমাদের মধ্যে এ রকম কথাবার্তা হয়। প্রতি রাতেই একই কথা। আমি আমার মত বদলাব না তারা বুঝে যায়। এক রাতে আব্বা আসল শেষ রাতে। আমাকে খুলে দিল। আম্মা খেতে দিল। আমি খেলাম। আব্বা বলল তুমি কী নিতে চাও নাও। আমি আমার স্কুলের ব্যাগে যা নিতে চাই তা নিয়ে নিলাম। তারপর আব্বা আমাকে আর আম্মাকে কবরস্থানে নিয়ে যায়। আব্বার হাতে হারিকেন। আমাদের সামনে একটা খোলা কাঁচা কবর আর তার চারপাশে মাটি। এই কবরটা এ ভাবে থাকবে, আব্বা বলে। তোমার লাশের জন্য। তারপর আব্বা আমাকে জড়িয়ে ধরে। কাঁদে। আম্মা কাঁদে। আব্বা আমাকে ফেলে আম্মাকে নিয়ে চলে যায়। আমি তাদের দুজনের কান্না শুনি।"

জহিরের মধ্যে কোনও উত্তেজনা নাই। স্থিতিশীলতা আছে। এটা দেখে আমার মনে হয় আমি আর সেই পড়ে যাওয়া কড়ই গাছ নেই। মনে হয় আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। একটা শীতল পরশ আমার ত্বককে আলিঙ্গন করে। শূন্যে বাতাস আসে। তা যেন বৈশাখের গরম বাতাস নয়, হেমন্তের আরামদায়ক শীতল বাতাস। এক মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি সত্য, আমার বুঝি আর একটা মূল অঙ্কুরিত হয়েছে। নাই চাইলেও যা আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। আমি নিজের সাথে সন্ধি স্থাপন করি।

জহিরের আব্বার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়। আমার আব্বা জহিরকে খুন করিয়েছে। আর জহিরের আব্বা জহিরকে ওই কবরে কবর দিয়েছে।

পঞ্চাশ

জহিরের মৃত্যুর পর কেউ আমাকে কোনও প্রশ্ন করেনি। আমি প্রথম যে খবর পাই তা হল আমি মাস্টার্সে প্রথম হয়েছি। দ্বিতীয় খবর আমাকে ডিপার্টমেন্টে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় খবর আমাকে এক বছরের ছুটি দেয়া হয়েছে। চতুর্থ খবর আমি পিএইচডি করার জন্য জার্মানি যাচ্ছি। পঞ্চম খবর আমাকে ছোট একটা কাজে মুক্তি ক্লিনিকে যেতে হবে। তারপর আমার জার্মানি গমন, মার সাথে বিশ্ব ভ্রমণ। ফিরে আসার পর হামিদের সাথে আমার বিয়ে। শৈশবে এক বার হামিদকে দেখেছিলাম, সে হামিদ ছিল ফেনীর পাছাবিহীন হামিদ। ফেনীর হামিদের তুলনায় তখন আমাকে ডবকা পাছার কিশোরী বলা যেত। এখন আমি যখন উপচে পড়া যৌবনে, হামিদ তখন অনেক উন্নতি লাভ করেছে। ঢাকা শহরের এ হামিদ ডবকা পাছার হামিদ আর তার তুলনায় আমি চিমসানো পাছার শিশিরকণা।

ঢাকায় ডবকা পাছার হামিদের আব্বা তখন অনেক ধনী। প্রতি বছর একটা করে নতুন গার্মেন্টস কারখানা খোলে। তার সব ব্যবসা আছে। ইতালির প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লুসকনির মতো। তার সুপার মার্কেট

আছে। ইটের ভাটাও আছে। গার্মেন্টস কারখানা আছে। ইস্পাতের কারখানা আছে। তিনি জাহাজ পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি। ট্রাক মালিক সমিতির মহাসচিব। বাস মালিক সমিতির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতির এক নম্বর কার্যকরী সদস্য। তার ফুটবল টিম আছে। ক্রিকেট টিম আছে। হকি টিম আছে। নাই, এমন কিছু তার নাই। শুধু একটা জিনিস তার নাই। থুক্কু, তার ছেলের নাই। তার ছেলে হামিদের হার্টের ভাল্‌ভ চারটির পূর্ণাঙ্গ কার্যক্ষমতা নাই।

ছোট বেলায় হামিদের বাতজ্বর হয়। তখন হামিদুল হক চৌধুরীর বাবা আমিনুল হক চৌধুরী গরিব ছিল। তবে কখনও পানসুপারি বিক্রেতা আবুল হোসেনের মতো এত গরিব ছিল না। গরিবের ছেলে হামিদ দশ বছর ধরে পেনিসিলিন ইনজেকশন নেয়। তত দিনে আমিনুল হক চৌধুরীর ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি হার্টের কপাটিকা চারটি ঠিক করার জন্য ছেলেকে সিঙ্গাপুর নিয়ে বড় বড় হৃৎরোগের চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন। লন্ডন আর নিউইয়র্কেও হামিদের চিকিৎসা করানো হয়। ডাক্তাররা বলেন সব ঠিক আছে। শুধু এ-ওষুধ ওই-ওষুধ খেতে হবে। হামিদের হৃৎযন্ত্রের ভাল্‌ভগুলি পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। মাঝে মাঝে তাদের সময় মতো খোলা ও বন্ধ হওয়া একটু ব্যাহত হয়। ভবিষ্যতে যে কোনও সময় হামিদের হৃৎযন্ত্রের উপর অস্ত্রোপচার করে কৃত্রিম ভাল্‌ভ সংযুক্ত করতে হবে। বিষয়টা বিবেচনা করে হামিদের জন্য সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে, লন্ডনের রয়্যাল ব্রম্পটন হাসপাতালে, নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে একটি করে বেড আজীবনের জন্য কিনে নেয়া হয়। ঢাকায় হামিদের পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জিত হয় তাতে হামিদ হৃৎযন্ত্রের কয়েক লক্ষ বিকল্প কপাটিকা ক্রয় করতে সক্ষম। দশটি করে কপাটিকার টাকা হামিদের সিঙ্গাপুর, লন্ডন ও নিউইয়র্কের বিশেষ ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখা হয়।

আমাকে আর হামিদকে নব নির্মিত হোটেল র‍্যাডিসনে বিয়ের আনুষ্ঠানিক আলোচনার জন্য বসানো হয়। এটার দরকার ছিল না। কিন্তু সব কিছু করা হচ্ছিল জহিরের স্মৃতিকে মুছে দেয়ার উদ্দেশ্যে। ওরা তখন আমার কাছে নতুন কেউ নয়। ওদের সবাই আমাকে মুক্তি ক্লিনিকে যেতে সাহস যুগিয়েছে। যে আমিনুল হক চৌধুরীকে ছোট বেলায় ফেনীর ভাষায় কথা বলতে দেখেছি, সে তখন শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। আমাদের পরিচয়ের অনুষ্ঠানে আমিন চৌধুরী কিছু বিদেশি অতিথি দাওয়ান দেন। আমি দেখি তিনি বিদেশিদের সাথে ইংরেজি ভাষায় কথা বলেন। স্কুলে না যাওয়া আমিন চৌধুরী ইংরেজি ভাষায় কথা বলছেন, ব্যাপারটাতে আমার গর্ব হয়। আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষায় কথা বলা শেখার মাধ্যম দুটি: ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া, নয়তো টাকা কামানো। এই দুই শ্রেণির বাইরে আমলা, কামলা, পিএইচডি, বিদেশফেরত কেউ ইংরেজি বলতে পারে, তেমনটা আমি দেখিনি। জোরে জোরে ইংরেজি বলতে পারঙ্গম আমিন চৌধুরী আমার পাশে বসেন। আদর করে আমার ঘাড়ে তাঁর ডান হাত রাখেন। আর বাম হাত দিয়ে তিনি আমার বাম হাত চেপে ধরেন। “মা, তোমার দুর্ঘটনার জন্য আমরা আজও কষ্টে আছি। যদি নিজের ছেলের হার্টের এই অবস্থা না হত, তা হলে আমি খুশি হতাম। তুমি কি তাকে বিয়ে করতে চাও? না চাইলে আমি নিজে তোমার জন্য তোমার যোগ্য পাত্র ঠিক করে দেব।”

“কী যে বলেন, চাচা!” আমি তখন পাকা খানকি। “হামিদ ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না। আর আমার অ্যাক্সিডেন্ট একটা হয়েছে। তো কী হয়েছে? আমি সব ভুলে গেছি। আবেগের বশে পানসুপারি বিক্রেতার ছেলের সাথে ভেগে গেছি। আবেগ কি আর চিরকাল থাকে, চাচা? থাকে না। তাই আমি আমার নিজের কাছে ফিরে এসেছি। আমি আপনার সুযোগ্য পুত্র হামিদকে বিয়ে করব।” তারপর মনে মনে বলেছি, চাচা, মানে, আমার চিমসানো পাছা আপনার ছেলের ডবকা পাছাকে বিয়ে করবে।

“দুঃখ না করাই ভাল, মা।” আমিন চৌধুরী আমার ঘাড় ডলেন আর হাতে চাপ বাড়ন। “জহির যে একটা ক্যাডার ছিল তা তুমি জানতে না। কী বলব মা, কীভাবে ক্যাডাররা ওকে মারল। ক্যাডারে ক্যাডারে বিবাদ। গোলাগুলি ছাড়া মেটে না, মা।”

“আমি জানি, চাচা। আব্বা আমাকে প্রমাণ দেখিয়েছে। পানসুপারির ছেলে আমাকে ঠকিয়েছে। দিনের বেলা সে আমার সাথে প্রেম করেছে। রাতের বেলা সে প্রতিপক্ষের ক্যাডারদের পাখির মতো গুলি করে হত্যা করেছে। সে নিজ দলের প্রতিপক্ষ ছুক্কুকে মেরেছে। বিরোধী দলের প্রতিপক্ষ মনাইকে মেরেছে। চাঁদাবাজি করতে গিয়ে অন্য চাঁদাবাজ কিসলুকে মেরেছে। সে বাপের টাকা নিত না, কারণ তার পানসুপারি বিক্রেতা বাপের টাকা ছিল না। তাই বলে টাকার জন্য মানুষ মারা? আল্লাহ আমাকে তার হাত থেকে উদ্ধার করেছে। আর আপনার ছেলের কাছে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। এখন আমি আপনার ছেলেকে পেয়েছি। ওর হার্টের একটু সমস্যা আছে বটে। তবে ওতো আমার ভাইও হতে পারত। তখন কি আমি ওকে ফেলে দিতে পারতাম? আমি আপনার ছেলের যত্ন নেব। সে শতায়ু হবে। চাচা, আপনি দেখে নিয়েন।”

আমি দেখি আমিনুল হক চৌধুরীর চোখে জল। তরী চৌধুরীর চোখে জল। আব্বার চোখে জল। মার চোখে জল।

আমার আনন্দ পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পেলাম না। দেখি আমার সুপাত্র হামিদুল হক চৌধুরীর চোখেও জল।

আমার খারাপ লাগে। আমি বলি, “হামিদ তুমি উঠে এসো।”

হামিদের বাপ আমার ঘাড় আর বাম হাত মুক্ত করে উঠে যান। হামিদ এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। আমি দাঁড়িয়ে হামিদকে সবার সামনে আলিঙ্গন করি। “তুমি কেঁদো না, হামিদ। তোমাকে এমন সুখ দেব, তুমি সব ভুলে যাবে। তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।”

আমি হামিদকে মায়ার আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরি। জি। মায়ার আলিঙ্গনে। কারণ আমি দাতা। এখনও দাতা। তখনও দাতা। জন্মের পর থেকেই আমি দাতা। আমার দানের সুখে হামিদের চোখ থেকে আরও বেশি জল গড়িয়ে পড়ে। আমি হামিদকে আরও নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করি। মায়া দিয়ে হামিদকে আমার দিকে টানি। আর এ সময় আমার মায়ার সাথে হামিদের কায়ার পরিচয় হয়। আমি টের পাই আমার তলপেটের নিচের দিকের বাম কোনায়, যেখানে শাড়ির আবরণ সত্ত্বেও একটুখানি ত্বক খোলা আছে, সেখানে একটা রাবারের ডাম্বেলের মাথার চাপ। কী করব প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না। আমি হামিদের শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ শুনি। আমি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করি না। আমি সিদ্ধান্ত নিই মজা করব। আমি নিজেকে এর মধ্যে যা বলে চিহ্নিত করলাম, তার আচরণ প্রয়োগ করব।

আমি আমার পেটের ত্বক বাড়িয়ে দিই। আমার আলিঙ্গনের মধ্যে হামিদের বুকের গুতগুতানি বেড়ে যায়। আমার কাঁধের উপর হামিদের নিঃশ্বাসের গরম বাতাস ছোট ছোট আগুনের গোলা হয়ে ফোঁস ফোঁস করে ঝরে, আমার ব্লাউজের প্রান্তভাগের মোটা কাপড় ভেদ করে তা আমার চামড়া গরম করে। হামিদের জন্য আমার মায়া হয়। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রিন্সেস সুরাইয়্যার বেলি ড্যান্স। আমি টার্কিশ কানুনের সুরে সুরে ইস্তাম্বুলের বেলি ড্যান্স শুরু করি, পিউর বেলি ডান্স, শুধু আমার তলপেট নাচে, আর কিছু নাচে না। হামিদের নিঃশ্বাস ফোঁসফোঁস করে আমার কাঁধের উপর ঝরতে থাকে। আটটা কি নয়টা বৃত্তাকার সঞ্চালনাতেই কাজ সারা, হামিদের চোখের সাথে এবার হামিদের ডাম্বেলও জল ছেড়ে দেয়। এ সময় আমি হামিদের ডবকা পাছা খামচে ধরি। তারপর তাকে একটা ঝটকা মেরে আমার বুক থেকে সরিয়ে দিই।